বিমল মিত্র
কিশোর অমনিবাস

ছোট-বড় সবার জন্য

# বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

KISHORE-OMNIBUS. Rs : 14.
by BIMAL MITRA.
Published by-
Ujjal Sahitya Mandir
C-3, College Street Market.
Calcutta-700007.

প্রথম প্রকাশ—
মাঘ, ১৩৯২
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ ( দ্বিতলে )

মুদ্রাকর :
তাপস সাঁতরা
সন্তোষী প্রিন্টার্স
৪৩ বি, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৬

ব্লক :
রঞ্জিত দত্ত

প্রচ্ছদ চিত্র :
অমিয় ভট্টাচার্য

অলংকরণ :
শ্রীবিদ্যাঅশোক

গ্রন্থন :
আনোয়ার হোসেন
সোরাবউদ্দিন মল্লিক

চোদ্দ টাকা

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার অসংখ্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার নাম জাল করে প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প-উপন্যাস বাজারে চলছে। ও-নামে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোনো লেখক নেই। আমার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে বহু অসৎ প্রকাশক এই অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে, তাই আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার রচিত গ্রন্থ ক্রয় করবার আগে তাঁরা যেন প্রথম পৃষ্ঠায় আমার মুদ্রিত স্বাক্ষর এবং ভেতরে 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' দেখে তবে গ্রন্থ ক্রয় করেন।

বিমল মিত্র

## প্রকাশকের নিবেদন

শুধু বড়দের নয়, কিশোর সাহিত্যেও 'বিমল মিত্র' নামটি এক বিরল প্রতিভা। কিছুদিন আগে তাঁরই আরো দু'টি কিশোর গ্রন্থ 'টক-ঝাল-মিষ্টি' ও 'লাল-নীল-হল্‌দে'-র অভাবনীয় জনপ্রিয়তাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এবার সেই জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখেই এই গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম, এবারেও উপন্যাস, কাহিনী, গল্প ও একটি দারুণ মজার কবিতা আছে, যেটি লেখকের প্রায় তিন দশক আগের লেখা। আশা করি এই বইটিও আগের মতন কিশোর পাঠিক-পাঠকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

দেখে নাও,

## কোন পাতায় কী আছে—

### অবিস্মরণীয় উপন্যাস



### বিশাল কাহিনী



### দারুণ গপ্পো



### মজার কবিতা

হাসপাতালের একটা ছোট কেবিন। কেবিনের দরজার বাইরে কাঠের ওপর লেখা "কেস নম্বর ৪৯"।

সকালবেলা রোজকার নিয়ম মত বড় ডাক্তার এলেন। সঙ্গে ছোট ডাক্তার আর মেট্রন। হাসপাতালের এক-একটা বিছানার সামনে এসে রোগীকে দেখেন। পাশের টাঙানো চার্টটা পড়েন। দরকার হলে কেমন আছে জিজ্ঞেস করেন। নাড়ী দেখেন রোগী বিশেষে। কোথাও স্টেথিস্-কোপ্‌টা লাগিয়ে পরীক্ষা করেন। দু'পাশের রোগীদের এক-এক ক'রে দেখা শেষ হ'লে চলে যান পাশের হলের ভেতর।

রোদ এসে পড়েছে ভেতরে। সকালবেলার মিষ্টি রোদ। চারিদিকের সমুদ্রের হাওয়ায় দুলছে দরজার পর্দা। ঝলমলিয়ে উঠেছে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়া রোদের কাঁচা সোনা। যে-সব রোগী উঠে দাঁড়াতে পারে, তারা ডাক্তার আসার আগেই জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে নেয় বাইরেটা। নারকোল গাছের সার যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকে সমুদ্রের শুরু। ঢেউগুলো অছড়ে এসে পড়ছে একেবারে নারকোল গাছগুলোর পায়ের ওপর। সেই নারকোল গাছের তলা দিয়ে সার বেঁধে চলেছে কালো জেলেরা। কাঁধের ওপর লম্বা একখানা বাঁশে ভারী-ভারী মাছ ধরবার জাল ঝুলছে। বালির চড়ার ওপর খানকয়েক নৌকো। নৌকোগুলো কাত হয়ে উল্টে রয়েছে। কয়েকটা বেরিয়ে পড়েছে দূর সমুদ্রে। দূরে কয়েকটা নৌকো ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। ওরা মাছ ধরবে। ধরে বালির চড়ার ওপর রোদ্দুরে শুকোতে দেবে। দিনের পর দিন শুকোবে—আর ওরা পাশে দাঁড়িয়ে দেবে পাহারা। নইলে শঙ্খচিল আর বাজপাখীর জ্বালায় একটাও কি থাকবে! ছেলে আর মেয়েদের তো ওই কাজ—পুরুষরাও ধরবে মাছ—আর ওরা দেবে পাহারা। তারপর জাহাজঘাটায় যেদিন ডাকজাহাজ ভিড়বে, বড়-বড় রবারের চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ী আসবে মাছ নিতে। তারপর আসবে সবার পেছনে চীনে সর্দার। হাতে হিসেবের খাতা।

—হু—লু—লু—লু—লু—লু—লু—লু

মুখের ভেতর দুই হাতের আঙুল পুরে দিয়ে ওরা অদ্ভুতভাবে এক বিকট শব্দ করে। সে-শব্দ এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া,ও-পাড়া থেকে সে-পাড়া জেলেদের কানে গিয়ে পৌঁছোয়। হাতের কাজ ফেলে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে চলে আসে সবাই। বলে —সর্দার এসেছে, সর্দার এসেছে—

একটা গুঞ্জন শোনা যায়। এই হপ্তার পাওনা মিলবে আজ। হপ্তা পেলে বাজারে যাবে চাল কিনতে, কেরোসিন কিনতে, কাপড় কিনতে। মেয়েরা যাবে চিরুনি কিনতে, গন্ধ তেল কিনতে। তারপর সন্ধ্যেবেলা নাচের আসর বসবে।

কালো পায়জামা পরা, ছুঁচোলো লম্বা গোঁফ চীনে সর্দারের। ল্যাং টোয়াং আজকের লোক নয়। তিরিশ বছরের ওপর এই কারবার তার। একচেটে। টাকা ধার দেয় বিপদে-আপদে। তারপর একদিন সুদের টাকা যখন অনেক জমে যায়, তখন আর সুদও দিতে পারে না, আসলও দিতে পারে না, দেয় মাছ। ভারী সস্তা দরে মাছ কিনে নেয় ল্যাং টোয়াং। মাছের দাম থেকে কিছু কেটে নেয় সুদ বাবদ, আর কিছু দেয় ওদের পেট চালাবার জন্যে। এত কম দেয় যাতে আরো দেনা করতে হয়—আর বাধ্য হয়ে আরো সস্তা দামে মাছ ছাড়তে হয়।

জাহাজ থেকে নামে কাপড়, সিগারেট, তামাকপাতা, চিনি, আরো কত কি। নামে চিঠি-পত্তরের থলি,······নামে সাদা চামড়ার কালো চামড়ার খালাসীরা······নামে খেলনা, ওষুধ, চা, সাবান যাবতীয় খুচরো মাল।

ওঠে কলার কাঁদি—ডালচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, সাবুদানা আর ওঠে মাছ—চিপ্‌সে শুকনো মাছ······নানান মাপের, নানান রকমের।

হপ্তায় তো একটা দিন। ওই দিনটায় জেলেদের ছুটি। মাছ ধরার বালাই নেই। মেয়েরা ফরসা কাপড় পরে ঝিনুকের গয়না পরে। এক মাইল দূরের শহরে যায় বেড়াতে। কাঁধে হাত দিয়ে চলে একটা লম্বা শেকলের মত। চীনে পাড়ার বাজারে জুয়ো চলে, নেশা করা চলে, চা-খাওয়া চলে। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন কারো বাড়ী ফেরবার কথা নয়।

ল্যাং টোয়াং চীৎকার করে ওঠে—মুকফু, পাঁচ লুপিয়া—বিশুখ, সাড়ে তিন লুপিয়া—ভিরমি, দো লুপিয়া—বোধক্‌···বোধক্‌···

বোধক নেই। জ্বরে ভুগছে, আসতে পারেনি। তার বিবি এলো এগিয়ে। মুঙ্‌রি। মুঙ্‌রি ঝিনুকের হারের তলায় নীল শামুকের লকেট্ ঝুলিয়েছে ঠোঁটে বিলাতী আলতা লাগিয়েছে।

চীনে সর্দার মুঙ্‌রিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো—বোধক্, এক লুপিয়া—

—এক লুপিয়ায় কী হবে সর্দার—মুঙ্‌রির গলা থেকে প্রতিবাদ ওঠে।

চীনে সর্দার ভ্রূক্ষেপ না করে চেঁচিয়ে চলে।

তারপর সকলের টাকা পাওয়া হলে ল্যাং টোয়াং বাঁধানো মোটা হিসেবের খাতাটা বার করে। এক একজন করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপসই দেয় আর ডান হাতটা পেতে রাখে টাকার জন্যে।

হাসপাতালের পূর্ব দিকের জানালা দিয়ে এ-সব দৃশ্য দেখা যায়। যখন এ-হাসপাতাল এখানে ওঠেনি, তখন এ-দিকটায় আরো বড় জেলেপাড়া ছিল। মুঙ্‌রির বাপের বাড়ী ছিল এ-পাড়ায়। বড়-বড় তালপাতার ছাউনি। নীচু হয়ে ঢুকতে হয়। এইখানে মরেছিল ভির্‌মির বাপ সাপের কামড়ে। বুড়ো হয়েছিল খুব। এইখানে একবার চোদ্দ বছর আগে ভূমিকম্পের সময় জল উঠেছিল। ঘর-বাড়ী সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল সেবার। সেই সময়ে একটা হাঙর ধরা পড়েছিল বোধকের জালে। বিরাট হাঙর সেটা। অমন হাঙর সমুদ্রের এ-ধারটায় বড় একটা দেখা যায় না। তাছাড়া হাঙর কাছাকাছি বিশেষ ওঠেও না। কেমন করে কি জানি ভূমিকম্পের সময়ে অত বড় হাঙর কি করে ভেসে এসে একেবারে ডাঙায় বোধকের জালে আটকে গিয়েছিল। সারা জেলে পাড়ার ছেলে-মেয়ে-বুড়োর নেমন্তন্ন হলো। বোধকের বিবি মুঙ্‌রি রাঁধলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নাচ-গান হলো। গোল হয়ে বসে গান আর ঘুরে-ঘুরে নাচ।

কিন্তু হাসপাতালটা হলো যুদ্ধ বাধবার পর।

সাহেবরা হাসপাতাল বানালে শহর থেকে দূরে, এই নারকোল আর তালগাছের ঘন ছায়ার আড়ালে। ওপরের উড়োজাহাজ থেকে এটা দেখা যায় না। এমন বিরাট একটা দোতলা বাড়ীর কোন চিহ্নই টের পাওয়া যায় না কোন দিক থেকে। অদ্ভুত ওই সাদা চামড়া সাহেবগুলোর বুদ্ধি। ঐ চীনে সর্দার ল্যাং টোয়াং এর চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান। যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় জাহাজ এল। এল সাহেব, মেম-সাহেবের দল। সব লাল নীল পোশাক পরা। যেমন ফণীমনসার বনে ফুল ফুটলে বাহার হয়, তেমনি রংদার বাহার।

সেবার চা, সাবান, সিগারেটের সঙ্গে আরো অনেক মাল নামলো। লোহা, ইট, কাঠ, চুন, সুরকি···গোলা-বারুদ···কামান···আরো হাজার রকমের নাম-না-জানা মাল। ভির্‌মি, মক্‌ফু, বিশুখের দল অবাক হয়ে গেল দেখে।

একদিন না-বলে-কয়ে ওদের বাড়ীগুলো দিলে ভেঙ্গে···মড়মড় ক'রে—কত পুরুষের ভিটে ওদের। থালা-বাসন সরানো হলো না। নোটিশ দিলে না সময় মত। ভেঙে অম্‌নি দিলেই হলো! ঐ ঘরের ভেতর রাঁধা

ভাত, কাপড়-চোপড়, সানকি, লোটা সব রয়েছে। মেয়েদের আবরু, ছেলেদের সম্মান—কিছুই কিছু নয়? ভেঙে ওমনি দিলেই হলো?

ক্ষেপে গিয়েছিল বিশুথ্। বিশুথ্ মাথা-গরমের লোক।

—মেরেই ফেলবে বেটাদের, ভেবেছে কি, মানুষ নই আমরা?

ধরে ফেললে বোধক্। বোধক্ ধীর-স্থির শান্ত প্রকৃতির। লম্বা-লম্বা বন্দুক ওদের হাতে, ভারী-ভারী জুতো; সবুজ রং-এর পোশাক, জাঁদরেল চেহারা সব—ওদের সঙ্গে ঝগড়া করা—পাগল না মাথা-খারাপ!

একবার ভূমিকম্পের সময়ে যেমন হয়েছিল, এবারও তেমনি সমস্ত ঘর-দোর ভেঙে এক ঘণ্টার মধ্যে সব তচনচ ক'রে দিলে। নতুন করে এরা আবার ওখানে গিয়ে ঘর বাঁধলে। ল্যাং টোয়াং-এর কাছে বেশী সুদে আবার টাকা ধার নিলে। সাদা চামড়ার সাহেবদের দাপটে পাড়া ফাঁকা হয়ে গেল। তারপর উঠলো ঐ হাসপাতাল। কাছ দিয়ে গেলেই ওষুধের কেমন একটা সোঁদা গন্ধ আসে। রাত্রিবেলা এরা যখন হাঁড়িয়া খায় আর গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচে, জানলার ফাঁকে-ফাঁকে আলো দেখা যায়। বিজলী আলো। সূর্যির মতন রাতকে একেবারে দিন বানিয়ে ছাড়ে, ঐ সাদা চামড়ার সাহেবরা!

বিরাট হাসপাতাল উঠলো ওখানে। কুলিরা এল জাহাজে চড়ে। ছ'মাস ধরে কাজ চললো। জরুরী কাজ, শীগ্‌গীর সারতে হবে। ইটের পর ইট গাঁথুনী। শহরের পশ্চিমে চীনে পাড়ায় রাত্রে কুলিরা জুয়ো খেলতে যেতো। এই জেলে পাড়ার লোকেদের বাজার করতে অবিশ্যি যেতে হতো ওখানে। ঐ চীনে পাড়ায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে। তবু তারই মধ্যে বাজারে গেলেই চণ্ডুর আড্ডা, চায়ের আড্ডা আর জুয়ার আড্ডার সঙ্গে রেডিওর গান শুনে আসা। আর সিনেমা। ছবিগুলো নড়ে, নাচে, গান গায়, কথা বলে। আগে ওখানে অমন ছিল না, যুদ্ধের আগেই যেন ভিড়টা বাড়লো। বড্ড ভিড় ও-দিককার রাস্তায়। উত্তর দিকে বড়-বড় ফাঁকা ফাঁকা বাড়ার মালিকদের মটর গাড়ী আছে। সেই মটরগুলো মাঝে-মাঝে ভিড়ের মধ্যে বেমালুম চালিয়ে দেয় বেপরোয়া। একবার চাকার তলায় পড়ে গেলেই ব্যস্। আর দেখতে হবে না। মোটরের বাঁশী বাজাতে-বাজাতে লোকের গায়ের ওপর চালিয়ে দেয় হাতীর মত বিরাট গাড়াগুলো। মায়া-দয়া নেই ওদের।

চীনেবাজার পেরিয়ে চললো দক্ষিণ দিকে।

দক্ষিণে সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে যত বাগান। লম্বা-লম্বা ঘেরা বাগানের মধ্যে কেবল কলার গাছ। একটা নয়, দুটো নয়—হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ। কলার বাগানের মালিকরা কিন্তু থাকে না ওখানে। তারা থাকে উত্তর দিকের

সৌখিন পাড়ায়। কারবার তাদের দক্ষিণে। দক্ষিণ-সমুদ্রের হাওয়ার দাপটে কলাগাছের পাতাগুলো পত্ পত্ করে ওড়ে। হপ্তায় একবার করে চালানী জাহাজ এসে ঠেকে জেটিতে। যেমন্ রবারের চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ীতে করে শুঁটকি মাছ ওঠে, তেমনি কুলির মাথায় ওঠে কলা। কলার কাঁদি। সেই মাছ সেই কলার কাঁদি কোথায় যায়, কে খায়—কে বলতে পারে। হাসপাতালের ছাদের ওপর উঠলে হয়ত দেখা যায় জাহাজ কোন দিকে যায়। কিন্তু এই নারকোল গাছের তলায় বালির ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে বেশী দূর দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া ওঠে জাহাজের চোঙ থেকে, পূবের আকাশটায় শুধু তারই কিছু আভাস লেগে থাকে এদিক-ওদিক।

আর শহরের মধ্যিখানে, ঠিক মধ্যিখানেই হলো গীর্জা। ঘড়ি-ঘর। চৌমাথার মোড়ে। চারিদিকে চারপাশে ঘেরা বাগান। একটা ছোট ফোয়ারা। উত্তর পাড়ার সাহেবদের ছেলেমেয়েরা ঝি'দের সঙ্গে ওইখানে আসে বেড়াতে।

হাসপাতালের চারদিকটা খোলা, ফাঁকা জায়গায় তৈরী করেছিল সাহেবরা ওটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্যবসা, জমিদারী করতে যে সাহেবরা আসতো, তাদের অসুখে-বিসুখে দেখাশোনা করার জন্যেই ওটা হয়েছিল বোধ হয়। পোলো খেলার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গল্‌ফ্ খেলার মাঠের মত ওটাও একটা অতি দরকারী জিনিস।

কিন্তু যুদ্ধের সময় সব বে-হাত হয়ে গেল।

চালানী জাহাজে ভর্তি হয়ে সব লালমুখো সাহেব একদিন হুড়মুড় করে চলে গেল। কোথায় গেল ভগবানই জানে। এল একদিন জাপানীরা। চীনেবাজার থেকে চীনেদের সব দিলে তাড়িয়ে। মারতে-মারতে। কতক ধরে নিয়ে গেল। আর সাহেব তো দেখতে পেলেই খুন। সঙ্গে-সঙ্গে। সে এক কাণ্ড বটে। শব্দের চোটে রাত্তিরে ঘুম হতো না। কী পেল্লায় শব্দ। যুদ্ধ হচ্ছে জাপানীদের সঙ্গে সাহেবদের। চীনে সর্দার ল্যাং টোয়াং আসতে পারে না।

সে-সব আজ থেকে অনেকদিন আগেকার কথা।

কত কাণ্ড ঘটে গেছে এরই মধ্যে। বোধকের বড় ছেলেটা বোমার টুকরো লেগে মরে গেল। ওই সমুদ্রের মধ্যে মাছ ধরতে গিয়েছিল, এমন সময় জাপানীদের বোমার ঘায়ে সাহেব কোম্পানির চালানী জাহাজটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। পরের দিন সকালে ঢেউ-এর সঙ্গে সাদা চামড়ার লাশগুলো ভেসে আসতে লাগলো ডাঙ্গায়। বোধকের ছেলেটার লাশও এসে লাগলো হাসপাতালটার সামনে।

যুদ্ধের আগের দিন তো সব পালালো। সব সাহেবগুলো। যে-গুলো

পালালো, সবগুলোই কি বাঁচতে পেরেছে? কতক মরলো বোমার ঘায়ে আর কতক মরলো আধমরা অবস্থায় জলে ডুবে।

হাসপাতাল থেকে ডাক্তাররা দেখেছে, নার্সরা দেখেছে।

তখন ডাক্তার ছিল বুড়ো জন্‌সন্ সাহেব। ছুঁচলো দাড়ি—মুখে লম্বা এক পাইপ। যেদিন চালানী জাহাজ আসতো জেটিতে, জন্‌সন্ সাহেব হাসপাতাল থেকে নিজে এসে পার্শেল আর চিঠিপত্র নিয়ে যেতো। জেটির পথে জেলেদের ছেলে-মেয়েদের হাতে পয়সা দিতে দিতে যেতো—আশী বছরের থুথ্‌থুড়ে বুড়ো জন্‌সন ডাক্তার।

তারপর এল ওকিকুরা সাহেব।

বেঁটে—নাক চ্যাপটা জাপানী ডাক্তার। রাতারাতি পাল্‌টে গেল নার্সের দল। কোত্থেকে জাপানী মেয়েরা এল উড়োজাহাজে চড়ে। দিনরাত তারা কাজ করে, বেড়ানো নয়, কারু দিকে চেয়ে দেখা নয়। শুধু কাজ আর কাজ। কোত্থেকে জাহাজ ভর্তি শুধু রুগী আসে। হাতে-পায়ে মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কান্নায় ভারী হয়ে যায় জেটিঘাট। কারু উড়ে গেছে আধখানা ধড়, কারু চোখ উপ্‌ড়ে গেছে, গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ করে আওয়াজ বেরোয়। হাসপাতালে নিয়ে আসে সকলকে। কেউ রাস্তাতেই মারা যায়, কেউ দু'দিন বাঁচে, কেউ দু'ঘণ্টা।

তারপর যেদিন বিশুখ্ ভিরমির দল গরমের সময় বাইরে শুয়েছে, দেখেছে চুপি-চুপি রাত্তির বেলার অন্ধকারে ঠেলাগাড়ী করে মরা মানুষগুলোকে নৌকো বোঝাই করে কোথায় কোন দূর দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত দূরে গিয়ে কোথাও পুঁতে ফেলবে। হয়ত পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

সে-সব যুদ্ধের সময়কার কথা। তখন কে বাঁচে—কে-মরে অবস্থা। দিনরাত সাইরেন বেজে ওঠে। গীর্জা-ঘরের আশেপাশের বাগানে ট্রেঞ্চ হলো খোঁড়া। দুম্‌দাম্ শব্দ শুধু। মাছ ধরতে ভয় লাগে, কখন ডুবো জাহাজ এসে ছুঁড়বে কামান। এক একদিন বোমা পড়তো উড়োজাহাজ থেকে ডুবোজাহাজের ওপর—আর খানিক পরে নীল জল বেগুনী হয়ে উঠতো। সে সব কী ভয়ানক দিন—কী ভীষণ রাত সে-সব।

সব পাল্টে গেছে এখন। চীনে বাজারের মোড়ে আবার সেই আগেকার মতন ল্যাং টোয়াং হপ্তার দিন চণ্ডুর আড্ডায় গিয়ে বসে। জেলে পাড়ার লোকেরা আবার ওইখান দিয়ে লিংফুর দোকানে গিয়ে সওদা করে। কাদা ছিটোতে-ছিটোতে কলা বাগানের সাহেব-মালিক উইলসন্ সাহেবের বিরাট গাড়ীখানা ছুটে চলে। উইলসন্ সাহেবের ড্রাইভার বলে যেন ঠ্যাকারে তার মাটিতে পা পড়ে না। হোটেলখানার সামনে আবার তেমনি চৌকিতে বসে

বসে ঝুঁটি বাঁধা বুড়ি বিধবা মাং-তু পা দোলায়, আর রাস্তার সামনে চেয়ে দেখে। সামনের হোটেলে রেডিও লাগিয়েছে, চকমকি বাতি লাগিয়েছে—সব খদ্দের ওখানে গিয়ে ভিড় করছে। হিংসেতে বিধবা বুড়ি মাং-তুর পোড়া মুখ আবার তেমনি করে পুড়ে যায়। দাঁতের ডাক্তার যুদ্ধের সময় কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল। আবার এসেছে। আবার দোকানের সামনে কাঁচের আলমারী করেছে। আলমারীর মধ্যে একমুখ বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা একটা প্রকাণ্ড মুণ্ডু সাজানো। আবার চীনে বাজারের চীনেরা এখানে এসে বাজার জমিয়েছে। জাপানীদের সময় চীনে কি একটাও ছিল!

ওকিকুরা ডাক্তারের পর এসেছে ছোকরাবয়েসী সাহেব কর্নেল ওয়াটসন্।

লম্বা-লম্বা গড়ন। ছিপছিপে ফিটফাট চেহারা, দিনরাত বই পড়ে, বই পড়ে-পড়ে চোখ বোধ হয় খারাপ করে ফেলেছে—মোটা কাঁচের চশমা পরা। বুড়ি মেট্রন কর্নেল ওয়াট্‌সনের পেছনে-পেছনে চলে। ধপধপে সাদা গাউন, মাথায় সাদা রুমাল। পাকা চুলগুলো তাতে ঢাকা পড়েছে।

হল্‌ঘর পেরিয়ে যাবার পথে জানালা দিয়ে বাইরে একবার নজর ফেললে।

আজ বুঝি চালানী জাহাজ আসবার দিন। ল্যাং টোয়াংএর গলা এখন থেকে স্পষ্ট শোনা যায়——ভিরমি ছে লুপিয়া—বোধক্, এক লুপিয়া——বিশুথ, তিন .....

বারান্দা পার হয়ে মেট্রনকে নিয়ে উত্তরের হল-এ এসে পৌছুলেন ডাক্তার। কোথাও কোনও ময়লা, কোথাও কোনও অপরিষ্কার নেই, ঝক্‌ঝকে-চক্‌চকে মেঝে। রোদ এসে পড়েছে মেঝের ওপর! সকাল থেকে পরিষ্কার হচ্ছে আজ। হেড অফিস থেকে সেক্রেটারী এসেছে। আজ সমস্ত তদারক হবে। বছরে একবার করে তিনি আসেন। আজকের তদারকের ওপর বহুলোকের উন্নতি নির্ভর করছে।

কর্নেল ওয়াটসন্ সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

সন্ত্রস্ত হয়ে মেট্রন সামনে এগিয়ে এল।

—ওগুলো কী, ঐ যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, ওগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি কেন, যত সব জঞ্জাল—

সিঁড়ি দিয়ে না নেমে কর্নেল সোজা বাঁ-দিকে ঘুরে এলেন। প্রথম বাঁ-দিকে একটা কেবিন। কেবিন-এর সামনে লালকালিতে লেখা "silence" অর্থাৎ "চুপ"! আর তার নিচেই মোটা-মোটা হরফে কালো কালিতে কাঠের ওপর লেখা—**"কেস নম্বর ৪৯"**

মেট্রন নিজে থেকেই বললে—সকালবেলা দেখে গেছি, ঘুমচ্ছিল স্যার—

কর্নেল ওয়াটসন্ পকেট থেকে নোট বইটা বার করলেন। অনেক পাতা

উল্টে-উল্টে একটা পাতায় চোখটা আটকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন—এর ক'বছর হলো এখানে ?

মেট্রন এগিয়ে এল। বললে—জাপানীদের সময় থেকেই আছে স্যার—এখনও সারলো না মোটে……

কর্নেল আবার জিজ্ঞেস করলেন—'মেডিকেল জার্নালে' তো এই কেসটার কথাই বেরিয়েছিল না ? একটা ছবি আর পুরো ইতিহাস, না ?

মেট্রন বললে—হ্যাঁ স্যার, এইটেই তো সেই "কেস নম্বর ৪৯", যা নিয়ে আমেরিকার মেডিকেল জার্নালে এখনও প্রবন্ধ বেরোয়—

কর্নেল নোট বই-এর পাতাটা আর একবার দেখে বললেন—আচ্ছা, একে দেখতেই কি বার্লিন থেকে ডাক্তার সুলজ্ বার্জার আসেন, না ?

মেট্রন বললে—হ্যাঁ, আর আমেরিকা থেকে আসেন মেডিকেল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার থিয়োডোর ক্লেয়ার—

হঠাৎ মেট্রনের মুখের দিকে চেয়ে কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—এখন কেমন আছে রোগী ? আর কতদিন এখানে রাখবো—

কিন্তু মেট্রনের উত্তরের ভরসা না করে কর্নেল আস্তে-আস্তে নিজেই কেবিনের দোলানো দরজাটা ঠেললেন। বাইরে আলো। ঘরের ভেতরে অন্ধকার। প্রথমটা একটু ধাঁধা লাগলো। কিন্তু ভাল করে নজর করতেই চমকে উঠলেন কর্নেল ওয়াটসন্। ঘরে কেউ নেই !

এ কাহিনী বলতে গেলে আরো কিছুদিন পেছিয়ে যেতে হয়। পেছিয়ে যেতে হয় আরো কয়েক বছর। 'কেস নম্বর ৪৯'-এর তখন একটা নাম ছিল। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন সবে যুদ্ধ বেধেছে। একদিন সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে সে এখানে এসেছিল-এই যুদ্ধক্ষেত্রে। তারপর কত কি ঘটে গেল কিছুই মনে নেই। ডাক্তার আসে আর তাকে পরীক্ষা করে যায়। সারা শরীর পরীক্ষা করে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে।

রোগা-লম্বা ডাক্তার জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম কী ?

সে হাঁ করে চেয়ে থাকে। নিজের নাম তো সে মনে করতে পারে না।

—কোথায় বাড়ী তোমার ?

—জানিনে।

—কবে এলে এখানে ?

—জানিনে।

—তোমার রেজিমেন্টের নম্বর কত ?

—তা-তো জানিনে,—এখানেতো সবাই আমায় 'কেস নম্বর ৪৯' বলেই ডাকে—

হাজার-হাজার প্রশ্ন। প্রশ্নের আর শেষ নেই। তাও কি শুধু একজন ? কোথা থেকে নতুন-নতুন সব ডাক্তার আসে। মেট্রন থাকে সঙ্গে। আর তাকে নিয়ে চলে গবেষণা। তার নাম, নিয়ে ধাম নিয়ে। কত ছবি তোলে তার। সে ছবি নাকি বিলেতের, জার্মানীর সব ডাক্তারী পত্রিকায় ছাপা হয়। জাপানী ডাক্তাররা যখন ছিল, তখনও তেমনি চলতো। সে যেন সকলের কৌতুহলের জিনিষ, সকলের কৌতুকের বিষয় তার যেন জীবন নেই। তাকে যেন সবাই ইঁদুর কিংবা গিনিপিগ পেয়েছে। যা ইচ্ছে তাই যেন করা চলে তাকে নিয়ে। এক-একদিন তাকে পা দু'টো উঁচু করে আর মাথাটা নিচের দিক করে শুইয়ে রেখেছে। তার পরদিন এসে আবার নানান পরীক্ষা। ফল হচ্ছে কি না দেখা চাই। হয়ত দু'দিন উপরি উপরি উপোষ করিয়ে রাখলে। তার সঙ্গে নানান রং-এর নানান আস্বাদের ওষুধ। মুখ তেতো হয়ে যায়—বমি হয়ে আসে। কখনও-কখনও কাঁচকলা সেদ্ধ খাওয়া। নুন নয়, তেল নয়—কিছু নয়। ফল ফলতেও পারে। সে যদি সেরে ওঠে বা স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়, ডাক্তারদের খুব নাম হবে, টাকা হবে, প্রতিষ্ঠা হবে। ডাক্তাররা নাম করবার ফিকিরে তাকে নিয়ে এই টানা-হ্যাঁচড়া করছে। তার বেঁচে থাকলেও যা, মরে গেলেও তাই। কিছু আসে যায় না কারুর।

—মেট্রন, কাল থেকে শুধু নিমপাতা খাইয়ে রাখবে একে—

ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে চলে গেল। ভয়ে তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনি চলবে তাকে নিয়ে। এর আর শেষ নেই। এর আর পার নেই। কত বছর যে এমনি চলছে, তা সে মনে করতে পারে না। তবে বড় কষ্ট হয় তার। শারীরিক কষ্ট।

যখন কেউ ঘরে থাকে না, তখন সে বিছানা থেকে উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওখানে কত বড় পৃথিবী। কত লোকজন। কত আনন্দ, হাসি, খেলা। ওখানে যাবার অধিকার নেই তার। তাকে কেবল বন্দী হয়ে থাকতে হবে। ডাক্তারদের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভর করে তাকে জীবন কাটাতে হবে। ডাক্তারদের অভিরুচির ওপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

গায়ের ঘা-গুলো সেরে গেছে। এখন কোনও যন্ত্রণা হয় না আর। বেশ সুস্থ হয়েছে সে। অনুমতি পেলে সে বেরিয়ে যেতে পারে। ওই বালির সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছ ধরা দেখতে পারে।

এই কিছুদিন আগেও তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। ভীষণ ভারী মনে হতো মাথাটা। তারপর ব্যাণ্ডেজটা ডাক্তার এসে একদিন খুলে দিয়েছে। এখন তার কোনও কষ্ট নেই, কেবল ওই এক কষ্ট ছাড়া। শুধু বিচিত্র সব জিনিস খেতে দেয় ওরা। যা মোটে ভাল লাগে না। বিস্বাদ হয়ে যায় সমস্ত মুখ, শরীর, সমস্ত আত্মা। আকাশের শকুনের মত যদি সে উড়তে পেত। যদি অন্ততঃ ওই জেলেদের সঙ্গে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতে যেতে পারতো। ওই যে জাহাজটা এসেছে, ওখানে আজ কত ভিড়! বড় ডাক্তার হাঁটতে-হাঁটতে চলেছে। কত মাল নামছে। ওরা স্বাধীন। কেউ ওদের আটকায় না। তার বেলাতেই শুধু এই বন্দীত্ব।

এক একদিন রাত্রে—গভীর রাত্রে যখন ঘুম আসে না তার, ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সে। পায়চারি করে আর ভাবে। এলোপাতাড়ি ভাবনা সব; যার আগা নেই, যার শেষ নেই। তার মনে হয় কোত্থেকে সে এল এখানে। আবার কোথায়ই বা সে যাবে, কেনই বা এখানে সে রয়েছে; কে তাকে এখানে এনেছে। ডাক্তাররা এসে কত অদ্ভুত প্রশ্ন তাকে করে, সে কী করে সে-সব কথার উত্তর দেবে! আর উত্তর দিতে না পারলে বুঝি ওরা ছাড়বে না। তাকে ওরা ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে চিরে-চিরে দেখতে চায়। সে বেঁচে থাকুক, সে প্রশ্ন যেন বড় নয়।

ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করে—কী খেতে তোমার ইচ্ছে করে?

সে অনেকক্ষণ ধরে ভাবে। সত্যি, কী তার খেতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষণ ভেবেও কিছুতে আর কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। শেষে বলে—আমাকে ছেড়ে দিন, ডাক্তারবাবু—

—ছেড়ে দিলে তুমি কোথায় যাবে?—জিজ্ঞেস করে ডাক্তার।

—ওই সমুদ্রের ধারে যাবো, ওই যেখানে জেলেরা মাছ ধরছে, তারপর নৌকো করে ওদের সঙ্গে সমুদ্রের মাঝখানে যাবো—

—যদি ডুবে যাও?

তাই তো। ডুবে যাওয়া মানে তো নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরে যাওয়া। অর্থাৎ আর বাঁচবে না সে। এই পৃথিবী, এই আলো বাতাস, ওই পাখীরা, ওই সমুদ্র কিছুই সে আর দেখতে পাবে না।

ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করে—কী খাবে তুমি? কী খেয়ে বাঁচবে? কে তোমাকে খাওয়াবে?

সে-কথার কোন উত্তর দিতে পারে না সে। কেউ খেতে দিলে তবেই তো লোক খেতে পায়। সত্যিই তো সে খাবে কী। কে তাকে খেতে দেবে। এখানে তার কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু রাত্তির বেলা নার্স এসে বিছানা পেতে দেয়,

মশারী টাঙিয়ে দেয়। স্নান করবার জন্যে তেল দেয়। ডাক্তার ভাবে যে তার রোগ বুঝি সারে নি এখনও। মেট্রনকে চুপি-চুপি কী বলে সে শুনতে পায় না। কঠিন দৃষ্টি দিয়ে সে ডাক্তারকে অনুসরণ করে। লোকগুলো কী নির্মম।

তারপর আর একদিন ডাক্তার আসে হাতে নোটবই নিয়ে। সেই প্রশ্ন—

—তোমার নাম কী? তোমার দেশ কোথায়? তোমার বাবার নাম কী? তোমার রেজিমেন্টের নম্বর কত?

অসংখ্য প্রশ্ন। অসীম কৌতূহল। একটারও জবাব দিতে পারে না সে। সমস্ত পৃথিবী হাতড়ে বেড়ায়। কোথাও কোনও আশার ইঙ্গিত নেই। এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে যেন তার নিষ্কৃতি নেই। যেন জবাব না দিতে পারলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনি অত্যাচার চলবে। কত রকমের ওষুধ, কত রকমের চিকিৎসা চলে। কিছুই মনঃপূত হয় না. তাদের পরীক্ষার যেন আর অন্ত নেই।

একদিন মেট্রন এসে অনেকগুলো বই দিয়ে গেল। নানান রঙ-এর বই সব। ছবিওয়ালা অফুরন্ত গল্প। প্রথম-প্রথম পড়তে একটু আড়ষ্ট লাগলো। কতদিন কত বছর বই পড়েনি, বই পড়তে-পড়তে তন্ময় হয়ে যায় সে। কত দেশ, কত লোক, কত আকাশ, কত পাখী, কত কথা আছে পৃথিবীতে। কত সমুদ্র কত সবুজ, কত সুখ কত মধুর কত গভীর। এই ছোট হাস-পাতালের বাইরে বিরাট পৃথিবী পড়ে আছে। এই সমুদ্রের ওপারে কত জন-পদ, কত মানুষ। সেখানে মানুষকে মানুষ ভালবাসে, মানুষকে মানুষ কাঁদায়, হাসিকান্নায় ভরা পৃথিবী আমাদের। ওই আকাশের যে তারাগুলো ঝিকমিক করছে, ওরা কত বড় গ্রহ সব। এ-আকাশের যেমন সীমা নেই, এই পৃথিবীরও বুঝি তেমনি সীমা নেই। এই সীমাহীন পৃথিবীর সে-ও তো একজন, তারও তো অধিকার আছে এখানে বেঁচে থাকবার, জীবন উপভোগ করবার। তারও মন তো আকাশের নীলে আর মাটির সবুজে দুলে ওঠে। সে কেন এখানে বন্দী হয়ে আছে! এই সব এলোপাতাড়ি ভাবনা সারাদিন সারারাত।

নানান দেশের খবরের কাগজ এনে দেয় মেট্রন। কত খবর। কবে বুঝি যুদ্ধ হয়েছিল পৃথিবীতে। বিশ্বজোড়া যুদ্ধ। তারই জের চলেছে চারিদিকে। এটম্ বোমা কাকে বলে। একটা ফাটলে সমস্ত বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়। আমেরিকা আর ইংলণ্ড, আফ্রিকা আর রাশিয়া, চায়না আর ইণ্ডিয়া—এত সব দেশের নাম।

একদিন একটা বই পড়তে-পড়তে হঠাৎ তার এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো, বড় অদ্ভুত অনুভূতি। সমস্ত শিরায়-শিরায় রক্ত-সঞ্চালন শুরু হলো, যেন নতুন করে সে জন্মাল। নতুন করে দৃষ্টিশক্তি পেল। নতুন করে নিশ্বাস নিল।

সমস্ত অদেখা পৃথিবী যেন হঠাৎ তার নতুন করে দেখা হয়ে গেল, রোমাঞ্চ হলো সমস্ত শরীরে।

হঠাৎ মনে হলো সে যেন অসহায় নয়। তারও আপন জন আছে। আত্মীয় আছে। মনে হলো অকারণে সে এখানে বন্দী হয়ে আছে। সে যদি জোর করে ছাড়াতে চায়, ছাড়াতে পারে। বইটা পড়তে-পড়তে চোখ দু'টো লাল হয়ে এল। হাত দু'টো অবশ হয়ে এল। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে পাঁচশো পাতার বইটা সে পাতার পর পাতা পড়ে চললো।

মনে হলো বইতে যা সে পড়ছে, তা' যেন তারই নিজের কথা। হুবহু যেন তারই জীবন। কলকাতার সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেনের বাড়ীটা তাদের। সেই তাদের গোবিন্দ চাকর। গলি বটে কিন্তু বাড়িটা বিরাট। অত বড় বিরাট বাড়িতে সে থাকতো আর থাকতো তার বাবা। দুপুরবেলা যেদিন স্কুলের ছুটি থাকতো, আর বাবা গেছে কলেজে পড়াতে, তখনকার সেই নিঃসঙ্গতা। গরমের দিনে কাঠি বরফওয়ালার সেই তৃষ্ণার্ত চীৎকার।

চাই বরফ—কাঠি বরফ—।

তারপর ঠং ঠং করতে করতে বাসনওয়ালার নিয়ম করে যাওয়া।

হুবহু সব তারই মত—

তার কথা কে এমন করে লিখলে। সে একদিন যুদ্ধে গেল কাউকে না বলে। বাবার এক মাত্র ছেলে, প্রচুর টাকা, প্রচুর ঐশ্বর্য। সমস্ত ছেড়ে সে গেল যুদ্ধে, কিন্তু কেন গেল? শুধু নিঃসঙ্গতা এড়াবার জন্যে। পৃথিবীকে জানবার আগ্রহ কি তার ছিল না? কিংবা ছোটবেলায় যে-মাকে সে হারিয়েছে, সেই মা-ই হয়ত তাকে আকাশের তারায় তারায় হাতছানি দিয়ে বাড়ির মায়া ছাড়িয়েছে। কে বলতে পারে!

পাঁচ'শ পাতার বই। বইখানা তার চোখের ঘুম, শরীরে আরাম কেরে নিলে। সব মনে পড়তে লাগলো একে-একে।

···তারপর সেই যুদ্ধ, সেই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। সে মূর্ছিত হয়ে পড়লো, কী বিকট শব্দ, কী নিদারুণ আঘাত। মাথায় লাগলো কামানের গোলার টুকরো, ঠিকরে সে পড়লো মাটিতে। আর তারপর জ্ঞান ফিরতে না ফিরতে আর একটা কামানের গোলা এসে পড়লো সামনে। মাটির গুঁড়ো আর ঘাসের চাপড়ায় সে ঢাকা পড়ে গেল। সবাই জানলো সে মারা পড়েছে। তার বাবার কাছে টেলিগ্রাম পৌঁছুল। সম্মানের সঙ্গে তাঁর ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে······

পাঁচ'শ পাতার বই লিখেছে তার বাবা, লিখেছে তাকে কেন্দ্র করে। দর্শনের অধ্যাপক নিত্যানন্দ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ উপাধি পেয়েছেন

এই বইখানা লিখে। অপূর্ব এই বই, সারা দেশময় নাম ছড়িয়ে গেছে তাঁর। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে এই বই চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। কত হাজার বিক্রি হয়েছে পৃথিবীতে, তার হিসেব ছাপা আছে প্রথম পাতায়। কি অদ্ভুত বই, পড়তে নেশা লেগে গেছে!

রাতুল! রাতুল!

'কেস্ নম্বর ৪৯'-এর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তার নাম রাতুল। রাতুল সেন। দেশ তার কলকাতায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ। সমস্ত মনে পড়েছে তার। তার দেশ আছে, তার বাবা আছে, সে বন্দী নয়।

মেট্রন এসে প্রশ্ন করলে—এ বই-টা এখনও পড়া হয়নি?

—না, এটা থাক্—রাতুল বললে।

একবার, দু'বার পড়েও পুরনো হয় না। অন্য বই আর পড়া হয় না তার। পড়তে ভালো লাগে না। তার বাবা ডাক্তার নিত্যানন্দ সেন-এর লেখা 'পরলোকতত্ত্ব' খানা নিয়ে ঘুমনো, আবার ঘুম থেকে উঠে পড়া। কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল অমূল্য রত্ন, বহুদিন পরে তা আবার কুড়িয়ে পাওয়া গেল। তাকে নিয়ে তার বাবা বই লিখেছে। ঠিক তাকে নিয়ে নয়। তার মৃত আত্মাকে নিয়ে। রাতুলের মৃত আত্মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, রাতুলের পিতৃভক্তি, স্বর্গে গিয়েও বাবার জন্যে রাতুলের মিলনাকাঙ্ক্ষা—সমস্ত কথা। কিন্তু কী গভীর অনুরাগ! রাতুলের মনে পড়লো—তার যুদ্ধে যাওয়াতে বাবার সে কী যন্ত্রণা তার সমস্ত চিঠিতে কী গভীর অনুরাগ ফুটে উঠতো। সিঙ্গাপুর থেকে মালয়, মালয় থেকে ফিলিপাইন্স্—যেখানে-যেখানে সে গেছে বাবার সেই চিঠিগুলো তাকে অনুসরণ করেছে। এক একবার তখন তার মনে হয়েছে কেন সে যুদ্ধে এল। বাবার মনে কষ্ট দিয়ে কেন সে এল এই বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে। রাইফেল চালাতে-চালাতে যখন ধোঁয়ায় সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠতো, তখন সে হারিয়ে যেত অসীমে। তার জ্ঞান থাকতো না কোনও দিকে। তার বন্ধুরা বলতো সে নাকি খুব সাহসী, বীরত্বে তাদের রেজিমেণ্টে তার তুলনা ছিল না। কিন্তু রাতুল কেবল নিজেই জানতো কতখানি অসহায় সে। দূর থেকে বাবার স্মৃতিই তাকে পাগল করে তুলতো, বাবার কথা মনে পড়লে সে অধীর হয়ে পড়তো। তখন আর তার কাণ্ডজ্ঞান থাকতো না, রাইফেলের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস কালো করে তুলতো—যেন কোনও দিক থেকে কোনও ফাঁক কোথাও না থাকে। তা' হলেই তো তার বাবার মুখখানা মনে পড়বে।

বইটার প্রতি লাইনে রাতুলের জন্যে কী ব্যাকুলতা! রাতুলকে দেখবার কী দুর্বার আগ্রহ, তা'কে মৃত মনে করে কি অপার আগ্রহে পরলোক নিয়ে

দিনের পর দিন সাধনা করেছেন। সেও তো শুধু রাতুলকে দেখবার আগ্রহেই, রাতুলের সঙ্গে কথা বলবার বাসনাতেই।

হঠাৎ বাবার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো রাতুলের।

সকালবেলাই মেট্রন আসবে। প্রতিদিনের মত সেই একঘেয়ে প্রশ্ন।

রাতুল আস্তে-আস্তে দরজা খুললে। একটু বুঝি শব্দ হলো, তা হোক্। কিছু ক্ষতি নেই। সবাই ঘুমোচ্ছে। পা টিপে-টিপে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে, তখনও সিঁড়ির আলোটা জ্বলছে। কী জানি কেন রাতুলের ভয় হলো না। সে আবার তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। এখন ভয় করলে চলে না। পেছনের গেটটা পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল যেদিকে জাহাজঘাটা।

জেলেদের ছুটি আজ। মস্ত বড়-বড় কুমীরের মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে নৌকোগুলো। নারকোল গাছের পাতাগুলো শিরশির আওয়াজ করে। পেছনে যেন কারা অনুসরণ করছে তাকে। যদি তারা তা'কে ধরে ফেলে? হাসপাতালের দিকে ফিরে চাইলে রাতুল। সামান্য কয়েকটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে চারিদিকে।

আস্তে-আস্তে রাতুল জেটিতে এসে উঠলো। শেষ রাত নিঝুম হয়ে আছে। জেটির প্রহরী টুলের ওপর ঘুমে অচেতন। রাতুল চুপি-চুপি এসে দাঁড়াল ডেকের ওপর। ওপরে নির্মুক্ত আকাশ। অসংখ্য তারার ভিড়। হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ হলো ওপাশে।

চট্‌করে রাতুল এক নিমেষে ডেকের তলায় গিয়ে আত্মগোপন করলো।

কর্নেল ওয়াটসন্ মেট্রনের দিকে ফিরলেন।

বললেন—কই—'কেস নম্বর ৪৯' কই? তোমার রোগী?

মুখ শুকিয়ে গেছে মেট্রনের। কিছু উত্তর খুঁজে না পেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেল ওয়াটসন্ গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললেন—কোথায় গেল রোগী? উত্তর দাও—

মেট্রন চুপ। ওয়াটসন্ আর বাক্যব্যয় করলেন না। সোজা নীচে নেমে এলেন। ডাকলেন—দারোয়ান—দারোয়ান—

দারোয়ান এল। মালয়ী দারোয়ান। বয়স চল্লিশ হবে—গোঁফ দাঁড়ি ওঠেনি। ডাক্তার বললেন—দারোয়ান, চারিদিকে লোক পাঠাও, এখুনি ......'কেস নম্বর ৪৯' পালিয়েছে—যেখান থেকেই হোক্ খুঁজে আনা চাই—

মোটা চশমার নীচে কর্নেল ওয়াটসনের চোখ দু'টো উদ্বেগ-আকুল হয়ে উঠলো।

'কেস নম্বর ৪৯' পালিয়েছে!

লোক গেল শহরের উত্তর পাড়ায়। আর একজন গেল চীনে পাড়ার বাজারে। ল্যাং টোয়াং-এর চণ্ডুর আড্ডায়। বিধবা মাং-তু হোটেলখানার সামনে বসে যেখানে একমনে পা দোলায়, সেখানে। সামনের হোটেলে তখনও রেডিও শুরু হয়নি। দাঁতের ডাক্তারের কাঁচের আলমারির মধ্যে বত্রিশপাটি দাঁত বের করা একটা প্রকাণ্ড মুণ্ডু সাজানো। কলার বাগানের মালিক উইলসন্ সাহেবের মোটর গাড়িটা তখন হু-হু করে দক্ষিণমুখে চলেছে সাহেবকে নিয়ে।

আর একজন গেল পুব পাড়ার সমুদ্র ঘেঁষে জেলে পাড়ায়। জেলেরা তখন নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে অনেক দূরে। কাল হপ্তা পেয়েছে, তাই অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে সবাই। কিন্তু ভোর থেকে আবার সবাই কাজে লেগে গেছে। বিশুখ্ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে জাল শুকোতে দিচ্ছিল। কাল পেটের অসুখের জন্যে আজ কামাই করেছে।

বিশুখ্ বললে—কাকে খুঁজছো সেপাই সাহেব?

—রুগী ভেগেছে—হাসপাতালের রুগী—এদিকে দেখেছিস্ তোরা—

তাজ্জব ব্যাপার। বিশুখ্ মজা পেলে। হাসপাতালের রুগীও আবার ভাগে নাকি? দেখ্‌গে গিয়ে চীনে পাড়ায়! ল্যাং টোয়াং-এর চণ্ডুর আড্ডায়। এতক্ষণ হয়ত কলকে ফাটিয়ে চিৎ-পটাং হয়ে ইটে মাথা দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। নয়ত কলা বাগানের জঙ্গলের ভেতর। আর সেখানে গিয়ে লুকিয়েও যদি থাকে, এতক্ষণ কি বেঁচে আছে ভেবেছ? বুনো শুয়োরেই তাকে সাবাড় করে দিয়েছে হয়ত।

বিধবা বুড়ী মাং-তুর কানে গেল।

ওদিকে ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে লা—

কেউ জবাব দিলে না কথার। বিধবা মাং-তুর কথায় কখনও জবাব দেয় না কেউ।

দাঁতের ডাক্তার সাঁড়াশি হাতে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেয়া হুয়া—

উইলসন্ সাহেবের গাড়ী হু-হু বেগে ছুটে আসছে যমদূতের মত। ভিড় দেখে একটু যে থামা, তা নয়। একেবারে সোজা ঘাড়ের ওপর চালিয়ে দেবে নাকি রে বাবা। পালা—পালা—। ড্রাইভারটার ঠেকারে দেখছি পা পড়ে না মাটিতে। লোকগুলো সরে এসে দাঁড়াল, আর পাশ দিয়ে গাড়ীটা সোঁ-ও-ও করে বেরিয়ে গেল। উইলসন্ সাহেবের গলা চলতি গাড়ী থেকেও অস্ফুট শোনা গেল—ব্লাডি সোয়াইন্—

লোকরা সব দিক থেকে ফিরে এল হাসপাতালে। তন্ন তন্ন করে

খুঁজেছে সবাই। কোথাও পাওয়া যায় নি।

কর্নেল ওয়াটসন্ দাঁতে-দাঁত চাপলেন! মোটা চশমার ভেতর চোখ দু'টোর চেহারা দেখা গেল না।

মেট্রন সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

কর্নেল ওয়াটসন্ গম্ভীর গলায় বললেন—কোথায়-কোথায় খুঁজলো সব—

বললে ওরা। হুজুরের কথামত কোনও দিকে আর বাদ দেয়নি তারা। শহর চুঁড়ে ফেলেছে। চীনে পাড়া, জেলে পাড়া, উত্তর পাড়া, কলা বাগান ……সব……

—জাহাজে দেখেছিস—জাহাজে, জাহাজের ভেতর?

—দৌড়-দৌড়। জাহাজ তো দেখা হয় নি। কিন্তু জাহাজ কি এতক্ষণ আছে আর। সে তো মাঝ দরিয়ায়। ভুস্-ভুস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কতদূর চলে গেছে। কারুর মাথায় সে খেয়াল তো হয় নি। যখন ওরা এসে দাঁড়াল জেটি-ঘাটায়, তখন জাহাজের মাস্তুলও আর দেখা যায় না। শুধু নীল আকাশের গায়ে ধোঁয়ার পাতলা সর ভেসে রয়েছে এদিক-ওদিক।

কড়্ কড়্ করে চেন টানার শব্দ। পাটাতনের ওপর একপাশ দিয়ে মোটা-মোটা লোহার শিকলি গড়গড় করে গড়িয়ে চলছে। পায়ে লেগে গেলে পড়ে যাবার মত।

ঢন্—ঢন্—ঢন্!

কোন্ দিক থেকে ঘন্টা বেজে উঠলো। অথচ ঘড়ির আওয়াজের মত নয়। মাথার ওপর দুম্-দুম্ পায়ের শব্দ। চারিদিকে কাউকে দেখা যায় না।

পাশের একটা খাঁচায় এক পাল মুরগী লড়াই লাগিয়েছে। একটা মুরগী সুবিধে পেয়ে ডেকে উঠলো—কোঁ কোঁর্—কোঁ-ও-ও-ও—

তবে বোধ হয় ভোর হলো পৃথিবীতে। পাশের ইঞ্জিন ঘরে হুড়-হুড় করে কয়লা ঢালছে। আর ধুপ্-ধুপ্ করে কয়লা ভাঙার শব্দ। ধুলোতে তো গা ভর্তি হয়ে গেছে। ওদিক থেকে দিনরাত শুঁটকি মাছের গন্ধ আসে। সে গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বমি হবার যোগাড়।

শুধু দোলা। দিনের পর দিন শুধু দোলা। দোল খেয়ে-খেয়ে মাথাটা শুধু ঘোরে। খাওয়া নেই পেটে। ঘুম নেই ভালো। আর কেবল বমি। দুর্গন্ধ চারদিকে। সূর্যের আলো যেন কত বছর দেখেনি। শুধু অন্ধকার আর দুলুনি।

—সারেঙ্ সাহেব, টর্চটা নিয়ে নিচেয় এসো তো একবার—

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে কারা নিচেয় নামছে মনে হলো। আবছা-আবছা ঠাহর হয়। টর্চ জ্বালিয়ে নামছে চার-পাঁচ জন। ভারী-ভারী পা সব। কাঠের সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দগুলো যেন বুকে এসে ঢিপ-ঢিপ আওয়াজ করে।

—সাপের খাঁচাটা কোন দিকে আছে গুদামবাবু?

সাপ! চমকে উঠলো এবার! সাপের খাঁচা। সাপ চালান হচ্ছে নাকি!

—সাপের বারোটা খাঁচা এবার এই বন্দরে নামাতে হবে—আর ওই পাশে একটা সিংহ ছিল, ওটা যাবে আলিপুর জু'তে—কে একজন বললে।

এতক্ষণে মনে পড়লো তাই রোজ কে হুংকার করে-করে জ্বালায়। ওটা যে সিংহ, তা কে জানতো। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে কত দিকে ঘুরে বেড়িয়েছি যদি কোনওদিন সাপের খাঁচার গায়ে হাত লাগতো! সাপের খাঁচা কেমন কে জানে। হাওয়া যাবার জন্যে ছোট-ছোট ফুটো নিশ্চয় আছে। যদি একটা বেরিয়ে পড়তো! কিংবা সিংহের খাঁচার ভেতর যদি হাত চলে যেত আচমকা!

—ইলেকটিক বাতিটা খারাপ হয়ে গিয়ে কী মুশকিলই যে হয়েছে—

—ওহে, একটা মশাল নিয়ে এস তো—

লোকগুলো কি এইদিকেই আসছে নাকি। বড় বড়-বস্তা ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে প্যাকিং বাক্সগুলোর পাশ দিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে তার দিকেই তো আসছে দেখাছ।

কী অদ্ভুত ব্যাপার সব। এতদিন এই সব সাপ আর সিংহের মধ্যেই কাটিয়েছে নাকি সে। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভয়ে শিরশির করে উঠলো।

হঠাৎ ওপরের সিঁড়ির কাছটা আলোয় আলো হয়ে গেল। বিরাট এক মশাল জ্বালিয়ে একজন লোক নামছে। এবার আর লুকোবার কোনও উপায় থাকবে না। এবার নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে। তারপর আবার ধরে পুরবে তাকে হাসপাতালের সেল-এ। আবার তার নাম হবে 'কেস নম্বর ৪৯'। আবার সেই ভুঁড়িওয়ালা মেট্রন এসে ছাই-পাঁশ খেতে দেবে। একজন নেবে ছবি। আর সেই একঘেঁয়ে সব প্রশ্ন, প্রশ্নের ফোয়ারা—আর সত্যিই যদি সে তার নাম বলে দেয় নিজের, তখন তো আবার সেই জেলখানার কয়েদ। তারপর তার না আছে টিকিট, না আছে পকেটে পয়সা টাকা। সে টিকিট কিনবে কী দিয়ে। যদি কোনও রকমে একবার সে বাবার কাছে পৌঁছুতে পারে, তখন আর ভয় কিসের। তখন তো আর কিছু ভাবনা নেই তার। আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে থাকবে। বাবার একমাত্র ছেলে সে—কেন সে যুদ্ধে এসেছিল। শুধু খেয়াল বই তো নয়। তারপর গোবিন্দ এখনও আছে নিশ্চয়ই। গোবিন্দই কি তাকে কম ভালবাসতো!

—কে, কে এখানে?

—কাকে বলছেন গুদামবাবু?

—কীসের যেন শব্দ হলো ওখানে—কে যেন নড়ে উঠলো—

—ওতো আমার জুতোর শব্দ, আমার জুতোয় লেগে বাঁশটা পড়ে গেল—

—ওহে মশালটা এদিকে নিয়ে এসো—কুলিদের বলো সাপের খাঁচাগুলো তুলে দিক ওপরে—এই বারোটা খাঁচা—

—দেখবে খুব সাবধান, একটা ভেঙে পড়লেই আর বাঁচতে হবে না কাউকে—সব আসল আফ্রিকার ময়াল সাপ—

মাথার ওপর একটা বিরাট প্যাকিং কেস, আর দু'পাশে আরো দু'টো। মাঝখানে সরু হয়ে ঢুকে রইল ভেতরে। এবার আর কোনও দিক থেকে ধরা পড়বার উপায় নেই। কিন্তু যদি প্যাকিং কেসগুলোও উঠিয়ে নেয়, তখন আর কোনও দিকে কোনও উপায় থাকবে না।

হঠাৎ মনে হলো মশাল নিয়ে লোকগুলো তারই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আলোচনা চলছে।

—এ-গুলোও তা'লে ওঠাক ওরা—

—উঃ, ইলেকট্রিক লাইনটা খারাপ হয়ে যে কী মুশকিলই হয়েছে—

—ওরে, এ-গুলোও ওঠা...তলায় লোহার শাবলটা দিয়ে চাড় দিয়ে ওঠাতে হবে—নইলে বড় ভারী—

প্যাকিং বাক্সর নিচে শুয়ে বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। বলে কী ওরা। সত্যি-সত্যিই শাবল চালিয়ে দেবে নাকি ওরা তার শরীরের ওপর।

বলা নেই কওয়া নেই—সত্যি-সত্যিই একটা শাবলের ডগা দিলে চালিয়ে হুড়-হুড় করে একেবারে তার...

—ও গুদামবাবু, গুদামবাবু—শীগ্‌গির আসুন, শীগ্‌গির—

ওপর থেকে ডাক এল হঠাৎ।

—কী হলো আবার, চল্ বেটা, ওপরে চল্—কোনও কাজ শেষ করতে দেবে না দেখছি—ঝকমারী হয়েছে গুদামের কাজ করা—

দলবল নিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল ওরা। বাবা! আর ভেতরে থাকতে আছে। ভগবান বাঁচিয়েছেন। রাখে কেষ্ট মারে কে! কিন্তু এখনও যে অনেক বাকি। কত দিন যে বাকি, কোথায় যে চলেছি, তাই বা কে জানে! সুড়-সুড় করে বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরে মানে প্যাকিং বাক্সের তলা থেকে বাইরের গুমোট পচা অন্ধকারে। এখুনি ওরা হয়ত আবার নামবে। এবার একটা নিরাপদ গোছের জায়গা বেছে নিতে হয়।

পরের দিন কোথায় যেন জাহাজ এসে থামল। আর দুলুনি নেই।

লোকের গলার আওয়াজ কমে এল। অনেক মাল তুলে নিয়ে গেছে ওপরে। এবার আর ভেতরে কেউ বেশী আসছে না।

সব লোক কি জাহাজ থেকে নেমে গেল! যাহোক এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার একটু আরাম করে ঘুমোন যাবে। শুধু কোন্ জায়গাটায় সিংহের খাঁচাটা আছে জানা যাচ্ছে না। হুংকারটা আসে ওই ওদিকের কোণ থেকে। কে বুঝি কয়েকদিন অন্তর মাংস খাইয়ে দিয়ে যায়। সাপের বাক্সটা খাঁচা নিয়ে গেছে, বাঁচা গেছে। কিন্তু এই বন্দরেই যদি মাল ওঠে আবার।

খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে। শুঁটকি মাছ তো আর খাওয়া যায় না। কোনও খাবার জিনিস কি নেই এখানে।

একা ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ হাতে যেন কী লাগলো। গোল ফুটবলের মতন! এত ফুটবল! বড়-বড় ঝোড়া ভর্তি। ভাল করে হাত বুলোতে লাগলো। তেলতেলা গা। একটা তুলে নিলে। ভারী আছে। কোনও গন্ধ নেই। কুমড়োও হতে পারে। ক্ষিদের ঝোঁকে তাও খাওয়া যায়। কাটবার কোনও যন্ত্র নেই। দাঁত। দাঁত তো আছে। দাঁত বসিয়ে দিলে গায়ে। জিভ দিয়ে গল্ গল্ করে লাল্ পড়তে লাগলো—

ফুটবল নয়, কুমড়োও নয়—তরমুজ!

পাকা-পাকা তরমুজ। সমস্ত মনে পড়ছে। গোবিন্দ বাজার থেকে কিনে আনতো। ছোটবেলায় গ্রীষ্মকালে খুব তরমুজ আসতো বাড়িতে। কতদিন পরে কত বছর পরে কতদিনকার আগেকার খাওয়া।

পুরো একটা তরমুজই খেয়ে ফেললে। পেটটা ভরতেই বেশ ঘুম এল। একটা প্যাকিং বাক্সর পাশে অন্ধকারের মধ্যে গা এলিয়ে দিলে। প্রথমে একটা ঢেকুর উঠলো। কী আরাম! পৃথিবীর যেন কোথাও কেউ এত আরামে নেই। বেশ ইজি চেয়ারের মত হেলান দিয়ে শোওয়া।

তারপর আবার ঢুলুনি। জাহাজ বুঝি ছাড়লো।

ঢন্—ঢন্—ঢন্—

ঘড়ির মত ঘণ্টা বাজাতে লাগলো ওপরে। মোটা-মোটা লোহার শেকল গড়িয়ে চলছে পাটাতনের ওপর। কড়্—কড়্—কড়…

পাশের ইঞ্জিন-ঘরের ভেতর হুড় হুড় করে কয়লা ঢালছে। কয়লা ভাঙার ধুপ্ধাপ শব্দ…আর প্যাকিং কেসের পাশে গুদামের অন্ধকূপে শুয়ে বিনা টিকিটের নিরুদ্দেশ-যাত্রা। তারপর সেই কলকাতার ছাদ। ছাদের তরঙ্গ… সে তরঙ্গ ডিঙিয়ে সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন…গোবিন্দ চাকর…গরমের ছুটিতে বরফওয়ালার সেই তৃষ্ণার্ত চীৎকার—চাই বরফ—কাঠি বরফ—তারপর ঠং-ঠং আওয়াজ করতে করতে বাসনওয়ালার নিয়ম করে যাওয়া…

—এই, তুম্ কোন হ্যায়—কোন্ হ্যায় তুম ?

ধড়মড় করে উঠে বসার পালা এবার। ভয়ে সমস্ত শরীর একেবারে কুঁকড়ে এল।

—এই, তুম কোন্ হ্যায়—কোন্ হ্যায় তুম—ওঠো—

বিরাট একজন লোক নিশ্চয়ই—নইলে গলা অমন বাঁজখাই হয়। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, শুধু পায়ের বুট জুতোটা দেখে চেহারাটাকে অনুমান করে নিতে হয়।

ভয়ে সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো রাতুলের। এইবার ধরা পড়ে গেছে। আর আত্মরক্ষার উপায় নেই। বেরিয়ে আসতে হবে প্যাকিং কেস্-এর তলা থেকে। বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে মাফ্ চাইতে হবে। বলতে হবে খুলে সমস্ত ঘটনা। তারপর যা হয় হোক্—

হঠাৎ কে যেন পাশ থেকে বলে উঠলো—আমি ভোম্বল সেপাই সাহেব—আমি ভোম্বল—

—ভোম্বল, তা' তুই এখানে কী করছিস—ডিউটি কখন ?—সেপাই আবার জিজ্ঞেস করলে।

—ডিউটি তো এখন, কিন্তু মাথা ধরেছে বড্ড, তাই একটু গড়াচ্ছিলুম, কিছু বলো না, এই নাও চারটে পয়সা নাও, পান খেও। ভোম্বল দাঁড়িয়ে উঠে দাঁত বার করে মাথা চুলকোতে লাগলো।

খুব বেঁচে গেছে রাতুল। তা'হলে এতক্ষণ তাকে দেখতে পায়নি কেউ। আবার যেন শরীরের মধ্যে প্রাণ এল। কিন্তু এই রকম করে কতদিন চলবে!

সেপাই সাহেব বুট জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ করে ওদিকে চলে গেল।

সেপাই সাহেবকে একটা গালাগালি দিয়ে ভোম্বল আবার তার নিজের জায়গায় শুয়ে পড়বার আয়োজন করতে লাগলো।

রাতুল লোকটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। খাকী পোষাক-পরা পাগড়ি মাথায়, গোঁফ-দাড়ি শূন্য চেহারা। বয়েস রাতুলেরই মতন। খানিক পরে ভোম্বলকে আর দেখা গেল না। প্যাকিং কেস্-এর মধ্যে ঢুকে গেল।

আবার ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে হয়। এর মধ্যে এই ভাবে কি শোয়া যায়। কখনও কষ্ট করা অভ্যেস নেই। আজীবন আরামে কাটিয়েছে। এই যুদ্ধে এসেই যা কষ্ট করা আরম্ভ। সেই বুট পট্টি পরে প্যারেড আর ভোর চারটেয় ঘুম থেকে ওঠা। আর ওই খাবার! কিসের মাংস কে জানে। ভালো করে সে মাংস সেদ্ধও হয় না, আর পাঁউরুটি কামড়ানো। সকাল বেলা ক্যান্টিনের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো। হাতে একটা মগ। সেই মগ-এ খানিকটা চা নেওয়া আর ডানহাতে চার টুকরো

রুটি, আর একটা ডিম। রান্নাঘরের সামনে কাদায় কাদা। কাদায় পা ডুবে যায়। সেই কাদার ওপর উবু হয়ে বসে এল্যুমিনিয়মের কাঁসিতে মোটা ধানসুদ্ধু চালের ভাত খাওয়া, আর বাঁ হাতে জলের মগ। আর তাছাড়া একদিন জুতোর রং দিতে ভুলে গেলেই শাস্তি। শাস্তি মানে কুলির কাজ করা। কোদাল দিয়ে মাটি কুপোনো, না হয় তো গেটে পাহারা দেওয়া। ঠায় দাঁড়িয়ে য়্যাটেন্‌শন্ হয়ে পাহারা দেওয়া আর কোনও অফিসার কাছ দিয়ে গেলেই সেলাম ঠোকা। সেলাম করতে যদি একটু ভুলেছ কি আবার শাস্তি।

এ তো গেল সাধারণ সময়ে। কিন্তু ফ্রন্টে গেলে! সিঙ্গাপুরের খেজুর গাছের ঝোপের মধ্যে বসে-শুয়ে সেই যুদ্ধ করা। যে কোনও মুহূর্তে ওপর থেকে বোমা পড়তে পারে। জঙ্গলের মধ্যে সাপে কামড়াতে পারে। খাওয়া ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুল তো বেঁচে গেলে, আর তা না হলেও না বলতে পারবে না। মার্চ করতে-করতে চলেছ তো চলেছই—পা ব্যথা করে টন্ টন্ করলেও থামতে পারবে না। দশ মাইল বারো মাইল এক নাগাড়ে চলা। চলতে-চলতে যদি পড়ে অজ্ঞান হয়েও যাও তো কেউ আহাটি বলবে না। হয়ত হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে দৌড়ে নিচে নামতে হবে। পা যদি মচকায় তো মচকালো, তোমারই পা মচকালো। আর কেউ তোমার জন্যে বসে থাকবে না তা'বলে। তারপর যখন জাপানীদের হাতে বন্দী হলো, সে আরো কষ্টের। সারাদিন মাটি কোপাও, গাছ পোঁত, সেই গাছে ফসল হলে তুমি খেতে পাবে। আর পেছনে আছে চাবুক। সারাদিন-সারারাত ওই চাবুকের ভয়। ওরা খেয়ে কিছু পড়ে থাকলে তবেই তুমি খেতে পাবে।

উঃ, কী কষ্টটাই না করেছে এমনভাবে কেন সে এসেছিল যুদ্ধে। কেন তার শখ হয়েছিল যুদ্ধে আসতে। কিসের দুঃখ ছিল তার। বাবার একমাত্র ছেলে সে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেনে-এ তাদের অমন বাড়ি। গোবিন্দর মতন অমন চাকর সমস্ত দিন বাড়িতে বই পড়ো না—বিরাট লাইব্রেরী। কিংবা ছাদের ওপর ব্যাডমিনটন খেলা। কিছু ভালো না লাগে, বেরিয়ে পড়ো মোটর নিয়ে। চলে যাও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে—কিংবা স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে প্রিন্সেপ্ ঘাটে। তাছাড়া কলকাতা শহরে কাজের কিছু অভাব আছে নাকি, চলো সিনেমায়, ফুটবল মাঠে····· আরো হাজারো রকমের মজা ছড়ানো আছে এখানে, অলিতে-গলিতে।

—কে রে,—কে, এখানে কা'র পা নড়ছে—

মনে হল ভোম্বলের গলা। কিন্তু তাকে দেখতে পেলে কী করে।

—কে তুই ? তুই কে ? কথা বলছিস্ নে যে—

চারদিকে মাথা নেড়ে দেখলে রাতুল। কোথা থেকে কে তাকে ডাকছে।

তবে কি শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়তে হলো নাকি।

—এই দিকে, এই পেছন পানে চা—পায়ের দিকে—

পায়ের দিকে চাইতেই রাতুল দেখলে একজোড়া চোখ প্যাকিং কেস্-এর ফাঁক থেকে তার দিকে পিট-পিট করে চাইছে। ও ভোম্বল।

—বেরিয়ে আয়—বেরিয়ে আয়—

বেরিয়ে আসবে কিনা ভাবতে লাগলো রাতুল।

—বেরিয়ে আয়, নয় তো ধরিয়ে দেব—আবার বললে ভোম্বল।

অতি কষ্টে অগত্যা গুঁড়িসুড়ি মেরে বেরিয়ে আসতে হলো রাতুলকে।

ভোম্বলও বেরিয়ে এল। এসেই খপ্ করে রাতুলের হাতটা ধরে ফেলল।

—টিকিট আছে? টিকিট ?—চোখ দু'টো পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে ভোম্বল।

রাতুল বললে—টিকিট নেই—কিন্তু হাত ছাড়ো—

—চল্ ওপরে—টিকিট নেই আবার তম্বি—

টানতে-টানতে সত্যিই নিয়ে যাবে নাকি ওপরে। দেবে নাকি ধরিয়ে—

—কী জাত তুই—বাঙালী ?

—হ্যাঁ—

—আরে এতক্ষণ বলিসনি কেন—কত বাঙালীকে দিলুম কালাপানি পার করে—বাড়ি কোন্ জেলায় ?

—কলকাতায়।

ততক্ষণে হাত ছেড়ে দিয়েছে ভোম্বল।

—বুঝতে পেরেছি, কলকাতার ছেলে যখন, তখন রাগ করে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে আসা হয়েছে—আর বলতে হবে না—নে খা, চিনেবাদাম খা—ভোম্বল খাকা জামার পকেট থেকে এক মুঠো চিনেবাদাম বার করে দিলে রাতুলের হাতে। আর নিজেও খেতে লাগলো কড়মড় করে।

ভোম্বল বললে—চল্, এখানে কেউ দেখে ফেলবে—চল,ওধারে গিয়ে বসি—

প্যাকিং-কেস্ ডিঙিয়ে ভোম্বল রাতুলকে নিয়ে গেল আরো কোণের দিকে। একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বললে—বোস্ এখেনে—কারু বাবার সাধ্যি নেই আমাদের দেখতে পায়—

—এইবার বল্—কোথায় গিয়েছিলি—পয়সা-টয়সা আছে পকেটে—বলে ভোম্বল আরো গোটাকতক চিনেবাদাম দিলে বাড়িয়ে।

ভোম্বল আবার বললে—পয়সা-টয়সা আছে, না সে গুড়ে বালি—

রাতুলকে কথার উত্তর দিতে হলো না আর, চোখ দেখেই বুঝে নিয়েছে ভোম্বল। বললে—আর বলতে হবে না, বুঝেছি মায়ের গয়না চুরি করে পালিয়েছিলি, এখন পয়সা ফুরিয়ে গেছে তাই মা'র জন্যে মন কেমন করছে—

বুঝেছি সব—দু'বচ্ছর জাহাজে চাকরি করছি, কত বাঙালীর ছেলেকে কালাপানি পার করে দিলুম—

তারপর যেন কী ভেবে নিয়ে বললে—কিন্তু সে দিনকাল আর নেইরে—এখন বড্ড কড়াকড়ি—

রাতুলও একটু ঘাবড়ে গেল।

রাতুলের দিকে চেয়ে ভোম্বল বললে—তা' কুছ্ পরোয়া নেই—আমি যতক্ষণ আছি, কোনও বাঙালীর বাচ্ছার কোনও ভাবনা নেই—

—তা সে কথা যাক্‌গে—দাড়িমাড়িগুলো কামাতে হবে, আর আমার একটা খাঁকী পোশাক দেব—তাই পরবি—কেউ আর কিছু বলবে না—এ ক'দিন পেটে তো ঢু-ঢু—কী খাচ্ছিস ?

—ওই তরমুজ—রাতুল আঙুল দিয়ে দেখালে।

—বাহাদুর ছেলে তো—তোর হবে—কিছু ঘাবড়াসনে—আমি তোকেই সাক্‌রেদ করে নেব আমার—পারবি আমার সাক্‌রেদ হতে ?

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে। রাতুল জিজ্ঞেস করলে—কিসের সাক্‌রেদ ?

—এই ত্যাখ্—ব'লে ভোম্বল পকেট থেকে একটা ফুটো পয়সা বার করলে। হাতের তেলোয় রেখে বললে—কী দেখছিস্—আমার হাতে ?

রাতুল বললে—একটা পয়সা—

ভোম্বল হাতের মুঠো বন্ধ করলে। তারপর হাতের মুঠোর ওপর একবার ফুঁ দিয়ে খুললে মুঠোটা।

বললে—এবার কী দেখছিস ?

রাতুল অবাক হয়ে দেখলে—এক গাদা পয়সা—হাতে পয়সা আর ধরে না—। ভোম্বল মুঠো আবার বন্ধ করলে। আবার একবার ফুঁ দিলে। আবার মুঠো খুললে। রাতুল দেখলে—এবার হাতের তেলো একেবারে ফাঁকা—একটা কাণা-কড়িও নেই।

রাতুলের দিকে চেয়ে ভোম্বল বললে—এ আর কী দেখছিস্—তোর পকেট থেকে এখুনি একটা মুরগীর ডিম বার করতে পারি—দেখবি—

মাথার ওপর ঢন্ ঢন্ করে কয়েকবার ঘণ্টা বেজে উঠলো।

ভোম্বল তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে।

বললে—ছ'টা বাজলো—যাই, এবার ডিউটি বদল হবে—

—কিসের ডিউটি ? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—দূর বোকা, আমার যে চাকরি রে, ডিউটি বদল হবে না,—এতক্ষণ ডিউটি হলো, এবার ছুটি,—যাবো আর আসবো—বাটনা বাটা, জল তোলা, ঝাড়ু দেওয়া সব কাজ করতে হয় আমাকে—কাজ না করলে কি মাইনে দেব

—পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেয় মুখ দেখে নাকি ?

তারপর পকেট থেকে আরো চিনেবাদাম বার করে রাতুলের হাতে দিয়ে বললে—আর এ-চাকরি ভাল লাগে না ভাই, মানুষের গলা কেটে জোড়া লাগানোটা যদি একবার শিখতে পারি—তবে এ-চাকরিটা ছেড়ে দেব—

—গলা কেটে জোড়া লাগানো ? —অবাক হয়ে রাতুল জিজ্ঞেস করল।

—সে সব পরে বলবো'খন—তা' আজকে রাত্তিরে কী খাবি বল দিকিনি ?

রাতুল তো অবাক হয়ে গেছে।

ভোম্বল বললে—মাংস-টাংস খাস তো—না খাঁটি বোষ্টম—চপ্ খাবি, না কাটলেট, মাছ-টাছ পাবি না—শুধু গরম ভাত আর মাংসের কারি। কলকাতার ছেলে তুই—ও-সব সন্দেশ-রসগোল্লা পাবি না, তা আগে-ভাগে বলে রাখছি—

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভোম্বল দৌড় দিলে। ভোম্বলের জুতোর আওয়াজ অনেক দূর থেকে কানে আসতে লাগলো।

একলা বসে-বসে রাতুল ভাবতে থাকে।

কিন্তু ভোম্বল আর আসে না। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে। খোলের ভেতরের বাতি এখনও সারানো হয়নি। আজও বোধ হয় অন্ধকারের মধ্যে কাটাতে হবে। বাতিটা সারালেই মুশকিলে পড়তে হবে তাকে।

বহুদিন পরে আরাম করে খাওয়া। গরম ভাত আর মুরগীর ঝোল। অমৃত। হোক্ প্যাকিং কেস-এর বিছানা, মাথায় না থাক বালিশ—কিন্তু ঘুম যা হলো। এমন বহুদিন হয়নি। ভোম্বলটা ছিল তাই রক্ষে। এমন বিপদে কারো সাহায্য পাওয়া যায় নাকি।

ভোম্বল ভোরবেলাই এসে হাজির। বললে—আমি খাটবো, আর তুমি বসে-বসে খাবে, সে-সব চলবে না।···আমার জমিদারী নেই যে বাঙালীর ছেলে দেখলেই মাথায় করে নাচবো—সে-সব চলবে না ভোম্বলদাসের কাছে—ফেলো কড়ি মাখো তেল—আমি বাবা এই বুঝি—

তারপর খাঁকি পোশাক বার করে বললে—পর দিকিনি—এখন থেকে তুই হবি ভোম্বলদাস—বুঝলি—

রাতুল ভয়ে কুঁকড়ে গেল। বললে—যদি কেউ চিনে ফেলে—

—চিনে ফেললে ধরা পড়বি—পুলিসে দেবে—হাজত হবে—

তারপর জোর করে প্যান্ট-কোট আর পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে বললে—চিনতে কেউ পারবে না, তুইও কালোমানিক, আমিও কালোমানিক—শুধু কোঁকড়ানো চুল তোর, তা সে পাগড়ী দিয়ে ঢেকে দিয়েছি—গলার আওয়াজ-টাও তোর আর আমার একই রকম—

সাজিয়ে-গুজিয়ে ভোম্বলদাস বললে—দেখি, মুখখানা আমার দিকে ফেরা—

রাতুল মুখ ফেরালো। ভোম্বল বললে—সব ঠিক আছে—গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে হুবহু ভোম্বলদাস হয়ে গেছিস্—

তারপর রাতুলের পিঠে একবার ধাক্কা দিয়ে বললে—যা—চলে যা—

রাতুলের কেমন ভয় করতে লাগলো।

ভোম্বল বললে—ভয় কিরে—তবেই তুই আমার সাক্‌রেদ হয়েছিস—সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে দেখবি কলঘরের পাশে রান্নাঘর, সেখানে দেখবি ফরসা মতন চাটগেঁয়ে বামুন রান্না করছে—তা'কে গিয়ে বলবি—মহারাজ কী-কী বাটনা বাটতে হবে? সে তোকে দেবে আধসের ধনে, একসের লঙ্কা আর আধসের হলুদ—বাটতে পারবি তো—বেশ মিহি করে, মোলায়েম করে বাটবি—

—বাটনা যে জীবনে কখনও বাটিনি—রাতুল বললে।

—ননীর পুতুল একেবারে, বাটনা বাটলে হাত খসে যাবে ওঁর—বাটনা বাটতে যদি পারবি না তো মায়ের কোল ছেড়ে বেরিয়েছিলি কেন?

ভেঙ্‌চে উঠল ভোম্বল।

রাতুল তখনও নড়ে না দেখে ভোম্বল বললে—তারপর বাটনা বাটা হলে সারেঙ সাহেবের ঘরে গিয়ে পা টিপতে হবে। দেখিস যেন বেশি জোরে টিপিস নি—তারপর সারেঙ সাহেব যখন ডিউটিতে যাবে—তখন সে ঘর থেকে এসে জল ধরবি কল থেকে—বালতি করে জল ধরে দিবি মহারাজের ড্রামে—তারপর মহারাজ যখন বলবে—আর জল দরকার নেই, তখন সোজা যাবি গুদামবাবুর কাছে। গুদামবাবুর ঘর তেতলায়। গুদামবাবুর ফাইফরমাশ মত যেতে হবে এখেনে সেখেনে—তারপর যখন গুদামবাবু চান করতে যাবে—তখন ঝাড়ু নিয়ে সব কেবিনগুলো ঝাঁট দেওয়া—শুধু ভেতরটা—বাইরে দিসনি, ঝাঁট বাইরে দেবার জন্যে ধর্মদাস আছে—যা-যা শীগগির যা, এতক্ষণ বামুনঠাকুর হয়ত রেগে কাঁই হয়ে চেঁচাচ্ছে—

রাতুল তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে। এ-আবার কি বিপদ। কোথায় তেতলা, কোথায় সব কেবিন—কে জানে। কাউকে চেনে না, কারুর নাম জানে না। রাস্তাই চেনে না সে। ভোম্বল তাকে এ কি বিপদে ফেললে। ছুটো খেতে দিয়ে বাঘের মুখে পুরে দেওয়া। এ কি রকম ভালবাসা!

—তবে একটা কথা—

ভোম্বল সাবধান করে দিলে। বললে—সেই কালকের সেপাইটা ভারি বদমাশ—তা'কে দেখলে দু'একটা সেলাম করবি। আর এই নে—

দু'টো আনি দিয়ে ভোম্বল বললে—বেশি কিছু বকা-ঝকা করলে হাতে

দিবি একটা আনি গুঁজে, চুপ হয়ে যাবে বেটা—বেটা ভারি বিট্‌কেল—

কালকের সেপাইটাকে কি রাতুল চিনে রেখেছে। মুখটাই তো দেখেনি সে। তাছাড়া কত সেপাই তো চারদিকে ঘুরছে—কখন কাকে পয়সা দিতে গিয়ে কি অন্যায় করে ফেলবে।

ভোম্বল প্যাকিং কেস-এর ওপর শুয়ে পড়েছিল। চোখ দু'টো বুজে। আবার খুললে। বললে—এখনও যাসনি—চাকরিটা খাবি তুই আমার—যা, শীগগির যা—

হাড়িকাঠের মধ্যে যেন মাথা দিতে যাচ্ছে, এমনি করে রাতুল এক-পা এক-পা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। বহুদিন সূর্যের আলো দেখেনি। পাটাতনের ওপর উঠে চারিদিকে দৃষ্টি দিতেই মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো।

চারদিকে একটা গুম্-গুম্ আওয়াজ। গরম আবহাওয়া। হু-হু করে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে। কী ঘোর নীল রঙ্ সমুদ্রের। দেখলেই ভয় লাগে। এ কী দৃশ্য! ভয়াল বীভৎস রূপ! চারিদিকে কোথাও ডাঙার নামগন্ধ নেই। শুধু মাঝে-মাঝে কয়েকটা সাদা কালো-কালো পাখী দূর থেকে উড়ে এসে জাহাজের মাথায় বসে তারপর উড়ে যায়। হঠাৎ জলের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মাছ ধরে, আবার উড়ে এসে বসে জাহাজের মাথায়।

কিন্তু ও-দিকে দেখবার সময় নেই তখন। সামনে-পেছনে নানা অচেনা লোকজন আসা যাওয়া করছে, কে তার ছদ্মবেশ ধরে ফেলবে, তখন খাটো জেল। পচো হাজতে।

ওইটেই বোধ হয় রান্নাঘর। পেঁয়াজের আর মাংসের গন্ধ আসছে।

একজন সাদা চামড়া ইউনিফর্ম পরা সাহেব এদিক আসছে। সামনে আসতেই রাতুল সেলাম ঠুকলে একটা। সাহেবটাও মাথা নেড়ে চলে গেল।

মহারাজ কিন্তু লোক ভালো। বেশী বাক্যবাগীশ নয়। শুধু একবার বললে—এত দেরি হলো যে তোর ভোম্বল?

—ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেছে মহারাজ—বলতেই আর কোনও প্রশ্ন এল না।

মহারাজ নিজের হাতে রান্না করতে আর দিনরাত বিড়ি খেতেই ব্যস্ত।

সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। বার করে দিলে মশলাপত্তর—লঙ্কা, ধনে, হলুদ, পেঁয়াজ। প্রফেসার নিত্যানন্দ সেন জীবনে কখনও ভাবতে পারবেন না, তাঁর মত বড়লোকের একমাত্র ছেলেকে কোনও দিন জাহাজের রান্না ঘরে বসে বাটনা বাটতে হবে। তবু একদিন ঘটনাচক্রে বন্দুকের কুঁদো ধরে গুলি ছোঁড়া অভ্যেস করেছিল আর ভাগ্যিস জাপানীদের কল্যাণে মাটি কোপানো

থেকে যাবতীয় হাতের কাজ শেখা ছিল, তাই আজ শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমে অজ্ঞান হতে হলো না।

—আজকে এ কী বাট্‌না বাট্‌লি রে ভোম্বল, বেশ মিহি হলো না তো —আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে দেখে মহারাজ যেন কেমন সন্তুষ্ট হলো না। বললে, কাল বুঝি আবার নেশাটেশা করেছিলি ?

কী বলবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ তার মনে এল একটা কথা।

বললে—না মহারাজ, কালকে গুদামবাবুর পা টিপে-টিপে কব্জিতে ব্যথা হয়ে গেছে আমার—

মহারাজ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললে—তাই নাকি—

খানিকপরে বললে—চল্ ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে—বলতে পারবি এই কথা, যা আমার সামনে বললি ? বলতে পারবি তো ? ছ্যাখ্—গুদামবাবুর চাকরি আমি আজ খেয়ে তবে ছাড়বো—চল্ ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে—

—না, মহারাজ, আমার চাকরি যাবে—অনুনয় করতে লাগলো রাতুল।

—আচ্ছা যা, কিন্তু দেখে নিস্ ভোম্বল, ওই গুদামবাবুর চাকরি আমি খাবোই তবে আমি চাঁটগেঁয়ে বামুনের বাচ্চা—ডালে ঝাল হয়েছিল বলে ওই গুদামবাবুর রিপোর্টে আমার গেল মাসে আট আনা জরিমানা হয়েছে—কিন্তু আমিও দেখাবো, হাতেনাতে ধরিয়ে দেব একদিন—ভাঁড়ারের লোক নিয়ে পা টেপানো তোমার দেখাচ্ছি—রাগের চোটে লম্বা খুন্তিটা হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে খটাখট্ শব্দ করতে লাগলো মহারাজ।

—আবার বলে কী জানিস—

পটাপট্ গোটা কুড়ি লঙ্কা ছোলার ডালে ছেড়ে দিয়ে বললে মহারাজ—আবার বলে কিনা—জমিদার বংশ ওঁদের—একশো লোক এবেলা—একশো লোক ওবেলা পাত পাড়ে ওঁদের বাড়িতে, তিরিশটা গরু এখনও আছে—

ডালটা নামিয়ে খপ্ করে খানিকটা মুখে দিয়ে চেখে নিলে। তারপর আর এক খাম্‌চা নুন ফেলে দিয়ে ডালটা খুন্তি দিয়ে ঘুঁটতে লাগলো।

—অথচ ভেবে ছ্যাখ তুই ভোম্বল, অত যদি তুই জমিদার মানুষ, অত যদি গরু বাড়ীতে তোর, তা হ'লে দুধ, ঘি, ছানা, মাখন, মাংস, মাছ অত যদি খাওয়া অভ্যেস থাকে তা হ'লে এই সামান্য লঙ্কার ঝাল সহ্য হলো না পেটে—সকাল থেকে তিরিশ বার দাস্ত হলো তোর—

—আমি আজ নতুন রাঁধুনি নই-একটু থেমে আবার বলতে লাগলো মহারাজ—ডানকান্ সাহেব যখন এই জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল, তখন কী একদিন খেয়াল গেল বুঝ্‌লি ভাই, মুরগীর কারি রাঁধলুম বেশ করে—শীত-কাল, বড়দিনের বাজার, নতুন বছরের পয়লা, ঝিম্-ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে—

সন্ধ্যে সাতটার সময় রান্না শেষ করেছি, আটটার সময় খেতে বসেছে সাহেব—খেয়ে এমন তারিফ করলে, ফলাহারীকে জিজ্ঞেস করিস—বৈজুও জানে—এমন তারিফ করলে···আমাকে, পচিঁশ টাকা মাইনেই বাড়িয়ে দিলে—সে সব ছিল মানুষ—সে কালও নেই, সে মানুষও নেইরে !

—ক্ষিদে পাচ্ছে নাকি তোর ? মহারাজ একটা মাংসের টুক্‌রো খপ করে মুখে পুরে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—পাচ্ছে।

—এই নে, ড্রামের আড়ালে বসে খা, এখনি পঁয়তালি খানসামা এসে হাজির হবে।

একটা ছোট বাটিতে দিলে একটু মাংস, গোটা দুই আলুর টুকরো আর বিষের মত ঝাল ঝোল।

—কীরে কেমন খেলি—ঝাল হয়েছে ?

ঝাল খেয়ে হেঁচকি উঠতে লাগলো রাতুলের। তবু বললে—আঃ, চমৎকার তোমার রান্না মহারাজ—

—আর একটু খাবি নাকি ?—

মহারাজ লোকটা ভালো। খোশামোদ করলে গলে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রামে জল তুলতে হলো বালতি করে।

কাজ শেষ করে গুদামবাবুর ঘরে যাওয়ার পালা। কিন্তু ঘরটা কোন্ দিকে কে জানে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কী করবে ভাবলে রাতুল। এধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেল ওধারে। আশপাশের লোকজন কাজে যাতায়াত করছে এ-দিক ও-দিক। পাশ থেকে একজন লোক হঠাৎ থেমে বলে উঠলো—কী, একেবারে চিনতেই পারো না যে হে—নেশাটেশা করেছ নাকি—

—কিছু মনে করো না ভাই—কিছু মনে করো না—বলতে-বলতে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলো রাতুল। আর একটু হলেই ধরা পড়েছিল আর কি ! কিন্তু গুদামবাবুর ঘরটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলে দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে : Store-keeper.

ঢুকতে যাবে ভেতরে এমন সময়ে কে যেন ডেকে উঠলো—এই যে লাট-সাহেব ভোম্বলদাস—এত দেরি যে—

নমস্কার করে রাতুল এগিয়ে গিয়ে বললে—একটু দেরি হয়ে গেল মহারা-জের কাজে—

খেঁকিয়ে উঠলেন গুদামবাবু। চশমার ফ্রেম্‌টা আরো ঝুলে গেল নাকের ওপর। বললেন—যদি ভালোটি চাও তো মহারাজের কথায় নেচো না—আর মাসে আট আনা ফাইন করিয়েছি, এবার তা'হলে তোমারও ফাইন

করিয়ে ছাড়বো—

—কী বললি যে, পা টিপতে হবে না—সব ভুলে গেলি নাকি—আবার খেঁকিয়ে উঠলেন গুদামবাবু।

খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত গুদামবাবু তক্তপোশের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। রাতুল টিপতে লাগলো কড়া-পড়া পা। ও-পা টেপা রীতিমত খাটুনির ব্যাপার। খানিক পরে আরামে চোখ বুজে এল গুদামবাবুর।

বললেন—আজকের টেপাটা খুব ভালো হচ্ছে রে ভোম্বল—ঘুম এসে গেল দেখছি—

তারপর আপন মনেই বলতে লাগলেন—এতো আর তোর মহারাজের মত দাঁড়িয়ে-বসে কাজ করা নয়—সারাদিন আমার মত হাঁটুনি দিতে হলে বুঝতো বাছাধন—এই তো দেখেছিস্—একবার যাও ওপরে, একবার যাও নীচে। একটু দাঁড়াতে দেবে না সুস্থির হয়ে। ঝকমারী গুদামের কাজ করা—

খানিক পরে নাক ডাকতে লাগলো গুদামবাবুর। কিন্তু সে বুঝি মুহূর্তমাত্র। তেমনি ভাবে শুয়ে-শুয়েই কথা বলতে আরম্ভ করলেন—দাঁড়া ভোম্বল, আর ক'টা দিন সবুর কর্—তোর মহারাজের চাকরি খাচ্ছি—আবার যে-কে-সেই—আমার সঙ্গে চালাকি—বলে কি না আমি ঘুষ খাই—মহারাজ তোকে এ-কথা বলেছে কি না বল্ তুই—

—বলেছে হুজুর—মজা দেখবার জন্যে রাতুল নরম সুরে বললে।

—কী শয়তান দেখেছিস ওই চাঁটগেঁয়ে বামুনের বাচ্ছা—আর আমিই কিনা ওর চাকরি করে দিলুম—মানুষের ভালো করতে নেই সংসারে—

—আপনি চাকরি করে দিয়েছেন নাকি! ও তো বলে ডানকান্ সাহেবের আমল থেকে আছে—ফোড়ন কাটলে রাতুল।

—তবে শোন্, খেতে পেত না, এই হাড় লিক্‌লিকে ল্যাংচা-ফটাং চেহারা—বর্মার রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করতো—একদিন বেড়াচ্ছি পোর্টের কাছে—ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ওই বুড়ো এসে ভিক্ষে চাইলে, জানিস তো আমরা খাঁটুলির জমিদার, বাবার নামে এখনও বাঘে-মানুষে এক ঘাটে জল খায়—গুদামবাবুর চাকরি করছি শখ করে, কিন্তু মেজাজে আমাদের সঙ্গে কেউ পারবে না—তা' সেইখানে গরীব লোক দেখে দিলাম একটা টাকা হাতে—দিতেই পায়ে লুটিয়ে পড়ল শয়তানটা, বললে—একটা চাকরি করে দিন বড়বাবু। আমি বললুম—কী কাজ পারবি করতে? ও বললে, সব কাজ পারবো হুজুর। সেই দয়াপরবশ হয়ে এই শর্মা তখনকার দিনে দশটাকা মাইনের পিওনের চাকরি করে দিয়েছিলাম, এখন আবার তেল কত—গায়ে গন্ধ সাবান মাখে রে—টেরি কাটে—ফরসা জামা—দেখে শুনে হাসতে-

হাসতে আমার···

খানিক পরে বেশ নরম সুরে বললেন—আজ বেশ আরাম দিচ্ছিস ভোম্বল—এমনি করে টিপবি রোজ—পা টিপেছিল গিয়ে বঙ্কু—পঁয়ত্রিশ সালে যুদ্ধের আগে—পা টেপা নয়তো যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে সর্বাঙ্গে—এখন কী যে দিনকাল খারাপ পড়ে গেল—সে-পা-টেপাও নেই, সে মানুষও নেই—তা সে যাক্‌গে, তুই বোস্, বসে থাক এখানে, বসে-বসে রেডিও শোন্—

পাশের হল্‌ঘরে রেডিও আছে। গুদামবাবু চীৎকার করে ডাকলেন—ও ধর্মদাস—

—আজ্ঞে—

—রেডিওটা একবার খুলে দাও !দিকিনি—বাঙলা গান চালাও দিকি—

গুদামবাবু চিত হয়ে শুলেন। পাশের ঘরে রেডিওটা বেজে উঠলো। একটা বাঙলা গান হচ্ছে চমৎকার লাগলো। গানটা বোধহয় শেষ হয়েই এসেছিল। হঠাৎ কথা শোনা গেল—

—কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে বলছি—এইবার অনুষ্ঠান প্রচারের পূর্বে আমাদের একটি বিশেষ ঘোষণা আছে—কাল রাত সাড়ে আটটা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম-এ ডক্টর নিত্যানন্দ সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি···

রাতুল উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে লাগলো ··

—ডক্টর নিত্যানন্দ সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রাতুল সেন গত বিশ্বযুদ্ধে যে বীরের মত হাসিমুখে প্রাণত্যাগ করেছে, সেই প্রাণাধিক পুত্রের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবেন—

মাথাটা যেন ঘুরতে লাগলো রাতুলের। কতদিন, কত মাস, কত বছর পরে সে বাবার গলা শুনতে পাবে। কিন্তু এমন ভুল কেমন করে হয়। কেমন করে এ সম্ভব হয়। রাতুল তো মরেনি। রাতুল তো বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে আছে তা-ই নয়—সে ফিরে যাচ্ছে তার বাবার কাছে। দরকার নেই আগে থেকে খবর দিয়ে। একেবারে হঠাৎ সে বাবার সামনে হাজির হয়ে বাবাকে চমকে দেবে। কী মজা! যাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ—সে আসলে মরেনি—কী মজা, কী মজা! আনন্দে রাতুলের হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো। এত যে কষ্ট—তা আর যেন কষ্ট বলে মনে হলো না তার। এখুনি যদি বাবাকে একটা চিঠি লিখে দেয় তো হাজার-হাজার টাকা এসে যাবে।

গুদামবাবু উঠলেন এবার। বললেন—তোর দরখাস্তটা আমি রেকমেণ্ড

করে দিয়েছি, বুঝলি—

কীসের দরখাস্ত! ঘাবড়ে গেল রাতুল।

—সাহেব জিগ্যেস করছিল কেমন কাজ করে ছোকরা—আমি বললাম—ভেরি গুড্। সাহেব চড়-চড় করে স্যাংশান্ করে দিলে—এখন আমাকে কি খাওয়াবি বল্—তোর যে দু'টাকা মাইনে বাড়ালো, আমাকে কিছু খাওয়া···

মাথায় তখন আর কিছু ঢুকছে না রাতুলের। কোথায় দু'টাকা মাইনে বাড়লো কার—আর কে খাওয়াবে! হঠাৎ মনে পড়লো শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর সেই বাড়ীটার কথা। বাবার পড়বার ঘর। সামনে একটা রাতুলের ফটো। সেখানে বসে বাবা লিখতেন কলেজ থেকে ফিরে এসে। সন্ধ্যের পর আটটার সময় খাওয়া। একসঙ্গে এক টেবিলে বসে। যেদিন রাতুলের দেরি হতো ফিরতে, সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতেন রাতুলের জন্যে। রাতুল এলে তখন একসঙ্গে খেতে বসতেন। মাঝে-মাঝে ডাকতেন—গোবিন্দ, ও গোবিন্দ—

গোবিন্দ এসে দাঁড়াত সামনে।

বাবা বলতেন—তোর হাতে কোন কাজ আছে বাবা?

—কাজ তো আছে, কিন্তু কী করতে হবে বলুন না—

—বেশি দূর নয়, ওই ট্রাম-রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে দেখ তো—খোকা আসছে কি না—

তারপর গোবিন্দ চলে যাওয়ার পর একবার জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিতেন। কার যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে। ঠিক যেন খোকার মত চলার শব্দ। তবে কি খোকা এল! শান্ত-গম্ভীর লোকটির অন্তরের অন্তস্থলে সবচেয়ে কোমল ঠাঁইটুকু খোকার জন্যে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন।

কিন্তু সেই একান্ত গোপনে রক্ষিত বহুমূল্যবান জিনিসটিও যেদিন ডাকাতে লুটে নিয়ে গেল। সেদিন! সেই ভয়ানক দিনটার কথা কল্পনা করতে চেষ্টা করলে রাতুল। যেদিন সৈন্যভর্তি জাহাজ ভোঁ দিয়ে ছাড়লো খিদিরপুরের ডক্। সে জাহাজ জানতেও পারলো না, কার বুক থেকে একটা আস্ত পাঁজরা খুলে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর হাতে।

কিন্তু কাল। আরো ছত্রিশ ঘণ্টা। এই ছত্রিশ ঘণ্টা কেমন করে কাটবে কেমন করে পার হবে এই সময়-সমুদ্র!

হঠাৎ গুদামবাবু ডাকলেন—এ কি রে ভোম্বল—কাঁদছিস কেন?

ঘর যে এমন করে টানে, বাড়ীর জন্যে মন যে এমন করে উতলা হয়, এর আগে রাতুল কোনও দিন তা জানতে পারেনি। কোথায় সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন, কোথায় কলকাতার কোন্ একপ্রান্তের একটা গলির দোতলা বাড়ী—

দিকহারা নাবিকের কাছে আজ যেন তাই একটা আলোকস্তম্ভের মত লোভনীয় মনে হলো।

সমস্ত দিন খাটুনি গেছে। মহারাজের মশলা পেষা, ঘর ঝাঁট দেওয়া আর গুদামবাবুর পা টেপা আর দু'জনের ঝগড়ার মধ্যে যোগসূত্র হয়ে পরনিন্দা শোনা—আর সকলের শেষে মহারাজের কাছে পেট ভরে ঝাল মাংস খাওয়া।

খাটুনি আর খাওয়ার পর পা দু'টো যেন আর চলতে চায় না। তারই এক ফাঁকে ভোম্বলের জন্যে লুকিয়ে খাবার নিয়ে আসা। তারপর সেই জাহাজের খোলের অন্ধকারের মধ্যে প্যাকিং কেস্-এর বাক্সর ওপর অঘোরে ঘুম।

কাল রাত সাড়ে আটটা।…রাত সাড়ে আটটা…

সমুদ্রের সীমান্ত পেরিয়ে…দেশ-কালের পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘুমের তরঙ্গ গড়িয়ে চললো অনেক অনেক দূর পর্যন্ত। এই অশেষ যাত্রার একদিন শেষ হবে। শেষ হবে প্রতীক্ষার। তখন আবার রাতুলের আকাশে সূর্যোদয় হবে। তখন আবার শেষ হবে পথ চলার।

সকালবেলার দিকে ভোম্বল এল। মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। বেশি কথা বলছে না। শুধু বললে—হ্যাঁরে, তুই বাঙালী হয়ে আমার এই সর্বনাশটা করলি?

—সর্বনাশ করলাম আমি—রাতুল অবাক হয়ে গেল।

কিছু উত্তর দেয় না ভোম্বল। গম্ভীর হয়ে শুধু চুপ করে বসে রইল।

রাতুল সামনে এগিয়ে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে জিগ্যেস করলে—কী করলাম আমি তোমার?

অনেকক্ষণ মুখে কোনও কথা নেই ভোম্বলের। এমন যে বাক্যবাগীশ ছেলে সে-ও যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে মিইয়ে গেছে। যেন সত্যি সত্যিই তার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে!

—কী করলাম বলো ভাই—অনুনয়ে কাতর হয়ে উঠলো রাতুল।

—তোকে খেতে দিতুম কিনা, বাঙালী বলে একটু খাতির করতাম, কিনা, তাই এমন সর্বনাশটা করতে পারলি—তা' তোরই বা দোষটা কি, এটা আমাদের বাঙালী জাতটারই দোষ—নিজের ভাই হলেও তোকে আমি খুন করে ফেলতুম, কিন্তু তুই আমার কে বল্ না যে তোকে বকবো, মারবো, ধরবো, —কলকাতায় পৌঁছে আমিই বা কে আর তুই-ই বা কে—কেউ কাউকে চিনিনে—ব্যস্ চুকে গেল ল্যাঠা…

ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভোম্বলের কথাগুলো শুনতে লাগল রাতুল—।

—ছোটবেলা থেকে বাপ-মা দূরে থাক, আপন বলতে কাউকে তো জানি না—গুণ্ডার দলে মানুষ—লাটু গুণ্ডা বলতো আউটরাম ঘাটের পঁইঠেতে আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিল, কে জানে আমার বাপ বেঁচে আছে কিনা, আর বেঁচে

থাকলেও কি আর চিনতে পারবে—কিংবা হয়ত যাতে আর না চিনতে হয়, তাই অমন করে ফেলে রেখে বেঁচোছল—এক-এক সময় ভাবি···

বলে ভোম্বল কী যেন ভাবতে লাগলো। কথাটা আর শেষ করলো না।

রাতুল সামনের প্যাকিং কেস্‌টার ওপর চুপ করে বসে পড়লো। সত্যিই এ-যেন অন্য ভোম্বল। রাতুল আবার জিগ্যেস করলে—আমি তোর কী সর্বনাশ করলাম বললি না তো—

—বলছি—

বলে ভোম্বল আরম্ভ করলে—ছাখ, আমাদের ওদামবাবু খাঁটুলির জমিদার বংশের লোক কিনা তা জানি না, আর মহারাজও বর্মার রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত কিনা তাও জানি না—তবে এইটুকু জানি যে, আমি একেবারে যাকে বলে বানের জলে ভেসে এসেছি···তাই আর কাউকে ভাসতে দেখলে প্রাণটা হু-হু করে ওঠে—গুণ্ডার দলের মধ্যে মানুষ, লাটু গুণ্ডা মানুষ করেছিল নিজের ছেলের মতো, মনে ভেবেছিল বড় হয়ে লাটুর মতো নামজাদা গুণ্ডা হতে পারবো। ·· কিন্তু তার আশা পূর্ণ হলো কই—হাত সাফাইটা ভালোই শিখেছিলাম, চর্চা রাখলে লাটুকে হারাতে পারতাম সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার শরীরের রক্তটা বোধ হয় আলাদা জাতের, নইলে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিতে বুকটা ছাঁৎ করে উঠতো কেন ?—তাইতো একদিন গুণ্ডার দল ছেড়ে পালালাম—লাটু গুণ্ডার ত্রিসীমানার বাইরে।

রাতুল অবাক হয়ে শুনছিল বললে—তারপর ?

ভোম্বল খানিক থেমে আবার বলতে লাগলো—তোদের বাপ-মা আছে, তোরা বুঝবিনে সে কী জ্বালা—পৃথিবীতে একলা হওয়ার যে সে কী জ্বালা, আহা এতবড় মানুষের সংসারে কোথাও পেছুটান নেইরে—ল্যাজা-মুড়ো পৃথিবীটাকে দু'পকেটে পুরে পথে যে বেরিয়ে পড়েছে সে-ই কেবল জানে—তারপর' কত রাত আউট্‌রাম ঘাটের রাস্তার ওপর দিয়ে দু'দিক চাইতে-চাইতে চলেছি—দেখি মা'কে চিনতে পারি কিনা! মোটর গাড়ীর মধ্যে, ঘোমটার ফাঁকে, চোখ দিয়ে খুঁজেছি মাকে, আবার ফুটপাতের ভিখিরী মেয়েমানুষের মুখের সঙ্গে নিজের মুখ মিলিয়ে দেখছি—কত রাতে কত নতুন আড্ডায় গিয়ে কাটিয়েছি আমার মা'র খোঁজে—শেষে একদিন পেলুম আমার মাকে···

—পেলি ? রাতুল অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে।

—হ্যাঁ পেলুম—স্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ের মাথায় মাকে আমার পেলুম—হাঁউ-মাঁউ করে রাস্তায় বসে কাঁদছে, চারিদিকে ভিড় জমে গেছে—আর তারই সামনে মোটরে চাপা-পড়া একটা রক্তমাখা মরা ছেলে। বুঝলাম এ-ই আমার মা—

রাতুল বললে—কিসে বুঝলি তোর মা ?

ভোম্বল সে কথার সোজা জবাব দিলে না। খানিক থেমে বললে—শুধু পেটে ধরলেই কি মা হয় রে বোকা ! থাক্ গে—সেই মাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে বাড়ীতে এলুম—

হঠাৎ গল্প করতে-করতে এক সময় ভোম্বল থেমে গিয়ে বললে—কিন্তু তোর সঙ্গেই বা এ-সব গল্প করছি কেন—তুই আমার কে ? তোর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া, আমার চাকরিটা তুই খেয়েছিলি আর একটু হলে—

রাতুল বললে—আমি তোর চাকরিটা খেলাম কিসে শুনি ?

ভোম্বল উঠলো। বললে—এখন আমার বলবার সময় নেই ও সব কথা —এখন থেকে নিজের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করো আর নয় তো হরিমটর—এ-শর্মা আর কারোর কেউ নয়—নিজের জন্মদায়িনী মা-ই যখন রাস্তায় ফেলে রেখে যেতে পারলো, তখন কোথাকার কে তুই, নাম জানি না, ধাম জানি না —তুই আমার সর্বনাশ করবি তা আর বিচিত্র কী !···

কথাটা বলেই ওপরে উঠে গেল ভোম্বল। সব কথা শোনার পর রাতুলের কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করলো ভোম্বলকে। কার কোথায় কোন ব্যথা লুকিয়ে থাকে কে জানে! আজন্ম ঘর-ছাড়া ছেলেটার ঘর বাঁধবার ঝোঁকও কি নেই ! শুধু কি ম্যাজিকের ইন্দ্রজালেই নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে চিরকাল। কিন্তু ভাবনাও হলো রাতুলের। এই নিরাপদ আশ্রয় থেকে কি তাকে শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হবে ? কলকাতা আর কতদুর ?

দুপুরের পরেই এল ভোম্বল। বললে—তা'হলে পাত্তাড়ি গুটোও—

—কোথায় ?

—এইবার যেখানে জাহাজ থামবে—আর ঘণ্টাখানেকের পরেই এস্তেন-এ। বিছানাপত্তর বাক্স-প্যাটরা সে-সব তো ঢু-ঢু—সারা দিন উপোস করে কাটাও —এক কাপড়ে এক গামছায় নামো জাহাজ থেকে—তারপর বিদেশ বিভুঁই-এ নেমে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে মরো—আমার কী, আমার ভাবতে বয়ে গেছে—তুমি মরো আর ঝরো, আমি দেখতে আসছিনে—আমার জন্যে যখন কারো মাথা ব্যথা নেই, তখন কারোর জন্যে ভাবতে আমার দায় পড়েছে—আমার চাকরিটাই কিনা তুই খেতে বসেছিলি—·

—তোর চাকরি আমি কখন খেতে গেলুম বলতো—

—কেন তোকে পই-পই করে বলে দিইনি যে সকালবেলা মহারাজের মশলা পিষে সারেঙ্ সাহেবের পা টিপবি! বলিনি তোকে ? আর এদিকে তিনি রেগে আগুন—সারাদিন কেউ আর তাঁর পা টিপতে এল না—

—আমি যে গুদামবাবুর পা টিপে এলাম—

—তবে আর কি, আমায় একেবারে কেতার্থ করে দিলে! গুদামের কাজ

করবার জন্যে ওঁর খাসচাকর ধর্মদাসই তো রয়েছে—কেন গেলি তার পা টিপতে, এখন সারেঙ সাহেব যে আমার হাজ্‌রি কেটে দিলে, একদিনের মাইনেই পাবো না—দিবি তুই সেটা ? তবু যা'হোক্ চাকরিটা যায়নি—

কথা বলতে-বলতে ভোম্বল চলে যাচ্ছিল। বললে—এবার নেমে যাও—এডেন আসছে—পরকে উপকার করার ফলটা টের পেয়েছি, খুব শিক্ষা হয়েছে আর নয়—ঘরের শত্রু বিভীষণ, এখন মানে-মানে দূর হও দিকি—

বলেই ভোম্বল চলে গেল। একলা প্যাকিং কেসটার ওপর বসে-বসে ভাবলে রাতুল। কোথায় কতদূর কলকাতা! যাত্রার মধ্যেখানেই এ কি দুর্দৈব! আবার কবে জাহাজের কোন্ বন্ধু জুটবে—কবে ভোম্বলদাসের মত একটি ছেলে তাকে ভাই-এর মত আদরে এতখানি পথ বিনা-টিকিটে নিয়ে আসবে—

আবার জাহাজের মাল তুলতে গুদামবাবু এল। কুলিরা এল। বড়-বড় প্যাকিং কেস তুলে ওপরে নিয়ে চললো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখানে বেশ অন্ধকার। এখন ছ'টা বেজেছে হয়ত। তারপর একসময় পৃথিবীর সব ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজবে। রেডিওতে ভেসে উঠবে বাবার গলার শব্দ। কথা বলার আওয়াজ। কত বছর পরে তার বাবা আবার তার নাম উচ্চারণ করবেন। কিন্তু রাতুল শুনতে পাবে না। সে তখন কোথায় কোন্ বন্দরে কী ভাবে আছে, কে বলতে পারে ?

চারিদিকে ঢং ঢং আওয়াজ। জাহাজ বোধ হয় বন্দরে ভিড়েছে। জেটিতে লাগবে আবার। হন্তদন্ত হয়ে ভোম্বল এল।

হাতে একটা খালাসীর পোশাক নিয়ে এসেছে। বললে—পর এটা—

রাতুল একবার ভোম্বলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। ভোম্বল বললে—দেখছিস কী আমার দিকে—এ-মুখে দয়া-মায়া নেই—কিচ্ছু নেই—আমাকে মায়া দেখাবার লোক যখন নেই, তখন আমিও······আজ সারেঙ্ সাহেব যখন আমায় অপমানটা করলে তখন তো কই তুমি তো বাঁচাতে এলে না বাপু—কেউ বাঁচাতে এল না। নেহাত সারেঙ্ সাহেবের পা দু'টো চেপে ধরলাম তাই—নইলে চাকরি তো আমার এখানেই খতম হতো—পৃথিবীতে কাউকে আর বিশ্বাস নেই—আর নিজের মা-ই যখন···

জামাটা নিয়ে রাতুল নিজের গায়ে পরলে। ভোম্বল বললে—জেটিতে লাগবার আগেই, জাহাজের বোট নিয়ে তোকে নামতে হবে। ভয় নেই আরো অনেক খালাসী নামবে, সেই সঙ্গে তোকেও জানিয়ে দেব—বলেই চলে গেল ভোম্বল। আজ তাকে বড় ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

তারপর সেই অন্ধকারে এক ফাঁকে ভোম্বল এসে ডাকলে। কাছে ডেকে জাহাজের ডেকের ওপর নিয়ে গেল। বললে—এই মোটা কাছির সিঁড়ি

বেয়ে-বেয়ে সোজা নেমে যাও—যেমন সবাই নামছে—যাও, নামো—

রাতুল দেখলে সবাই নামছে। সে-ও দড়ি ধরে ঝুললে। আর একবার ভোম্বলের মুখের দিকে চাইলে। ভোম্বল তার দিকেই চেয়ে ছিল, হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে নিল। তারপর সেই চার-পাঁচ তলা উচু থেকে দড়ি বেয়ে-বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ রাতুলের মনে হল—অদ্ভুত ওই ছেলেটা। এমন করে আদর করে আশ্রয় দিয়েছিলো ওই ভোম্বলই তো—আর আজ সে-ই নিজে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। নিচে গভীর কালো জল চিক্ চিক্ করছে। ছোট একটা বোট। তারই ওপর নামছে সবাই। বোটটা জাহাজের গায়ে লাগানো।

হু-হু করে হাওয়া আসছে। ছল্‌ছল্ করে জল আছড়ে এসে পড়ছে জাহাজের গায়ে। সাবধানে নীচে এসে দাঁড়ালো রাতুল। কাছেই জমজমাট শহর। সমস্ত তীরটা ঘেঁষে আলোর চকমকি জ্বলছে। আর এদিকটা অন্ধকার। ওদিক থেকে ওই রকম আর একটা বোট নেমেছে। ওদের সঙ্গে এদের চিৎকার করে কী সাংকেতিক ভাষায় কথা হচ্ছে কে জানে! আস্তে-আস্তে বোটটা এনে জেটির একপাশে লাগালো।

বিরাট বন্দর। তারপর গেট পেরিয়ে গেলেই রাস্তা। সোজা চওড়া সড়ক। দু'পাশে দোকান। চীনে আর মারোয়াড়ী আর সাহেব কত রকম জাতের লোক। চায়ের দোকান। খাবারের দোকান। রিক্সা, মোটর, বাস আর লরী। মাল বোঝাই হচ্ছে। ফেরিওলার চীৎকার। ভীষণ খিদে পেয়েছে রাতুলের। পকেটে একটাও পয়সা নেই। এ আবার কী বিপদ! এগিয়ে চললো রাতুল।

একটা দোকানের সামনে রেডিও বাজছে। ইংরেজী গান হচ্ছে। এখন ক'টা বাজে? ঘড়ি কাছাকাছি কোথাও আছে কিনা কে বলবে। নিচু হয়ে দেখলে একটা দেয়ালে। সাতটা বেজে গেছে। আর তো বেশী দেরি নেই। যদি কাউকে ব'লে কলকাতার স্টেশনটা ধরা যায় সাড়ে আটটার সময়। সেই বাবার শান্ত গলার আওয়াজ আবার বহুদিন বাদে শুনতে পাবে। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠবে বাবার প্রশান্ত মূর্তিটা।

দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাতুল। সেই মুহূর্তে বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে রাতুল যেন বহু দিন পরে আবার শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়ীর ঢোকবার মুখে ডান পাশে গোবিন্দর ঘর। গোবিন্দ ওখানে ঘুমোয় রাত্রে। গোবিন্দর ঘরের ভেতর দড়িতে টাঙানো ওর জামা কাপড়গুলো। টিম্ টিম্ করে বাতিটা জ্বলছে বাইরের বারান্দায়। সন্ধ্যে হতে

না হতেই গোবিন্দ ঝিমোয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে-মাঝে কেবল চমকে ওঠে। বাইরে কারো পায়ের শব্দ হলেই হাঁকে—কে যায়—কে যায়?

ছোটখাট বুড়ো মানুষটি। কী করে কোথা থেকে একদিন শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়াতে চাকরের চাকরি নিয়ে এসে পড়েছিল কারো মনে নেই। তারপর একে-একে অত বড় বাড়ী ক্রমে ফাঁকা হয়ে গেল, মা মারা গেল, দূর সম্পর্কের যারা ছিল, তাদেরও একে-একে বিদায় নেবার পালা এল। বাড়ীতে রইল বাবা, রাতুল আর গোবিন্দ। দুপুর বেলা যখন সব নিঝ্‌ঝুম, পাড়া ফাঁকা হয়ে এসেছে, গরমের দিনে রাস্তার মোড়ে কাঠি-বরফের ক্লান্ত ডাক ভেসে আসে, তখন চুপিচুপি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে কাঠি-বরফ কিনতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে গোবিন্দর কাছে।

—কে যায়?

টুপ্‌ করে পালিয়ে যাচ্ছিল রাতুল, কিন্তু গোবিন্দ উঠেছে।

—কোথায় যাচ্ছিলি খোকা—

—কাঠি-বরফ খেতে—

—যাও, এখন শুয়ে থাকো গে যাও—বাবুকে বলে দেব—বাবু তোমাকে বারণ করেছে না ও-সব ছাইভস্ম খেতে? মরণ নেই কাঠিবরফওলাদের, এত জায়গা থাকতে এই বাড়ীর সামনে আসিস্‌ কেন তোরা!

ফেরিওলাদের সঙ্গে তারপর সে কী ঝগড়া! পাড়ায় লোক জমে যেত।

তারপর রাতুলকে বুঝিয়ে ঘরে শুইয়ে দিয়ে আবার গিয়ে নিজের ঘরে শুয়েছে।

সেইখানে সেই এডেন বন্দরের বহু-বিচিত্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেডিওর সামনে গান শুনতে-শুনতে কখন সব ভুলে গেছে রাতুল। এই রাস্তা, মানুষ, সমুদ্র, পাহাড়, জল, মাঠ সমস্ত পেরিয়ে কখন একান্ত আপন বাসার ছোট নিরিবিলিটুকুতে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না রাতুলের।

হঠাৎ কাঁধের ওপর কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই রাতুল পেছন ফিরেছে। ফিরেই অবাক হয়ে গেছে। বললে-তুই? এখানে?

ভোম্বল কিন্তু কিছু কথা বলছে না।

রাতুল আবার জিজ্ঞেস করলে—তুই? আবার যে ফিরে এলি?

—ফিরে এলাম, মনটা খারাপ হয়ে গেল বলে—

ভোম্বল রাতুলের কাঁধে হাত রেখে বললে—তোকে তাড়িয়ে দিয়ে এস্তক্‌ মনটা হু হু করতে লাগলো—কুকুর নয়, বেড়াল নয়, একটা মানুষকে এমন করে তাড়ানো—মনে হলো আমি না হয় মায়ে-খেদানো ছেলে, আমার কথা আলাদা—সারা দুনিয়াটাই আমার পর—কিন্তু তুই তো তা নোস—

তারপর আবার থেমে বলতে লাগলো—তা যা'হোক, তোকে যা-কিছু বলেছি ভুলে যা তুই—আমাদের জাহাজ রাত সাড়ে ন'টায় ছাড়বে, তার আগেই চলে আসিস্, আমি জাহাজের সিঁড়ির মুখে দাঁড়াবো তোর জন্যে—

ভোম্বলের কথায় রাতুল যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। এ যেন মেঘ আর রোদ পাশাপাশি। তবু একেবারে নিরাশ্রয় সে নয়। কলকাতায় যাবার উপায় শেষ পর্যন্ত একটা হলো তা'হলে।

—আমি তা'হলে চলি এখন—তোর রাত্তিরের খাবারটা রেখে দেব অখন্, ততক্ষণ তুই দেশটা দেখে নে ঘুরে-ঘুরে—

বলে আবার ফিরে চলে গেল ভোম্বল।

ওধার দিয়ে একটা গাড়ী আসছিল, হর্নের আওয়াজে ফুটপাতের ওপর উঠে দাঁড়াল রাতুল। পাশেই একটা চায়ের দোকান। দোকানের বাইরে গোটাকতক চেয়ার। কে যেন পাশের চেয়ার থেকে ডাকলে—হরিদাস না?

পাশ ফিরতেই রাতুল দেখলে পরনে সালোয়ার আর মাথায় পাগড়ীপরা একটা লোক তার দিকে চেয়ে আছে।

—আমার নাম তো হরিদাস নয়—রাতুল বললে।

—হরিদাস নয়? আশ্চর্য তো—অবিকল হরিদাসের মতন দেখতে—

—কে হরিদাস?

—হরিদাসকে চেন না, বাড়ী কোথায়? কলকাতায়? এখানে কী করতে?

রাতুল বললে—তাদের জাহাজ এসেছে তাই কিছুক্ষণ বেড়াতে নেমেছে।

রাতুল আবার জিজ্ঞেস করে—কী জাত আপনার? এমন চমৎকার বাঙলা বলেন, অথচ পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে ··

হঠাৎ কী মনে করে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—চা খাবে নাকি ভাই ··ওহে আর এক কাপ চা দাও দিকিন—

চা-ও এসে গেল। নিজের মনেই ভদ্রলোক বললেন, হরিদাসটা জ্বালালে দেখছি···দু'জনে মিলেমিশে চায়ের দোকান করলাম—ভাবলাম এক সঙ্গে দুই বন্ধুতে থাকবো, ও দেখবে দোকান আর আমি দেখবো বাইরের কাজগুলো —কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই···কি বিপদেই যে আমাকে ফেলেছে···বলে ভদ্রলোক যেন হতাশায় মিইয়ে গেলেন।

রাতুল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে—কোথায় গেল কিছু খবর পেয়েছেন?

—যাবে আবার কোথায়, মাথায় পোকা হলে যা হয় তাই, সন্ন্যাসী হওয়ার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই ছিল কিনা, এই দেখ না ভাই—দশচক্রে ভগবান ভূত—আমি পাঞ্জাবী হয়ে গেছি আর সে নিয়েছে ভেক্···একই কথা;

নইলে এত দেশ থাকতে, নিজের বাড়ী-ঘর, বাঙলা দেশ থাকতে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে এসে চায়ের দোকান করা। বাঙলা তো ভুলেই গেছি একরকম ···পাঞ্জাবী মেয়ে বিয়ে করে এখানেই সংসার পেতেছি···এক কথায় সবে গুছিয়ে বসেছি, আর হরিদাস কিনা এই সময়ে···কী যে করি আমি···

খানিক পরে ভদ্রলোক বললেন—বাঙলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তো আর নেই, তাই বাঙলা কথাটাও ভুলে যাচ্ছি ক্রমে-ক্রমে···ওই মাঝে-মাঝে বাঙলা ভাষা কি বাঙলা গান শুনতে ইচ্ছে হলে রেডিওতে কলকাতা স্টেশনটা খুলি··· মনে পড়ে যায় সেই আমবাগান আর বাঁশ ঝোপের পাশ দিয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে যাবার রাস্তা···

রাতুল বললে—একবার রেডিওতে কলকাতাটা ধরুন না—অনেক দিন আমিও শুনিনি বাঙলা গান-টান্—

—বেশ তো···ওরে রেডিওটা ঘুরিয়ে কলকাতা চালিয়ে দে তো···

গুদামবাবুর ঘরে সেই রেডিওতে বাঙলা গান শোনা, আর আজ আবার সেই সুযোগ। এমন সুযোগ যে হঠাৎ এমনভাবে আসবে কে জানতো।

ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন—তুমি ততক্ষণ গান শোন ভাই—আমি আবার ওদিকে দেখি—সামনে না থাকলেই বেটারা চপ্ কাটলেটগুলো টপা-টপ্ মুখে পুরে দেবে সব—

কলকাতা স্টেশন থেকে তখন গান হচ্ছে। সাত-সমুদ্র তের-নদী পেরিয়ে গানের পাখীরা ঝাঁক বেঁধে আকাশে পাখা মেলে দিলে। আকাশময় তারা উড়ছে। এডেন্-এর বন্দরে এসে তারা বুঝি আজ সবাই বাসা বাঁধবে। রাতুলের চোখের সামনে থেকে কালো পর্দাখানা এক নিমেষে সরে গেল, আর সেই জনমুখর চায়ের দোকানের সামনে ফুটপাতে চেয়ারের ওপর বসে রাতুলের মনে হলো সেই পাখীদের গানের পাখায় ভর করে সে উড়তে-উড়তে চলে গেছে একেবারে কলকাতা শহরের মধ্যিখানে। সেখানে যারা থাকে তারা তার আপন জন—পরমাত্মীয়! আর কতক্ষণ! আর কতক্ষণ পরে তার সমস্ত অন্তর সচকিত করে সামনের রেডিওতে তার বাবার গলার শব্দ ভেসে আসবে। বহুদিন না-দেখা ছেলের কথা আবার তাঁর বক্তৃতায় করুণ-সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে—

তারপর এক সময় সাড়ে আটটাও বাজলো—

পৃথিবীর কোনও কোণে যদি কোথাও খোঁজা যায় তো এখন এই সময়ে একটু বাতাসও বুঝি পাওয়া যাবে না। দোকানের সমস্ত বাতিগুলো বুঝি একসঙ্গে নিভে গেল। পৃথিবীর আর সমস্ত লোক সবাই কোথায় এক মুহূর্তে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, আর দুই প্রান্তে কেবল দু'জন মাত্র বেঁচে আছে—এক

দিকে রাতুল আর দক্ষিণ সীমান্তের একেবারে শেষপ্রান্তে রাতুলের বাবা। প্রথমটা অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকার পর আস্তে-আস্তে রাতুলের সম্বিত ফিরে এল। চুপ করে সেইখানে বসেই সে শুনতে লাগলো।···

"···আমার দিব্যদৃষ্টি নেই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানের স্পর্ধাও নেই। শুধু বিজ্ঞানের আর তর্কশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে আমি যা বুঝেছি তাই আজ আপনাদের বলবো। ···আমার ছেলে রাতুলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে-দুর্ভাগ্যের আরম্ভ হয়েছে, পৃথিবীর সব মানুষের ভাগ্যেই প্রতিদিন সে দুর্ভাগ্য ঘটছে, এ-কথা ভাবলে মনে অনেকটা শান্তি পাই। কিন্তু যদি আরো ভাবি যে মরণের পরেও আমাদের অস্তিত্ব আছে, একদিন মরণের পর আমরা এক অক্ষয়লোকে গিয়ে নিজের-নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলবো, তা'হলে আমাদের সান্ত্বনার ভিত্তিমূল আরো মজবুত হয়ে ওঠে। আমরা এই জীবনের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এক অপূর্ব সান্ত্বনার আশ্রয় পাই।···আমার ছেলে রাতুল আজ সাত বছর আগে যুদ্ধে নিহত হয়। সে কোন্ দূর দেশের বাতাসে তার শেষ নিঃশ্বাস মিলিয়ে গিয়েছিল অচেনা, অদেখা শত্রুর গুলিতে, আমি টেরও পাইনি। একদিন যে-ছেলে আমাকে না বলে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল, সেই ছেলেরই মৃত্যু-সংবাদ একটা টেলিগ্রাম থেকে জানতে পারলাম। ছোট টেলিগ্রাম। কিন্তু বুকের ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়লো। কতদিন শয্যাশায়ী ছিলাম জানি না। সংসারে স্ত্রী অনেক দিন আগেই ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু সন্তানের শোক আমাকে অভিভূত করে দিলে। বিশ্বের অনন্ত ভাণ্ডারে যে অসীম জ্ঞানরাশি ছড়িয়ে আছে, তার তুলনায় আমাদের বর্তমান জগতের জ্ঞানটুকু কত তুচ্ছ তা' সেই পরম সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর নিয়মের কথা ভাবলেই কিছুটা অন্ততঃ উপলব্ধি করতে পারি। সৃষ্টির রহস্য কোনও দিন আমরা বুঝতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু তা বোঝবার আগে আমাদের বুঝতে হবে—কে সে জন যা'কে আমরা 'আমি' বলে থাকি—এই 'আমি' শুধু দেহগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিই নয়।—"

রাতুল চুপ করে শুনতে লাগলো বাবার কথা। কিছু বুঝতে পারা গেল কিছু বোঝা গেল না। বক্তৃতার স্তরে-স্তরে রাতুল যেন তার বাবাকে চোখের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে। শোকে অভিভূত একটি মানুষ মৃত-ছেলের ধ্যান করছেন দিনরাত—গবেষণা করছেন সেই বিষয় নিয়ে।

আবার তার বাবার স্বর ভেসে উঠলো—

"···সেই ছেলের সঙ্গে আমার অন্ততঃ প্রতিটি দিন কথা হয়। তার অশরীরী আত্মা আমার সান্নিধ্যে এসে বড় তৃপ্তি পায়—রাতুল আমাকে তার মনোভাব প্রকাশ করে—তার বিদেহী-দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখে। রাতুলকে

আমি অন্ধভাবে ভালবাসতুম স্বীকার করি, কিন্তু আজ আমি আপনাদের যে-কথা বলবো তা' থেকে বুঝবেন, অন্ধ-সংস্কারের বশে আমি কিছু মেনে নিইনি। যা' কিছু আমি স্বীকার করেছি, সমস্তই যুক্তি ও বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে পরে মেনে নিয়েছি । আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই রাতুলকে দেখেছেন' আজো যদি জিজ্ঞেস করি তাকে, মনে আছে কিনা সেই সব দিনের কথা, সমস্ত সে স্পষ্ট উত্তর দেয়—সশরীরে এ-পৃথিবীতে যে নেই—পৃথিবীর মন তার এখনও হারায়নি—আবার গবেষণা তাই শুরু হয় আমার মৃত-পুত্র রাতুলকে নিয়ে···রাতুল নেই আর এ পৃথিবীতে—কিন্তু তার আত্মার সান্নিধ্যে এসে আমি তার শোক কিছুটা ভুলেছি ··"

বক্তৃতার শেষে রেডিওর তরফ থেকে বলা হলো—

"·· এতক্ষণ যাঁর বক্তৃতা শুনলেন এর নাম অধ্যাপক ডঃ নিত্যানন্দ সেন। ইনি দর্শনের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে সম্প্রতি বিষয়ান্তরের গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। এই গবেষণার জন্য ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে নানান উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছেন। শ্রোতাদের অনুরোধে আগামী মাসে আমরা আবার এঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করবো "

এ কেমন করে হয়। কেমন করে সম্ভব হয়। রাতুল বসে-বসে ভাবতে লাগলো। বাবার সমস্ত গবেষণা—বাবার সমস্ত চিন্তা, কল্পনা—প্রতিষ্ঠা—তার অর্থাৎ রাতুলের মৃত্যুর ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে বিশ্বাস করে নিতে হয় রাতুলের মৃত্যু হয়েছে, পরে অন্য সব গবেষণা। নাকি রাতুলের বাবাই ঠিক আর রাতুলই বেঠিক। রাতুল আসলে মারা গেছে। যা কিছু করেছে সে—যা কিছু দেখছে সে, সব ভৌতিক দেখা। অবিশ্যি এরা সবাই মানুষ! 'ওই ভোম্বলটা—ওই হরিদাসের বন্ধু চায়ের দোকানের মালিক, তারপর সেই হাসপাতাল, সেই ডাক্তার, বুড়ী নার্স সবাই নিশ্চয় মানুষ। নিজের পায়ের পাতা দু'টোর দিকে রাতুল ভালো করে চেয়ে দেখলো, গায়ের চামড়ায় একটা চিমটি কাটলো—উঃ, বেশ লেগেছে। ফুলে উঠলো জায়গাটা। ছায়ার শরীর তার নয়—খিদে পায়—ভয় পায়—কান্না পায়। তা'ছাড়া সে যদি ভূতই হবে—তাকে দেখে তো কেউ ভয় পাচ্ছে না। মানুষের মত তার সমস্ত। তাকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তারের অত চেষ্টা—তাকে ভালো করবার জন্যে কত রকম অখাদ্য খাওয়ানো। নিমপাতা তো তার জিবে তেতোই লাগতো, চা তো মিষ্টিই লাগছে। সে তো কই উড়ে এদেশ থেকে ওদেশে যেতে পারে না। সে তো ভূতের মত অদৃশ্য হয়ে যাবার কৌশল জানে না। তাইতো তাকে জাহজে লুকিয়ে কাটাতে হয়।

তা'হলে—কোন্‌টা ভুল! কে বেঠিক!

তার বাবা কেমন করে এ-ভুল করতে পারেন। তার বাবার মত অত বড় পণ্ডিত লোক—অত জ্ঞানী—তাও কি সম্ভব! আর তার বাবাও যদি ভুল করে থাকেন—বিশ্বসুদ্ধ লোকই কি পাগল! এতগুলো ইউনিভার্সিটি থেকে তাঁকে যে ডিগ্রীগুলো দেওয়া হলো, সবই কি তা'হলে ধাপ্পাবাজি! পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই তা হলে কি এমনি ধাপ্পাবাজি আর মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তা তো হতে পারে না। এ রাতুলেরই ভুল। তাঁর নিজেরই হয়ত স্মরণশক্তির গোলমাল এখনও সারেনি। তার নাম আসলে হয়ত রাতুল নয়। অন্য কিছু। তার সত্যিকারের নাম হয়ত রাতুল নয়। সে হয়ত অন্য কেউ হবে। আসল রাতুল মারা গেছে। যে আসলে প্রফেসার নিত্যানন্দ সেনের ছেলে, সে হয়ত বেঁচে নেই। হঠাৎ সেই বইটা পড়তে পড়তেই তো তার মাথায় আসে যে তারই নাম রাতুল। সে হয়ত গোবরডাঙ্গা কিম্বা ঘুঘুডাঙ্গা কিম্বা চড়কডাঙ্গার লোক। তার নাম হরিদাস কিম্বা শিবদাস কিম্বা বিপ্রদাস। সে নিজে হয়ত ভাবছে তার রোগ সেরেছে —আসলে রোগ মোটে সারেনি তার। সেই রোগের চোটেই এই ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। এই ঘুরে বেড়ানোটাই হয়ত একটা রোগ—এই ঘুরে বেড়ানোটাই হয়ত একটা রোগ—এই ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেটা। কিন্তু যুদ্ধে কি সত্যিই সে গিয়েছিল? তবে যদি যুদ্ধেই সে না যাবে তা'হলে ওই এক অদ্ভুত জায়গায় কেমন করে সে পৌঁছুলো। যেখানে না আছে একটা বাঙালী —না আছে একটা কিছু। কেবল একটা হাসপাতাল আর সমুদ্র। জানালা থেকে ওই সমুদ্রটা কী বিরাট দেখাতো।

কিন্তু বাবার সেই বইটাতেই তো রাতুলের একটা ছবি ছিল। ছবিটি অবিশ্যি ছোটবেলার। কিন্তু কিছুই তো বিশেষ মেলে না। অবিশ্যি না মেলাটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের মাঠে সেই ভীষণ আঘাত পেয়ে চেহারাটাই তো তার আমূল বদলে গেছে। মাথার ভেতরের ঘি-গুলো যেমন উল্টে পাল্টে গিয়েছিল, তেমনি চেহারাটারও তো বিরাট এক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পুরোন লোকদের তাকে বিশেষ চিনতে পারার কথা নয়। আমেরিকার 'মেডিকেল জার্নালে' "কেস নম্বর ৪৯"-এর যে-ছবি বেরিয়েছিল, সে-ছবি আর প্রফেসর নিত্যানন্দ সেন-এর বইতে যে ছবি আছে, সে দু'টোর মধ্যেও তো অনেকটা ফারাক। সুতরাং কেন যে তার এ-কথা মনে এল যে সে-ই রাতুল, কে জানে। তা'হলে কোথায় চলেছে সে। কোন্ মরীচিকার পেছনে? কার কাছে সে যাচ্ছে? কে তার বাবা?

চোখ দু'টো ঝাপসা ভারী হয়ে আসতে লাগলো রাতুলের। কেউ নেই তার। এতদিন তো বাবার স্মৃতি সামনে রেখেই সে এগিয়ে এসেছে।

ধ্রুবতারার মত সে চেয়েছিল বাবার মুখের দিকে। বাবা ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে সে জানতো না। কিন্তু এখন যে একেবারে নিরাশ্রয় সে। কোথায় তার বাবা। বাবা তো তাকে বাতিল বলে ধরে নিয়েছেন। সে তো নেই। রাতুল তাঁর কাছে তো বেঁচে নেই!

রেডিও কখন বন্ধ হয়ে গেছে কিছু ঠিক নেই—

হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজবার সঙ্কেত শোনা গেল।

দশটা! চম্‌কে উঠলো রাতুল। জাহাজ ছাড়বার কথা ন'টায়। উঠলো রাতুল।

—একি, উঠছো যে—পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এগিয়ে এলো। দোকান বুঝি তার বন্ধ করবার সময় হয়েছিল। হাতে চাবির গোছা। দোকানের খদ্দের সব চলে গেছে। একলা বুঝি রাতুল একমনে রেডিও শুনতে-শুনতে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে ফেলেছে। ওদিকে ভোম্বল মাংস-ভাত নিয়ে বসে থাকবে বলেছে।

রাতুল চলে যাবার উদ্যোগ করতেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বললে—চললে কোথায়?

—আমার জাহাজ বোধহয় ছেড়ে দিলে—দেখি। বললে রাতুল।

—দেখে লাভ নেই ভাই, জাহাজ চলে গেছে—হুইসল্ বাজলো শুনতে পাওনি—সে জাহাজে এতক্ষণে মাঝ-দরিয়ায়—

—তা'হলে কি হবে? প্রশ্নটা যেন রাতুল নিজেকে করলে। সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

—কী আর হবে! চাকরিটা যাবে—কত টাকা মাইনে পেতে শুনি?

ভদ্রলোক ততক্ষণে দোকানের ঝাপ বন্ধ করে দিয়েছে। দু-চারজন কর্মচারী যারা সমস্ত দেখাশোনা করে, তারা ভদ্রলোকের কাছে ছুটি নিয়ে চলে গেল।

ভদ্রলোক বললে—ভেবে আর কী লাভ বলো? চল—আমার ওখানেই চল—শুতে হবে তো একটা জায়গায়—তা শোবার জায়গাও রয়েছে—হরিদাসের ঘরটা তার বিছানা-টিছানা সব পড়ে আছে, যেমন-কে-তেমন—

—আমার যে কলকাতায় যাওয়া বিশেষ দরকার ছিল একবার—

ভদ্রলোক হাসলো। বললে—কলকাতায় যাওয়াটাই তোমার বড় হলো—কিন্তু এদিকে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যায়, এটাও বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছে—নইলে—

রাতুল বললে—নইলে কী···?

—নইলে···বলছি—চল না আমার সঙ্গে বাড়ীতে, এখন তো কেঁদে-কেটে কোন লাভ নেই···ও জাহাজ পাওয়ার কোনও ভরসা নেই ভাই—

বাড়ীতে গিয়ে ভদ্রলোক হাতে করে ত্ব'থালা ভাত নিয়ে এসে একেবারে বিছানায় বসলো। বললে—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কি না, নিজেই ভাত তুলে নিয়ে এলুম—খেয়ে নাও—

মাংস আর ভাত। খিদেও পেয়েছিল খুব। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে পড়ে এ-আবার কোথায় এল সে। একদিন রাতুল ভেবেছিল ভোম্বলই বুঝি তার একমাত্র ভরসা। এ-পৃথিবীতে ভোম্বলের একটি মাত্র আদর্শ আছে—সে তার ম্যাজিক। একদিন তার মা তাকে পৃথিবীর পিঠের ওপর ফেলে লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল, সেই থেকে বুঝি সমস্ত দুনিয়াটাকেই সে ইন্দ্রজাল বলে মনে করে। আর এই ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক বলতে লাগলো—কালকে কোথায় ছিলে আর আজ কোথায় কার সঙ্গে বিছানায় বসে ভাত খাচ্ছ। এমনিই হয়···এই দেখ না হরিদাসটা চলে গেল···

রাতুল বললে—কোথায় গেছে? সন্ন্যাসী হয়ে গেছে আপনি ঠিক জানেন?

ভদ্রলোক বললে—ওই দিকেই যে বরাবর ঝোঁক ছিল তার···কেবল আমাকেও নিয়ে যেতে চাইত সঙ্গে···

রাতুল বললে—তারপর—

—তারপর আর কি। কত করে সংসারে মন ফেরাবার কত চেষ্টা করলুম। কিছুতেই ভোলে না ভবি। আমাকে হরিদাস বলতো—ভবতোষ সব ছেড়ে দে···ও আনন্দের কাছে এ-সব পার্থিব আনন্দ কিছু নয়···চল ভবতোষ ত্ব'জনে মিলেই সব ছেড়ে চলে যাই···কিন্তু যা হবার নয়, তা কেন হবে বল···শেষে একদিন কাউকে কিছু না বলে শুধু আমাকে একটা চিঠি লিখে চলে গেল···

রাতুল বললে—চলে গেল ··

ভবতোষবাবু বললেন···হ্যাঁ চলে গেল···কিন্তু মজাটা ঘটলো তার পরে ··

রাতুল বললে···কী মজা?

···মজা হলো কি···ও চলে যাবার পর, হঠাৎ একটা চিঠি এসে হাজির ওর নামে···এক উকীল পাঠিয়েছে বার্মা থেকে। চিঠিটা অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষে কেমন করে জানি না এখানে এসে পৌঁচেছে। খামের চিঠি। খুলে পড়ে দেখি ভেতরে এক অদ্ভুত খবর লেখা আছে। ভীষণ অদ্ভুত খবর।

ওর কোন্ এক দাদামশাই বুঝি বর্মাতে সেগুন কাঠের ব্যবসা করতো। ও ত'াকে দেখেছে কি দেখেনি কে জানে···ওর মুখে তো কখনও নাম শুনিনি। সেই দাদামশাই সেই সেগুন কাঠের জঙ্গলে মারা গেছে। মারা গেছে যাক, ভালোই হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ায় এক হরিদাস ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। প্রায় দু'লক্ষ টাকা রেখে গেছেন এর নামে। আমাদের এই হরিদাস। দেখ ভাই—ভাগ্যটা দেখ। যে টাকা চায় না—টাকা তার পেছনেই কিনা ধাওয়া করে। চিঠি পড়ে তো আমার হাত কাঁপতে লাগলো। দু'লক্ষ টাকা। কিন্তু সে-টাকা তো আমার নয়। তা' না হোক—হরিদাসের তো! কিন্তু দুঃখ হলো এই ভেবে যে, টাকাটা তো কেউ-না-কেউ লুটেপুটে খাবে—মনটা ভেবে-ভেবে ভারী খারাপ হয়ে গেল। একটা চিঠি লিখে দিলাম উকিলের নামে যে হরিদাস তীর্থ করতে বেরিয়েছে, সে এলে ত'াকে টাকা আনতে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব—তারপর থেকে ভাই আর শান্তি নেই। চিঠি তো লিখে দিলাম—কিন্তু হরিদাসকে কোথায় পাই—কেবল পাগলের মতন নতুন লোকের মুখের দিকে চেয়ে দেখি। জাহাজের জেটি-ঘাটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ তোমাকে দেখেই চম্‌কে উঠলাম। চেহারাটা অবিকল হরিদাসের মত—গলার আওয়াজটি পর্যন্ত···

তারপর ঢক্-ঢক্ করে এক বাটি দুধ খেয়ে ভবতোষবাবু বললেন—ওই দেখ না—ওই সব জামা-কাপড় সব হরিদাসের—কিছুই সে নিয়ে যায়নি—এই ঘরেই শুতো সে, এই বিছানা—এই জামা-কাপড়, ওই যে ওর একটা ফটো ঝুলছে দেয়ালে—

তারপর হঠাৎ ভবতোষবাবু রাতুলের হাত ধরে ফেললে আবেগে। বললে-তুমি ভাই জাহাজের চাকরিতে কত আর মাইনে পেতে—পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, নয়ত বড়জোর আশি—কিন্তু এ-টাকাটা পেলে তোমার যে সারাজীবন আর খেটে খেতে হবে না ভাই—তা ভাই তোমার আসল নাম জানি না—ভালোই হয়েছে—তোমাকে আজ থেকে আমি হরিদাস বলেই ডাকবো—

রাত অনেক হয়েছে। এ-সব কী ঘটনা ঘটছে তার জীবনে। কোথায় ছিল সে হাসপাতালের একটা ঘরে বন্ধ। কোথায় ছুটে চলেছিল বাবার আকর্ষণে কোলকাতায়। তারপর কেমন করে এখানে এই এডেন বন্দরের এক প্রান্তে এসে পড়েছে। এসে কার বাড়ীতে কার বিছানায় বসে ভাত খেতে খেতে এই পটপরিবর্তন। ভবতোষবাবু বললেন—হরিদাস আমার ছোট-বেলার বন্ধু—আমি তার নাড়িনক্ষত্র জানি—তোমাকে আমি সব রিহার্সাল দিয়ে শিখিয়ে নেব—তা'ছাড়া জামা-কাপড় কাগজপত্তর সবই তার—এখন তোমার শুধু ইচ্ছেটি হওয়া—আর—

রাতুল বললে—আর কী ?

—আর আমার কিছু দাবী নেই ভাই—আমাকে তুমি দয়া করে যা দেবে, আমি তাই-ই হাত পেতে নেব—

খানিক পরে ভবতোষবাবু বললে—তা এখন থাক্ ওসব কথা—অনেক রাত হয়ে গেল—তুমি ভাবো, ভাবো ভালো করে—কাল সকালে আমাকে বলো—কেমন ?

রাতুল কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা আচমকা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। নিস্তব্ধ রাত। অচেনা ঘর। অচেনা দেশ। একদিনের পরিচিত কে-না-কে ভবতোষবাবু—তার বাড়ীতে এক রাত্রের জন্যে শুয়ে একি বিপদ। তার ভাগ্য তাকে কোথায় এনে ফেলেছে। তার তো ঘর-ছাড়া হবার কথা নয়। আশ্রয়ের তার অভাব নেই। প্রচুর তার ঘর। স্নেহ-ভালবাসা তার জন্যে উদার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নিশিদিন। ভোম্বলের মত অবস্থা তো তার নয়। ভোম্বলের মত নিরাশ্রয় সে নয়। ভোম্বল জন্মাবধি চেয়েছিল ঘর আর স্নেহ—তা সে পায়নি বলেই আজ যাযাবর-বৃত্তি নিয়েছে। আর রাতুল। সব থাকতেও সে সাধ করে বেরিয়েছে পৃথিবীকে আস্বাদ করতে। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে তার। সাধ মিটে গেছে আজ। সে আবার ফিরে যেতে চায় বাবার স্নেহ-নীড়ের শান্ত নিরিবিলিতে।

কিন্তু এই যখন মনের অবস্থা এমন সময় কোথায় এসে আটকে গেল সে। পাল-তোলা নৌকা হঠাৎ ফুটো হলো নাকি ?

ভবতোষবাবুর কথায় রাজী হয়ে গেলে অনেক টাকার মালিক হওয়া যায়। ভবতোষবাবু ভেবেছেন টাকা উপায় করতেই বুঝি বেরিয়েছে সে। কিন্তু ভবতোষবাবু তো জানেন না টাকার তার অভাব নেই। বাবার একমাত্র ছেলে সে। বাবার স্নেহের, বাবার অর্থের সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী। একবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারলেই হলো। বাবা তাকে তাঁর উদার বুকের মধ্যে টেনে নেবেন। আর ছাড়বেন না। একদিকে বাবার পৃথিবী আর একদিকে তাঁর ছেলে রাতুল। রাতুলের জন্যে বাবা তাঁর সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করতে রাজী। ছেলের অভাবে তার বাবার জীবন শূন্য—আর হারানো ছেলে ফিরে এলে তবেই তা সম্পূর্ণ হবে।

কিন্তু সেই বাবার কাছে যাবার উপায়ই বা কি ? একমাত্র ভোম্বল ছিল ভরসা। বিনা-টিকিটে খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু কোথাকার

জল কোথায় গড়াল। কী থেকে কী হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জাহাজ ছেড়ে গেল নিঃশব্দে। টের পায়নি সে রেডিওতে বাবার বক্তৃতা শুনতে-শুনতে।

তারপর এল ভবতোষবাবু। ঈশ্বরের কোন্ নির্দেশ সে মানবে। কাকে সে গ্রহণ করবে! রাতুলকে তুমি এ-কোন্ বিপদে ফেললে ভগবান! যখন সে নির্বান্ধব-নিরাশ্রয়, তখন তাকে এ কোন্ পরীক্ষায় ফেললে। বিদেশের এই অপরিচিত আবহাওয়া—যখন তার হাতে একটা পাই পয়সাও নেই, যখন একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন—তখন সেই আশ্রয় তুমি দিলে, কিন্তু কোন্ ঘৃণিত পন্থার বিনিময়ে। নিজেকে সে কেমন করে ক্ষমা করবে! এর চেয়ে এডেনের রাস্তায় ভিক্ষে করাও যে ভালো ছিল। কিম্বা এই যদি তার কপালে ছিল, তা'হলে সে তার সেই দ্বীপের মধ্যেকার হাসপাতালটাতেই তো ছিল ভালো। সারাজীবন—যতদিন সে বাঁচবে সবাই তাকে রাখবে, তাড়িয়ে দেবে না! তা'রা জানবে তা'কে শুধু 'কেস নম্বর ৪৯' বলে! প্রতিদানে কোনও উপকার চাইবে না।

হঠাৎ রাতুলের মনে হলো পাশের ঘরে কে যেন করাত দিয়ে কী কাটছে! এত রাত্রে কি তবে কেউ সিঁধ কাটছে নাক! নাকি অন্য কোন বিপদ!

মাঝে-মাঝে আবার ধুপ্ ধাপ্ করে অদ্ভুত আর একরকম শব্দ। রাতুলের কেমন গা ছমছম করতে লাগলো। কার মনে কী মতলব আছে কে জানে! ভবতোষবাবুর মনে কী মতলব কাজ করছে বলা শক্ত।

এমন হতে পারে রাতুলকে এইখানে খুন করে রটিয়ে দেবে যে হরিদাস আত্মহত্যা করেছে। তারপর যে কোনও একটি জাল-চিঠি প্রকাশ করা খুব শক্ত নয়। সেই জাল চিঠিতে হরিদাস লিখেছে যে, সে তার যাবতীয় সম্পত্তি তার বন্ধু ভবতোষকে···

কাজ হাঁসিল করবার জন্যে বদমাস লোকেদের দ্বারা সবই সম্ভব।

একবার মনে হলো পালিয়ে যাবে নাকি সে। নিঃশব্দে এই মাঝরাতে এমনি ভাবেই দরজা খুলে সে যাবে নাকি বেরিয়ে। তারপর দু'পা যেদিকে যায়, দেবে চালিয়ে। এই বন্দরের ছোঁয়াচ থেকে অনেক দূরে, যেখানে ভবতোষবাবুর হাত পৌঁছবে না। পায়ে চলে হাঁটা-পথে সে কলকাতা পাড়ি দেবে। যতদূর যাওয়া যায়। যেখানে পথ আটকে দাঁড়াবে সমুদ্র—সেখানে অন্য পন্থার কথা ভাবা যাবে। আর যদি কোনও সূত্রে সে একবার এরো-প্লেনের সাহায্য পেয়ে যায় তবে তো নিশ্চিন্ত। যে-কোনও রকমে এই সাত সমুদ্র-তের-নদী পার হওয়া।

হঠাৎ বাইরে দরজায় টোকা মারার শব্দ হলো—হরিদাস, ও হরিদাস—তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে রাতুল দরজার কাছে গেল।

দরজার খিলটা খুলে দেবে কিনা বুঝতে পারলে না।

আবার ডাক এল—হরিদাস, ও হরিদাস, দরজা খোল ভাই—

দরজা একসময়ে খুলে দিতেই রাতুল অল্প আলোয় দেখলে ভবতোষবাবুর এক হাতে একটা টর্চ আর একহাতে একটা ছোরা…

টর্চের আলোয় ছোরাটা জিভ্ মেলে যেন লক্-লক্ করে উঠলো।

ঝাপ্‌সা অন্ধকারের মধ্যে ভবতোষবাবুর মুখখানা যেন হঠাৎ বড় বীভৎস মনে হলো রাতুলের। মনে হলো এ-লোকের দ্বারা সমস্ত সম্ভব। এইখানে এই মাঝরাতে তাকে যদি মেরে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলাও হয়, তার কিছু বলবার নেই।

ভয়ে নয়, হতাশায় রাতুল একবার চীৎকার করতে চেষ্টা করলে। এর চেয়ে ভীষণ বিপদের মধ্যে সে পড়েছে। আরো অনেক ভয়ঙ্কর সে সব অভিজ্ঞতা। একেবারে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা। মানুষের প্রাণ নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা চলে। জীবন যেখানে সস্তা—সেই সব অভিজ্ঞতা সে কয়েকবার আস্বাদ করেছে।

কিন্তু এ তা নয়। বাবার শেষ জীবনে আর সে বাবাকে শান্তি দিতে পারবে না। একদিন বাবার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাবার মনে যে-নিদারুণ ব্যথা দিয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ আর সে করতে পারবে না। হতাশার রাতুলের গলায় আওয়াজ যেন কে বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু ভবতোষবাবু ততক্ষণে এগিয়ে এসেই রাতুলের গলাটা টিপে ধরেছে।

ঠিক টিপে ধরেনি। টিপতে যাবার জন্যে একটা হাত বাড়িয়েছে—

আর সঙ্গে-সঙ্গে রাতুল একটু পেছনে সরে গিয়েই ধরে ফেলেছে ভবতোষ-বাবুর হাতখানা। মুহূর্তের মধ্যে বাঁ হাত দিয়ে একটা পায়ে টান দিতেই ভবতোষবাবু পড়ে গেছে চিৎ হয়ে।

এক নিমেষে রাতুল উঠে বসলো ভবতোষবাবুর বুকের ওপর। লম্বা চওড়া চেহারা। মোষের দুধ আর ঘি খাওয়া শরীর রাতুলের হাতের চাপে একেবারে বে-কায়দা হয়ে নিরুপায়ের মতন শুয়ে-শুয়ে থর থর-করে কাঁপতে লাগলো।একবার চেষ্টা করতেই রাতুল কনুই দিয়ে পেটে চাপ দিলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভবতোষবাবু এক ভীষণ চীৎকার করে উঠলো।

সে চীৎকারে রাতুলের ঘুম ভেঙে গেছে। রাতুল সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানার শুয়ে চোখ চেয়ে দেখলে—কোথায় কে। সে তো সেই বিছানায় শুয়েই আছে। উঠে আলো জ্বাললে রাতুল। পাশের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলে।

তবে সে এতক্ষণ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এই বীভৎস স্বপ্ন দেখছিল নাকি। আশ্চর্য!

তাই তো বটে। একি অদ্ভুত স্বপ্ন। কেন যে এমন স্বপ্ন দেখলে কে জানে। সমস্ত রাত সে হরিদাসের কথা ভাবতে-ভাবতেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর ঘুমের মধ্যে সেই-চিন্তার নাগপাশে জড়িয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু ভবতোষবাবুই বা তাকে খুন করবার চেষ্টা কেন করবে। যদি সে রাজী না-ই হয়। যদি সে ভবতোষবাবুর প্রস্তাবে রাজী না-ই হয় তা' হলেই বা কে কী করতে পারে? কিন্তু এই অবস্থায় রাজী না হয়েই বা উপায় কী।

ঘরের দেয়ালে একটা ফোটো টাঙানো ছিল। বোধ হয় হরিদাসের ফোটো। প্রায় রাতুলের মতন চেহারাই বটে। একটা সাদা-পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে কাবলা জুতো। চুলটাও প্রায় তারই মত করে কাটা।

আজ থেকে তাকে আর কেউ রাতুল বলে জানবে না।

ভাবতেই যেন কেমন কষ্ট হলো রাতুলের। নামে কী আসে যায়। সত্যি কথা। কিন্তু আজ থেকে কি তার অতীত জীবনটাকে একেবারে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে। তার বাবা বলে কেউ থাকবে না। তার নিজের বাড়িতে তার ঢোকবার অধিকার পর্যন্ত থাকবে না। জীবনে কত রকম অভিজ্ঞতাই তার হলো। আরো কত হতে বাকি আছে। একদিন তাকে সবাই জানতো রাতুল বলে। সে-নাম বদলে গিয়ে তার নাম হলো 'কেস নম্বর ৪৯'। আর এখন থেকে হবে হরিদাস। কোন এক হরিদাসের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে হবে। এ যেন চিরস্থায়ীভাবে ছদ্মবেশ পরে থাকা। থিয়েটারে একরাত্রের জন্যে 'আলমগীরের' পার্ট করা কত আনন্দের—আর সারা জীবন আলমগীরের পোষাক পরে ঘরে-বাইরে ঘুরে বেড়ানো—সে কী ভীষণ দুর্দৈব। নাম থেকে হাতের লেখা পর্যন্ত সমস্ত তার বদলে যাবে। হরিদাসের পরিচয় তার পরিচয়। হরিদাসের শিক্ষা তার শিক্ষা, হরিদাসের আত্মীয় তার আত্মীয়, হরিদাসের বন্ধু তার বন্ধু, হরিদাসের শত্রু তার শত্রু। একটা সুটকেস ছিল ঘরের মধ্যে। রাতুল ঢাকনাটা তুলতেই খুলে গেল। ভেতরে কাপড় জামা, তার তলায় অনেকগুলো চিঠি। একটা চিঠি খুলে পড়তে লাগলো রাতুল। বাঁকা-চোরা হাতের লেখা—

"পল্টুদা, কয়েকমাস তোমার কোনও খবর পাইনি, আমরা বেঁচে আছি কি মারা গেছি তা-ও তোমার খোঁজ রাখবার দরকার হয় না—জানি না এমন পাথরের মত তোমার মনটা কে তৈরি করেছিল—এবার কাঁচামিঠে গাছে খুব আম হয়েছে, পেকে-পেকে পড়ে থাকে গাছতলায়। যখন দুপুর বেলা একলা গিয়ে দেখি তখন আমার ভারি কষ্ট হয়। মা বলছে—আমি নাকি বড্ড

রোগা হয়ে গেছি···তোমার পোঁতা সেই পেয়ারা গাছটাতে এবার ফল হতে আরম্ভ করেছে, তুমি বলেছিলে ও-পেয়ারা প্রথম হলে বুড়োশিবতলার ঠাকুরকে দিতে···আমি প্রথম ফলটা গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঠাকুরের পায়ের কাছে দিয়ে এসেছি···খেয়ে দেখলাম খুব মিষ্টি পেয়ারা। আর জানো, সেদিন ঝড়ে বার-বাড়ার সজনে গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়েছে···"

আর একখানা চিঠি—

"···পল্টুদা, আমার কোনও চিঠিরই উত্তর পেলাম না—জানি না তোমার হাতে এ-চিঠি পৌঁছোয় কিনা—নাকি পোস্ট মাস্টার নিজেই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ে আর হাসে। হয়ত পাগলী ভাবে আমাকে···আমার চিঠি লিখতে আর ভাল লাগে না—এক তরফা কত লিখি···কিন্তু মা কিছুতেই শোনে না, অন্ধ কিনা, তাই হয়ত আমার ভাবনাটা বড্ড ভারী হয়ে বুকে চেপেছে···বলে উত্তর পাস্ আর না-পাস্ চিঠি লিখে যা···কিন্তু পল্টুদা, আর কেউ না চিনুক আমি তোমাকে চিনি···ফুটবল খেলতে গিয়ে যেদিন তুমি পা ভেঙে বাড়ী ফিরলে —আর যে-কোনও ছেলে হলে কেঁদে-কেটে বাড়ী মাথায় করতো···কিন্তু তুমি বালিশে মুখ গুঁজে সেই যে পড়ে রইলে···সারারাত তোমার পায়ে আমি সেঁক দিয়ে দিলাম—আমি জানতাম কী দারুণ ব্যথা হয়েছিল সেদিন ··এক একবার আমি ভাবতাম তোমার বাপ-মা-ভাই-বোন নেই, না-ই বা থাকলো···আমার তো বাপ-মা আছে—তোমাকে ধরে রাখতে পারবো···কিন্তু আচ্ছা পল্টুদা, তুমি বলেছিলে, তেমন করে ডাকলে ঠাকুর কথা শোনেন···সে কোন্ ঠাকুর পল্টুদা'—কোন্ ঠাকুর···আমাদের বুড়োশিব কিন্তু একেবারে কালা, না ? ··"

এই রকম প্রায় তিন শো চিঠি। চিঠির নিচে নাম সই করেছে—শৈল। কে এই শৈল ? হরিদাসের ডাক নাম বুঝি পল্টু। দিনের পর দিন —মাসের পর মাস, এমনি অসংখ্য চিঠি লিখে গিয়েছে। রাতুল তারিখটা লক্ষ্য করলে। সব চেয়ে পুরনো চিঠির তিন বছর আগের লেখা। কাল সময় করে একবার সমস্ত চিঠিগুলো পড়ে নেবে সে।

বাক্সর ভেতরের পাঞ্জাবি-ধুতি বার করলে রাতুল। একটা পাঞ্জাবি নিজের গায়ে পরলে। ঠিক ফিট্ করেছে। কোনও খুঁত নেই। যদি হরিদাসই তাকে হতে হয় বাধ্য হয়ে, তখন তো হরিদাসই তাকে সাজতে হবে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তাকে হরিদাস সাজতেই হবে ; তারপর হাতে টাকা এলেই সে আবার বাড়ি ফিরে যাবে। জাহাজের টিকিট কাটবে··· নয়তো এরোপ্লেনের।

রাত হয়ত শেষ হয়ে আসছে। বাইরে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে রাতুল। অচেনা দেশের ভোর বুঝি সব দেশে একভাবেই

হয়। নীল্‌চে-নীল্‌চে অন্ধকার, আর ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা আলো।

সেই হরিদাসের পোষাক পরে রাতুল ভাবতে চেষ্টা করলো। কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ীর কথা আর নয়। সে-বাড়ীর কথা, সেই গোবিন্দর কথা, বাবার কথা এখন বুঝি অনধিকার চর্চা তার কাছে।

খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের লোনা হাওয়া হু-হু করে মুখে এসে লাগছে। কিছু দেখা যায় না কোনও দিকে। কিন্তু রাতুলের মনে হলো সে যেন দেখতে পেলে! ভোরবেলা আম কুড়োতে বেরিয়েছে হরিদাস আর একটি ছোট মেয়ে। তার নাম শৈল। শৈলর আঁচলে গুচ্ছের আম। হরিদাস আম কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখছে শৈলর আঁচলে। কাঁচামিঠে আমগাছতলায় আসতেই শৈল পেছন থেকে ডাকল—পল্টুদা'—

পল্টু পেছন ফিরে বললে—কি রে শৈলি—

—বড় ভয় করছে পল্টুদা—ওখানে শাঁড়া গাছের পেছনে কে নড়ে উঠলো—

—ভয় কিসের, আয়—

বলে পল্টু দুই হাত দিয়ে ছোট বোনটির মত শৈলকে জড়িয়ে ধরে রইল : বললে—কিছু ভয় নেই রে—বুকে হাত দে, বুকে হাত দিয়ে বল্‌—রাম—রাম—রাম—কুড়ি বার রাম-নাম জপ কর···ভয় পালিয়ে যাবে—

সেই ভোরবেলা আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে সেদিন শৈল পল্টুদার কথায় কত কুড়িবার রাম-নাম জপ করেছিল, সে হিসেব শৈলর চিঠিতে লেখা রয়েছে। আজ কোথায় কোন্‌ গ্রামের প্রান্তে কোন্‌ অখ্যাত জনপদে শৈল থাকে আর কোথায় তার পল্টুদা—হিমালয়ের কোন দুর্গম গুহায় আশ্রয় নিয়েছে কোন্‌ পরমাশ্চর্যের সন্ধানে, কে খবর রাখবে।

পেছন থেকে দরজা ঠেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে ভবতোষবাবু এল। সারা গায়ে মাটি মাখা, লেংটি পরা। এতক্ষণ বুঝি কুস্তি করছিলো। কী অটুট চেহারা। স্বপ্নে এই ভবতোষবাবুকেই রাতুল কাবু করে চিৎ করে ফেলেছিল।

বললে—কুস্তি করে এলাম—এইবার দোকানে যাব—তোমার চা আর দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি ভাই।

খানিক পরে ফিরে যাবার আগে ভবতোষবাবু পেছন ফিরে বললে—আমার ব্যাপারটার কিছু ভেবেছ নাকি—রাজী তো?

রাতুল ভবতোষবাবুর মুখের ওপর চোখ দু'টো স্থির করে রাখলে। তারপর বললে—আমি রাজী—

'রাজী' কথাটা মুখে তো সে বললে, কিন্তু বলা যত সহজ, কাজে করা কি

কেমন ? এ-ও তো এক রকমের ভণ্ডামি। বাবার কাছে ছোটবেলা থেকে সে যত উপদেশ শুনেছে—তার মধ্যে প্রধান হলো "সর্বদা সত্য আচরণ করবে—"

জীবনে কখনও তার বাবা মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। কলেজে বাবার থাকতো দু'টো দোয়াত। একটাতে কলেজের দেওয়া কালি-কলম আর একটা নিজের পয়সায় কেনা দোয়াত-কালি কলম। কলেজের কাজে কলেজের কালি -কলম, আর নিজের ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লিখতেন নিজের কেনা কালিতে।

প্রথম-প্রথম রাতুলের কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকতো। একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল। বাবা বলেছিলেন—মনে-প্রাণে সত্য হতে হবে—সত্যং শিবম্ সুন্দরম্—যা সত্য তাই শিব, তাই সুন্দর—সুন্দরের এছাড়া আর কোনও অর্থ হয় না রে খোকা—

রাতুল জিজ্ঞেস করেছিল—তা'হলে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য, বুঝবো কী করে বাবা ?

—ওর একটা মাত্র পরীক্ষা আছে, সেটা হচ্ছে—যে কাজ পরের কাছে বলতে তোমার লজ্জা হবে—বুঝবে সে কাজ অন্যায়···সত্য কাজে কখনও লজ্জা হয় না—

সেই বাবার ছেলে হয়ে রাতুল আজ চরম মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবে সে কি টাকার লোভে ? না হয় তার টাকার লোভ নেই, কিন্তু এ-ছাড়া তার গতিই বা কি ? বিশাল পৃথিবীর এক প্রান্তে বিনা-প্রতিদানে কে তাকে আশ্রয় দেবে ? তার আত্মগোপন করা ছাড়া আর কিছু উপায় আছে কি ! যেখানেই সে আশ্রয় চাইতে যাবে, তারা তার সত্য পরিচয় জানতে চাইবে। একটা টিউশানি পেতে গেলেও তার নাম-ধাম পরিচয় জানাতে হবে।

যাক গে এ-সব কথা। যখন সে কথা দিয়েছে, তাকে তা রাখতেই হবে।

ভালোই হলো। রাতুলের একদিন মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, আজই এই এডেন বন্দরে 'কেস নম্বর ৪৯'-এরও মৃত্যু হলো—এর পর যতদিন সে বেঁচে থাকবে, লোকে তা'কে হরিদাস বলেই জানুক। এ তার মিথ্যাচার নয়, এ জন্মান্তর এডেন-এর মরু-শৈলে এসে তার জন্মান্তর ঘটলো যেন।

ভবতোষবাবু দোকানে যাবার আগে একবার দেখা করে গেল।

বললে—তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি এখেনে—তুমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো ভাই—আমি দুপুর বেলা খেতে আসবো, তখন কথা হবে—আর যদি বেড়াতে-বেড়াতে একবার দোকানে আসো তো চপ্-কাটলেট্ খাওয়াবো'খন—

—চলুন আমিও যাই—একটু খোলা হাওয়ায়···

কোথায় কোন্ দিকে বেড়াবে সে। চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলো রাতুল। কাল রাত্রে রাতুল এসে নেমেছে—এখানকার কিছুই দেখেনি।

ভবতোষবাবু বললে—কোথায় আর বেড়াবে ভাই—এ মরুভূমির দেশ, একটা সবুজ ঘাস পর্যন্ত দেখতে পাবে না কোথাও—নইলে জলটুকু পর্যন্ত এখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—

খানিকদূর গিয়ে ভবতোষবাবু আবার বললে—প্রথম যখন দুই বন্ধুতে এলাম এদেশে—জাহাজ থেকে তো নামলাম ভাই—শেষে কী যে হলো, সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল, গরমের চোটে রাতে ঘুম নেই—দিনের বেলা ঘরের বাইরে বেরুতে পারিনে—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, একগ্লাস জল খেতে পাইনে—ভাবলাম দূর ছাই পালাব এ-দেশ ছেড়ে···শেষে···

দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভবতোষবাবু বললে—ওই যে দেখছ 'জেবেল ইহ্সানের' পাহাড়—ওই পাহাড়ের তলায় আরবদের একটা বস্তীতে গিয়ে উঠলুম দু'জনে—কিন্তু পাহাড় না পাহাড় একটা ঘাস পর্যন্ত যেখানে বাঁচে না, সেখানে কি মানুষ বাঁচে? তবু হরিদাস বললে, এখানেই থাকবো—বাঙলা দেশকে যখন ছেড়ে এসেছি তখন আর বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দেব না—নিজের জন্মভূমি, নিজের দেশই যখন ঠাঁই দিলে না আমাদের, তখন সব দেশই আমাদের দেশ—এখানে যখন এত মানুষ বাস করছে, আমরাই বা থাকতে পারবো না কেন—আমরাও তো মানুষ—

দু'জনেই হাঁটতে-হাঁটতে চলেছি। উটের সারি চলেছে রাস্তায়। অদ্ভুত জন্তু! কী কদাকার শরীর—কিন্তু ও ছাড়া আর নির্ভরই বা কী। নীল সমুদ্রের জাহাজের মত ধূসর জানোয়ার। পিঠের ওপর শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে চলেছে কালো-কালো সোমালিরা।

ভবতোষবাবু এবার থমকে দাঁড়াল। বললে—এবার আমি আসি ভাই—আমি যাবো বাঁ-দিকে—কিন্তু ঘুরে এসো ঠিক আমার দোকানে—

রাতুল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। বললে—আচ্ছা আপনারা দু'জনে দেশ ছেড়ে এলেন কেন তাই কেবল ভাবছি···

হঠাৎ যেন কেমন উদাস হয়ে গেল ভবতোষবাবু। সেই ভোরবেলা এডেন-এর ধূলিরুক্ষ পাহাড়ি রাস্তায় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ভবতোষবাবু একবার খানিকক্ষণের জন্যে চোখ বুজলো! তারপর চোখ দু'টো খুলে আস্তে আস্তে বললে—শেষকালে এই সময়ে দেশের কথা মনে পড়িয়ে দিলে ভাই—কাজটা ভাল করলে না—

সামনে 'স্টীমার পয়েন্টে'র দিকে 'মা-আলা' রোড। সেই দিকেই চলতে লাগলো ভবতোষবাবু। যেন স্বপ্নের ঘোর লেগেছে তার চোখে। বললে··· বাবা মরে গেল। কিছুদিন পরে ভাত খেতে বসে দেখি শুধু ভাতই খাচ্ছি, তরকারি নেই। একদিন বাড়ি ফিরেছি দেরি করে, শুনলাম ভাত ফুরিয়ে

গেছে···তখন কি জানি যে সংসারের আমি কেউ নই—

ভবতোষবাবু যেন নিজের মনেই কথা বলতে লাগলো—হঠাৎ তাই একদিন চোখ তুলে চাইলাম—দেখলাম সব বদলে গেছে—রান্নাঘর হয়েছে তিনটে···আমার সংসার থাকলে চারটে রান্নাঘরই হতো···দেখলাম বাড়ীর মধ্যে পাঁচিল উঠে গেছে তিনটে···চার ভাই আমরা, আমিই সবচেয়ে ছোট। বড় তিন ভাই-এর বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। আর হরিদাস? পৃথিবীতে ওর যারা আপনজন তারা কবে ছেড়ে চলে গেছে মনেও নেই কারো· মানুষ হলো যাদের বাড়ীতে, তারা ওর কেউ-ই নয় বলতে গেলে—শুধু শৈলর জন্যে ওর মনটা মাঝে-মাঝে কেমন করতো। তা যা'হোক্ ··যেই একাদন বললাম—পালিয়ে যাবি হরিদাস? অমনি রাজী, বরাবরই ওর নিরুদ্দেশের দিকে ঝোঁকটা ছিল কিনা···

গল্প বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে ঘুরে দাঁড়াল ভবতোষবাবু।

বললে—থাক্‌গে এ-সব বাজে কথা, এ-সব মনে না পড়াই ভালো রে—

রাতুল দেখলে, ভবতোষবাবুর চোখ দু'টো ছলছল্ করে উঠেছে।

তারপর আর কিছু না বলে হঠাৎ নিজের দোকানের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলে ভবতোষবাবু। চলে যাবার আগে বললে—গরীব হওয়ার জ্বালাটা জীবনে বড় হাড়ে-হাড়েই বুঝেছি ভাই—তাইতো তোমাকে হরিদাস সাজতে বলা, নইলে আর কিসের···

হাঁটতে-হাঁটতে রাতুল সোজা চলে এল 'স্টীমার পয়েন্টে'র দিকে। একলা।

ভেতরে বন্দর থেকে একখানা আরবী বজরা ধীরে-ধীরে বাহির সমুদ্রের দিকে চলছে। আর ওদিকে জলের গা-ঘেঁষে একজন সোমালি মাল্লা নামাজ পড়তে বসেছে। কালো সমুদ্রের জল সূর্যের আলো লেগে একটু চিক্ চিক্ করে—প্রায়ান্ধকার সমুদ্রের বুকে দূরে হয়ত একটা উড়ন্ত মাছ জল থেকে দশ-বারো ফুট লাফিয়ে উঠে আবার জলে পড়ে গেল। তার পেছনে কিছু দূরে আবার আর একটা···তার পেছনে আবার একটা। জেটির গা-ঘেঁষে একটা নৌকো আস্তে-আস্তে ছেড়েছে। কোথায় বুঝি কোন্ দ্বীপের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। মাল্লারা তালে-তালে দাঁড় বাইছে, আর চীৎকার করে বলছে—'ইয়াহুদী ও আল্লা'······'ইয়াহুদী ও আল্লা'! সকালের ঝিরঝিরে বাতাসে সমুদ্রের বুকে মৃদু ঢেউ দেখা দেয়। একটা জাহাজ হয়ত তখন আরো দূরে দক্ষিণে চলে গিয়ে ভোরের অন্ধকারে কৃষ্ণবিন্দুর মত মিলিয়ে যায়।

ওপাশে মুখ ফিরিয়ে দেখলে রাতুল। চওড়া রাস্তাটার দিকে। এর মধ্যে রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হয়ে গেছে। তেজী রোদ্দুর ওঠবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ওরা। উটের নাকের দড়ি ধরে নিয়ে আরবরা সব

নিজের কাজে চলেছে। তাদের ঝোলা আলখাল্লার নানা জায়গায় ছোরা-ছুরি ঝুলছে—রূপোর বাঁটওয়ালা ছোরা ছুরি। তাদের পেছনে চলেছে আর একজন! দেখে মনে হয় ওদের চেয়ে বুঝি এ অনেক বড়লোক, পরনে লম্বা রেশমী জোব্বা। গায়ে সোনালী জরির কাজ করা ভেলভেটের ওয়েস্ট কোট। আর রাস্তা ঘেঁসে চলেছে বস্তী—দেখে বোধ হয় জেলেদের বস্তী—

হঠাৎ! হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেল রাতুল।

উল্টো দিক থেকে কে আসছে! যেন চেনা-চেনা মুখটা না! অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে দিয়ে দেখতে লাগলো রাতুল। তারপর মূর্তিটা সামনে আসতেই চীৎকার করে উঠেছে—ভোম্বল, ভোম্বল তুই?

ভোম্বলদাস সামনে এগিয়ে এল। অত সকালেই চীনেবাদাম চিবুচ্ছে। পকেট থেকে দু'টো চিনেবাদাম বার করে এগিয়ে বললে—খুব ছেলে যাহোক বটে তুই। নে খা···

রাতুল ভোম্বলের দু'টো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—ভোম্বল তুই যাসনি?

কাল সমস্ত রাত ধরে যেন ভূমিকম্প হয়েছে—আর আজ যেন তা এতক্ষণে থামলো। অকূল সমুদ্রে দিকহারা জাহাজ যেন এতক্ষণে এসে তীরে ভিড়লো। রাতুল এবার নিশ্চিন্ত, নির্ভয়।

—তা'হলে তুই চলে যাসনি ভোম্বল?

···আচ্ছা তো ছেলে যাহোক তুই ··মাংস ভাত নিয়ে বসে রইলাম···ক্ষিদে কি আসে? মনে করলাম রাগ করেছে ঠিক আমার ওপর···বাঙালীর ছেলেদের অন্য মুরোদ তো নেই, কেবল রাগতেই জানে। আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো, প্রথমে জেটির পঁইঠেতে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর যখন সিঁড়ি তুলে নিলে, জাহাজের রেলিং ধরে অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবতে লাগলাম···কী হলো ছেলেটার, কী হতে পারে ছেলেটার···আর যে খুঁজতে বেরুবো তার উপায় নেই···গেট্ বন্ধ হয়ে গেছে···রাতে কি ঘুম আসে তোর জন্যে, অচেনা-অজানা জায়গা, কাউকে চিনিস না, জানিস না···কোথায় শুবি, কী খাবি ভেবে-ভেবে···হ্যাঁরে সারারাত কোথায় কাটালি···কী খেলি···কিন্তু তুই ন'টার সময় এলি নাই বা কেন?···ওঃ মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে তোর···খাওয়াবেই বা কে, ভোম্বলদাস তো আর গণ্ডা-গণ্ডা নেই দুনিয়ায়, আর ওদিকে পকেটও তো তোর গড়ের মাঠ জানি··

রাতুল বললে···রেডিও শুনতে-শুনতে রাত দশটা বেজে গেল খেয়াল ছিল না···ভাবলাম জাহাজ ছেড়ে গেছে···কিন্তু সে যা'হোক, তুই যাসনি কেন ভোম্বল বল্ তো···

···আরে আমাদের জাহাজ যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল···রাত ন'টার সময়

ছাড়বার কথা, হঠাৎ কী হলো বয়লারে না কিসে, জাহাজ আর নড়ে না, সমস্ত রাত ধরে সেই জাহাজ সারানো হচ্ছে···এখন শুনছি নাকি ঠিক হয়েছে···বেলা দশটায় বুঝি ছাড়বার কথা। তা' সারা রাত তোর জন্যে ভেবে-ভেবে সকালবেলা বেরুলাম দেখতে···ছেলেটা কোথায় গেল···মরলো না বাঁচলো··· তা চ' তোকে ঢুকিয়ে দিই ভেতরে···

রাতুল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। তাহ'লে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় তার যাওয়া হলো। বললে···দাঁড়া, আমি একবার ভবতোষবাবুকে খবর দিয়ে আসি···এখুনি যাবো আর আসবো···

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে···ভবতোষবাবু কে ?

···এসে বলবো'খন···

'মা-আলা রোড' ধরে আবার রাতুল চললো। রাস্তায় তখন লোকের আনাগোনা বেড়েছে। অনেক উটের সারি আর ভিড় পেরিয়ে রাতুল পৌঁছুল দোকানের সামনে। ভবতোষবাবু তখন নিজের হাতে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে।

···এসেছ ? ভালোই করেছ···বোস ভাই, বোস···চা খাও···

···না, বসতে আসিনি ভবতোষবাবু, আমি চল্লাম···রাতুল হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে।

ভবতোষবাবু পাখা হাতে নিয়েই উঠে এল। বললে সে কি ? কোথায়-চললে ?

···আমাদের জাহাজ কাল রাত্রে নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল···এখনও জেটিতে রয়েছে···দশটায় ছাড়বে···আমি যাই ভবতোষবাবু

—যাবে, সত্যি ?···তা'হলে ?···গলাটা যেন কেমন করুণ হয়ে এল ভবতোষবাবুর।

আবার বললে···তোমাকে আর আটকে রাখবো কী করে ভাই···তা যা-হোক আমাদের কথাবার্তা কাউকে বলো না···আর, একটা কথা ··

আড়ালে টেনে নিয়ে এসে ভবতোষবাবু চুপি-চুপি বললে—কথা তোমায় দেওয়া রইল ভাই···জাহাজের চাকরিতে কত আর পাচ্ছ ··যখনি আসবে তুমি তখনি তোমায় নিয়ে যাবো বার্মায়···দু'জনে যাবো···একবার টাকাটা হাতে পেয়ে গেলে তখন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকো না ভাই, গরীব হওয়ার জ্বালাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝছি কি না ভাই, তাই, নইলে কিসের আ···

রাতুল চুপ করে রইল। ভবতোষবাবু আর একবার বললে···তাহ'লে ওই কথাই রইল ভাই···যখনই তুমি আসবে তখনই···তুমিই ভাই আমার একমাত্র ভরসা···তা নিরাশ আমি হবো না ভাই···অতগুলো টাকা···তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো কিন্তু·· তা বেশী যেন দেরি করো না তা'বলে···ভবতোষবাবুর চোখদু'টো কান্নায় ছলছল করতে লাগলো।

নিজের ঘরে নিত্যানন্দ সেন বসে লিখছিলেন। নতুন বইখানার মালমশলা সব তৈরী। সমস্ত বইখানা এবার আগাগোড়া ঘষামাজা করবেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর জানলা দিয়ে নিত্যানন্দ সেন একবার বাইরে চেয়ে দেখলেন। পশ্চিম দিকের আকাশটা লাল হয়ে এসেছে। রক্তের মত লাল। সাত বছর আগে আকাশের আরো অনেকখানি অংশ দেখা যেত। এখন গলির ওদিকটায় বড়-বড় বাড়ী হয়েছে। তখন ওখানে মাঠ ছিল। বিকেলবেলা ওই মাঠে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতো রাতুল। আর জানলা দিয়ে দেখতেন তিনি। খোকা ছিল একাই একশো। সমস্ত খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়ে জয়মাল্যটা ছিল খোকারই বরাবরের প্রাপ্য। যেখানেই তিনি যেতেন, মনটা তাঁর পড়ে থাকতো খোকার দিকে। কোথায় কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে। কার মাথা ফাটিয়ে দেয়। কার কী ক্ষতি করে—গুণগাত দিতে তো হবে তাঁকেই। আর তাছাড়া খোকারই বা-কী দোষ। প্রায় সারাদিন তিনি থাকতেন কলেজে। খোকাকে দেখাশোনা করবার ভার গোবিন্দর ওপর। গোবিন্দকেই বা খোকা মানবে কেন। কী খেলো, কী না খেলো, কী পড়লো, ঘুমোল কি না, সারাদিন শুধু হয় তো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দুপুরে রোদ্দুরে খেলা করে বেড়াল—সমস্ত খুঁটিনাটির খবর নিতেন কলেজ থেকে ফিরে।

—গোবিন্দ, ও গোবিন্দ—

বাড়ীর একেবার শেষমহলে গোবিন্দ তখন উনুনে আগুন দিচ্ছে। বাড়ীময় ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে। বাবুর আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এসেছে।

হাতে একগাদা মোটা-মোটা বই। কাঁধে সিল্কের চাদর। হাত থেকে বইগুলো নিলে গোবিন্দ। গলার চাদরটাও প্রফেসার দিলেন গোবিন্দকে।

—খোকাকে দেখছিনে যে—খেলতে গেছে বুঝি ?

—না, খেলে তো অনেকক্ষণ ফিরেছে—ওপরে পড়ার ঘরে দেখেছিলাম—

প্রফেসার আগে আগে, গোবিন্দ পেছন-পেছন। সিঁড়ির ওপরেই ডানদিকে ফিরে একটা মস্ত হলঘর। প্রায় দু'খানা ঘরের সমান। যখন রাতুলের মা বেঁচে ছিলেন, তখন ওই ঘরে খোকাকে নিয়ে তিনি থাকতেন। বাবা থাকতেন পাশের ছোট ঘরটিতে তাঁর নিজের লেখাপড়া, বই খাতা নিয়ে। তখন কচ্চিৎ নিজের ঘর থেকে বাইরে বেরুতেন। মাকে আর মনে পড়বার কথা নয়। এত ছোট বয়সে মারা গেলেন তিনি। প্রফেসারের এখনও মনে আছে সেই দিনটার কথা। অল্প-অল্প শীতের রাত। ডাক্তার রাত তিনটের সময় মুখ ঘুরিয়ে নিলে। দার্শনিক প্রফেসার বাইরের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিলেন ···শেষ রাত্রের ঘোলাটে আকাশ থেকে একটা' বড় তারা দপ্ দপ্ করে জ্বলতে-জ্বলতে খসে পড়ে গেল। ছাদের আর গাছপালার ঢেউ-এর ওপর সে-তারাটা এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ। আর দেখা পাওয়া গেল না। আর খোকা তখন ওই বড় ঘরখানার পশ্চিমে আর একটা খাটে শুয়ে স্বপ্নের ঘোরে হাসছে। প্রফেসার সেই দুর্যোগের মধ্যেই রাতুলকে একবার দেখতে গেলেন। দু'বছরের শিশুর মুখে চোখে কোনও বিকার নেই। নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে শুয়ে শুয়ে খোকা ঘুমুচ্ছে···আর ঘুমের মধ্যেই যেন ছেড়ে-আসা-স্বর্গের স্বপ্ন দেখে হাসছে। খোকার জন্মের পর থেকেই ওর জীবনের শুরুতে যে দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল তার পরিণতি যে এমন করুণভাবে হবে তা দার্শনিক প্রফেসারের বোঝা উচিৎ ছিল। একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন···খোকা তোমার জন্যে যে বড় কষ্ট হয় আমার ··

অন্ধকার ঘরে গোল একটা টেবিলের সামনে বসে অনেকবার প্রফেসার এই প্রশ্ন করেছিলেন—খোকা, তোমাকে না দেখে যে আমার বড় কষ্ট হয়···

···আমারও কষ্ট হয় বাবা···খোকার উত্তর স্পষ্ট লেখা হয়ে পড়েছিল কাগজের ওপর।

···তবে তোমার আসতে এত দেরী হয় কেন ? আজকাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যে তুমিআসো···আমার জন্যে কি সত্যিই তোমার মন কেমন করে ?

অন্ধকার রাত্রের দ্বিপ্রহরে সম্ভুনাথ পণ্ডিত লেনের একটি খিল-বন্ধ ঘরের ভেতরে বসে রাতের পর রাত এমনি প্রশ্নোত্তর চলে।

—তোমার আসতে কষ্ট হয় কি খোকা ?

—আজ খুব ভালো লাগছে—

—ওখানে গিয়ে কার-কার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

—মার সঙ্গে দেখা হয়েছে—

—যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বোমার আঘাত লেগে পড়ে গিয়েছিলে, তোমার খুব যন্ত্রণা হয়েছিল, না খোকা—আহা তুমি কতই না কষ্ট পেয়েছিলে।

—এখানে এসে আর তো কোন কষ্ট নেই বাবা, বড় শান্তি এখানে—

খোকা শান্তিতে আছে জেনে বড় স্বস্তি পান নিত্যানন্দ সেন। এই রকম দিনের পর দিন পিতা-পুত্রের কথাবার্তা চলতে থাকে। আর নতুন বইটাতে তারই বিবরণ দেন বিশদ করে। এমনি করে স্যার অলিভার লজের ছেলে রেমণ্ড একদিন মারা যায়, আর স্যার অলিভার তাকে নিয়ে বই লেখেন—"The Survival of Man"। রাতুলকে নিয়েও নিত্যানন্দ সেন অনেকগুলো বই লিখেছেন। ছেলের মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বাস্তব জগৎ থেকে একরকম বিদায়ই নিয়েছেন বলা চলে। কিন্তু তবু সমাজ-সংসার একেবারে ত্যাগ করতে পারেন না। বক্তৃতা শুনতে চায় লোকেরা সামনে বসে তাঁকে তাঁর নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে হয়। বলতে হয় রেডিওতে। খবরের কাগজের লোকেরা এসে তাঁর ফটো নিয়ে যায়। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিলেন নির্জন গৃহকোণে আত্মচিন্তা নিয়ে দিন কাটাবেন—কিন্তু উল্টো হয়েছে ফল। কত দূর-দূর থেকে আসে নিমন্ত্রণ। কত সুদূর থেকে আসে চিঠিপত্র। কত অজানা-অচেনা লোকের অনুরোধ-উপরোধ। পৃথিবীর কত লোক তাঁরই মত আত্মীয়-বিয়োগবিধুর—তাঁর কাছ থেকে শুনতে চায় তাদের পরমাত্মীয়দের কথা। মৃত্যুর পর তারা কেমন আছে। তারা আমাদের কথা ভাবে কিনা। সান্ত্বনা চায় তাঁর কাছে। তাঁর বই কেনে। পড়ে। আর চিঠিপত্রে কৃতজ্ঞতা জানায় তাঁকে। আমরা কতটুকু জানি, কতটুকু বুঝি, কতটুকু দেখি। আমাদের জানা, বোঝা আর দেখার বাইরে যে-অনন্ত অপার রহস্যময় জগৎ অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে, তাকে দেখতে, জানতে, বুঝতে হবে। একদিন প্রাচীন ঋষিরা কোনোপনিষদে লিখে গেছেন—

"যস্যামতং তস্য মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতম বিজানতাম॥"

কতদিন কত ছলে নিত্যানন্দ সেন রাতুলকে এই উপদেশ দিয়েছেন। সত্যকে জানবার চেষ্টা করতে হবে। সত্য আচরণ করতে হবে। পৃথিবীর আর সব মায়া—সব ছলনা। কেবল সত্যই শ্রেয়। সৎ-চিৎ-আনন্দ। সেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করো। তোমার ঐকান্তিকতা দিয়ে—সাধনা দিয়ে—যোগ দিয়ে। রাতুলের মৃত্যুর পর নিত্যানন্দ সেনের একটা পরম লাভ

হয়েছে। তিনি সেই পরম পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন। রাতুলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই সচ্চিদানন্দ তাঁর অন্তর্লোকে যেন উদ্ভাসিত হতে চলেছে।

এক একদিন কোনও সভায় বক্তৃতা দিতে দিতে তাঁর মনে হয় সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে, এই শহর, জনতা, এই পার্থিব আবেষ্টনী ছেড়ে তিনি বুঝি অনেক ঊর্ধ্বে অন্য এক লোকে চলে গেছেন। কখন তারা হাততালি দেয়, ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দেয়, পায়ের ধুলো নেয়, অটোগ্রাফ নেয়, গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেয় কিছুই টের পান না। রাতুল তাঁকে তাঁর দর্শন-জগতের আর এক স্তরে নিয়ে গেছে। ওরা নানা উপাধি দিয়েছে। সম্মান আর যশ আসছে অযাচিত ভাবে পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে। নিমন্ত্রণ আসে কত দূর-দূর দেশে যাবার। এই কটা বছরে কত দেশে গিয়ে কত লোক দেখে এলেন। ছেপে বেরুবার পর রাতারাতি তাঁর বই বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। চলে যায় জাপানে, সিঙ্গাপুরে, চীনে, কোরিয়ায়, মেক্সিকো, আর পেরুতে। কত অসংখ্য ভাষায় তার অনুবাদ। অর্থের আর যশের প্রাচুর্যে জীবন তাঁর সৌভাগ্যমণ্ডিত।

অন্ধকার রাত্রে চক্রের মাঝে প্রশ্ন করেন প্রফেসার—খোকা, তোমার অবর্তমানে আমি যে অচল হয়ে পড়েছি—আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল—

—না বাবা, তোমার যে অনেক কাজ রয়েছে এখনও, এখনও তোমার সময় হয়নি—

—কী নিয়ে বাঁচবো?

—তোমার অনেক কাজ যে বাবা, যে-সাধনা তুমি শুরু করেছ, তা যে শেষ করতে হবে তোমাকে। পৃথিবীর মানুষ নাস্তিক হয়ে উঠেছে—জড়বাদী হয়ে উঠেছে, তাদের ভুল তুমি শুধরে দেবে—

নিত্যানন্দ সেন ভাবেন খোকা এত কথা শিখলো কোথায়। হয়ত মৃত্যুর ওপারে আত্মার জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যার প্রসার ঘটে। কত অদ্ভুত এই পৃথিবী আর সৃষ্টির রহস্য। আলমারী থেকে মোটা একখানা বই টেনে নিয়ে পড়েন। ওখানা মেটারলিঙ্কের লেখা। আর একখানা বই বার করেন। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। যদিও স্বীকার করা যায় যে সমস্তর পেছনে মন ও বুদ্ধি আছে, তবে যার দেহ নেই তারও কি মন ও বুদ্ধি থাকতে হবে? কিন্তু তারও তো কোনও প্রমাণ কোথাও নেই। প্রফেসার হঠাৎ হতাশ হয়ে পড়লেন। আমাদের এই রক্ত-মাংসের শরীর যাদের—আমাদেরই অস্তিত্ব যে আছে তারই কি কোনও প্রমাণ আছে? মায়াবাদীদের মতে এই জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তাই বুঝি স্যার অলিভার লজ বলেছিলেন —আমাদের এই বেঁচে থাকা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে মৃত্যুর পরপারে

আমাদের ছায়া-শরীরের অস্তিত্বও সত্যি।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিত্যানন্দ সেন এমনি ভেবে-ভেবে শেষকালে এক অপরূপলোকে গিয়ে শান্তি পান। সেখানে কেবল তিনি আর তাঁর মৃতপুত্র রাতুল। তিনি রাতুলকে যেন চোখের সামনে দেখতে পান। তার সঙ্গে কথা বলেন। রাতুলের উষ্ণ-নিঃশ্বাস তিনি যেন নিজের শরীরে অনুভব করেন—এত ঘনিষ্ঠ, এত নিবিড় হয়ে রাতুল তাঁর কাছে থাকে।

সকালবেলা অল্প-অল্প বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারপর দুপুরবেলা রোদ উঠেছিল। জানলার পাশে বসে বই পড়তে-পড়তে নিত্যানন্দ সেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যে সাতটায় শহরের একটা বড় 'হলে' তাঁর বক্তৃতার কথা আছে আজ। সেই সব কথাই এতক্ষণ ভাবছিলেন। হঠাৎ গোবিন্দ ঘরে ঢুকলো—বাবু—বাবু—

চমকে উঠলেন নিত্যানন্দ। অতদিনের চাকর। এ-বাড়ীতে খোকার জন্মের আগে থেকে আছে। আজ কিন্তু তার চেহারা দেখে চেনা গেল না। গোবিন্দ হাঁপাচ্ছিল। যেন কোন কথা তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরুবে না।

শুধু বললে—বাবু, আমাদের খোকাবাবু—

—খোকাবাবু! কোন্ খোকাবাবু! কাদের খোকাবাবু রে?

—খোকাবাবুকে দেখলুম—আমাদের খোকাবাবু!—গোবিন্দর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছে। গোবিন্দর পৃথিবীতে কে আর আছে! খোকাকে কি ও-ও কম ভালবাসতো! খোকা চলে যাবার পর কতদিন কেঁদেছে ও! ছোটবেলা থেকে একরকম ওই-ই তো তাকে মানুষ করেছে!

গোবিন্দ আবার বললে—আমাদের খোকাকে দেখলুম—কালীঘাটে—

নিত্যানন্দ সেন প্রথমে তেমন গা করেন নি। গোবিন্দটা বরাবরই একটা সাদাসিধে ধরনের। খানিকটা বোকাসোকা। কী বলতে কী বলে ফেলে।

গোবিন্দ বললে—বাবু, খোকাবাবু আমার কথা মোটেই শুনলে না—কিছুতেই বাড়ী এল না—এত ডাকলুম, এত সাধলুম, পায়ে ধরলুম পর্যন্ত—

—কী বাজে কথা বলছিস গোবিন্দ? নিত্যানন্দ সেন বিরক্ত হলেন।

—কিন্তু বাবু, আমার যে দেখে পর্যন্ত মনটা কেমন করছে—ও আমাদের খোকাবাবু না হয়ে যায় না। মাথায় চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের পাতাটা পর্যন্ত যে চিনি আমি, কোলে পিঠে করে আমি খোকাকে মানুষ করেছি আর আমার ভুল হবে?

নিত্যানন্দ সেন এতক্ষণে ভালো করে মুখ তুললেন।

—কাকে দেখেছিস্ তুই—রাতুলকে? কোথায়?

—আজ্ঞে, কালীঘাটে!

—কালীঘাটে কেন যেতে গেলি তুই হঠাৎ, কালীঘাটে তোর কীসের দরকার পড়লো—যত সব জোচ্চোর বদমাইস লোকের আড্ডা ওখানে, বোকা মানুষ পেয়ে তোকে দেবে কোনদিন ঠকিয়ে।—

—কিন্তু খোকাবাবুকে যে নিজের কোলে মানুষ করেছি বাবু—তাকে চিনতে ভুল হবে আমার ?

নিত্যানন্দ সেন আবার নিজের কাজে মন দিলেন। বললেন—যা-যা —মাথা খারাপ হয়েছে তোর বুড়ো বয়সে—তোর সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় নেই আমার—কী দেখতে কী দেখেছিস, কী শুনতে কী শুনেছিস, তোর চোখ খারাপ হয়েছে গোবিন্দ, একটা চশমা কিনে দিতে হবে তোকে—

গোবিন্দ বসে পড়লো হঠাৎ মেঝের ওপর। নিত্যাগন্দর পায়ের কাছে। তার চোখ দু'টো ছলছল করছে। বললে—বাবু আপনি একবার চলুন আজ্ঞে, ও আমাদের খোকাবাবু না হয়ে যায় না—

—যাকে-তাকে অমন খোকাবাবু বলে ভুল করিসনে গোবিন্দ—এই নিয়ে কতবার হলো বলতো তোর—

—এবার আর ভুল নয় বাবু, গেরুয়া পরলে কী হবে, আমি ঠিক চিনেছি, ও আর কেউ নয়, আপনি নিজে একবার চলুন বাবু, আপনি গেলে খোকাবাবু না করতে পারবে না। আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বললে না বাবু—

—তোর মত পাগলের সঙ্গে কেউ কথা বলে ?

—না বাবু, গেরুয়া পরে একেবারে পুরোপুরি সাধু সেজেছে আজ্ঞে। চুপচাপ কালীঘাটের সামনে বড় চাতালটায় চোখ বুঁজে বসে আছে—কারুর সঙ্গে কথা নেই। সামনে দিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালুম—খোকাবাবু না ? বলতেই চোখ দু'টো খুললো, তারপর আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে আবার চোখ বুঁজলো, কিন্তু আমি ছাড়বো কেন—পায়ের কাছে বসে পড়লুম—আবার ডাকলুম, খোকাবাবু। তখন আবার চোখ চাইলে। এবার আর সন্দেহ রইল না বাবু—হাত দু'টো চেপে ধরলাম—আর কি ছাড়ি ? তখন আমার ব্যাপার দেখে চারি দিকে বেশ লোক জমে গেছে। আমি বললাম, এ আমাদের খোকা-বাবু। খোকাবাবু হঠাৎ আমার হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে এমন কটমট করে চাইলে আমার দিকে, যে কি বলবো বাবু। তখন আমি বললুম খোকাবাবু, কেন তুমি কাঁদাচ্ছ! …শুনে খোকাবাবু মুখ ঘুরিয়ে নিলে— —আর আমার দিকে একবারও চাইলে না। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। আমি হাউ-হাউ করে সেইখানে বসেই কেঁদে ফেললুম—

—তারপর ?

—তারপর সেখান থেকে দৌড়ে আসছি। আপনি একবার চলুন বাবু।

নিত্যানন্দ সেন বললেন—তোর মাথা খারাপ হয়েছে গোবিন্দ, মাথা খারাপ হয়েছে। যা বললি আর কখনও বলিসনে কাউকে, পাগল ভাববে—

মনে-মনে হাসলেন নিত্যানন্দ সেন। তা হলে রোজ তাঁর মৃত আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা, এই বক্তৃতা, পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাতদের অভিনন্দন, তারপর তাঁর এই বই লেখা, এই খ্যাতি, এই উপাধিগুলো, তাঁর বিদ্যে-বুদ্ধি—সবার ওপর স্যার অলিভার লজ্, কোনান ডয়েল, ওরা সবাই মিথ্যাবাদী! তাঁর অর্থ প্রতিপত্তি, কিছুই কিছু নয়! পাগল আর কাকে বলে! অশিক্ষিত পাগল একটা গোবিন্দ!

আবার নিজের কাজ করতেই ব্যস্ত ছিলেন নিত্যানন্দ সেন।

বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। ক্ষিতীনবাবু এসেছেন।

—ওপরে নিয়ে এসো। নিত্যানন্দ সেন বললেন।

ক্ষিতীনবাবুও প্রফেসার। লজিকের। তিনি হঠাৎ এ-সময় কেন এলেন?

—কি মনে করে ভাই?

—তোমার রাতুলকে দেখলাম—

ক্ষিতীনবাবুও যেন অবাক হয়েছেন। ক্ষিতীনবাবুর মুখে-চোখে এক অস্বাভাবিক উদ্বেগ, আতঙ্কের চিহ্ন। তিনি যেন দৌড়ুতে-দৌড়ুতে এসেছেন এতখানি রাস্তা—সারা শরীর তাঁর অসহায়-রোমাঞ্চে কাঁপছে।

নিত্যানন্দ সেন জিজ্ঞেস করলেন—কাকে দেখলে? রাতুলকে?

—হ্যাঁ, কালীঘাটের মন্দিরে, গেরুয়া-পরা চেহারা, দেখেই চিনলাম—মন্দিরের দিকে রোজ সন্ধ্যেবেলা যাই জানো তো! হঠাৎ রাতুলের চেহারাটা দেখে চোখ দু'টোকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। এ কেমন করে হলো, নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করলাম।

—বলো কি—সত্যি?

নিত্যানন্দ সেনের মুখখানা যেন হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো।

সকাল বারোটার সময় জাহাজ এসে থামলো খিদিরপুরের ডকে। মহাসমুদ্র পার হয়ে এসে ঢুকলো বন্দরে। এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। মহারাজ আজ সকাল-সকাল রান্নাবান্না সেরে ফেলেছে! এতগুলো লোকের রান্না। কেউ ভাত, কেউ রুটি, কেউ ডাল, কেউ কারি, কেউ রোস্ট্!

মহারাজ বলেছে—আজকে মাংস-য় দিয়েছি ক'ষে ঝাল—দেখি তোর গুদামবাবু কত টাকা ফাইন্ করে—

ভোম্বল মাংস চাখ্তে চাখ্তে বললে—কিন্তু দারুণ হয়েছে মহারাজ—অনেকদিন খাইনি এমন মাংস—

—আর একটু নিবি ভোম্বল ? বিড়িটা ঠোঁটে চেপে, হাতায় করে দিলে আর একটু মাংস।

—আহা বেশ হয়েছে খেতে সত্যি—

মহারাজ বললে—গেল মাসে ওই গুদামবাবুর রিপোর্টে আমার আট আনা ফাইন হয়েছে—এবার দেখি কতটাকা ফাইন করে—ব'লে মাংসের লম্বা খুন্তিটা দিয়ে খটাখট শব্দ করতে লাগলো।

—কিন্তু সেদিন দেখলুম—

মহারাজ বললে—কিন্তু সেদিন দেখলুম তুই গুদামবাবুর সঙ্গে মেসিনঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে গল্প করছিস তোর দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে বুঝি ভারি খোসামোদ—ওকে তুই চিনলিনে ভোম্বল···আমি ওর চাকরি খাবো তবে ছাড়বো। এই আমি পৈতে ছুঁয়ে বলছি তোকে, দেখে নিস্—

মাংসের হাড়িটা নামিয়ে, ডালটা চাপিয়ে দিলে মহারাজ। তারপর ফস্ ক'রে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলতে লাগলো—আমি আজ নতুন রাঁধুনি নই, ডানকান্ সাহেব যখন ক্যাপ্টেন ছিল, তখন একদিন কী খেয়াল হলো বুঝলি ভাই—ফাউল কারিটা রাঁধলুম বেশ জুত করে—শীতকাল সেটা, বড়দিনের বাজার, নতুন বছরের পয়লা—ওদিকে ঝমঝম করে বিষ্টি পড়ছে, সন্ধ্যে সাতটার সময় রান্না শেষ করেছি, আটটার সময় খেতে বসেছে সাহেব—খেয়ে এমন তারিফ করলে, ফলাহারীকে জিগ্যেস করিস—বৈজুও জানে, ডানকান্ সাহেব ভাই এমন তারিফ করলে—সঙ্গে-সঙ্গে আমার পঁচিশ টাকা মাইনেই বাড়িয়ে দিলে—যে-সব ছিল মানুষ—সে কালও নেই—সে-মানুষও নেই—

কুটন্ত ডালের কড়ায় গোটা পঞ্চাশেক পাকা শুকনো লঙ্কা পটাপট ফেলে দিয়ে মহারাজ বললে—আরে গুদামবাবু বলে ওঁরা নাকি খাটুলির জমিদার বংশের লোক—তাই যদি হবে, তবে এটুকু ঝাল খেয়ে কিনা পেট ছেড়ে দেয়, তা'হলে কিসের তুই জমিদার-বাচ্চা, কী বল্ ভোম্বল—

তারপর একটু থেমে মহারাজ আবার বলতে থাকে—এক-একবার ভাবি যে কিছু বলবো না—যা বলছে বলুক গে—পাগলে কী-ই না বলে···কিন্তু বলে কিনা আমি নাকি বর্মার রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম—ও-ই নাকি সাহেবকে বলে আমাকে এখানে চাকরি করে দিয়েছে—আরে আমাদের হলো তিন পুরুষের রান্নার ব্যবসা—ঠাকুর্দা ছিল লাট্ সাহেবের হেড-কুক—তারপর বাপ ছিল 'ওকামারু' জাহাজের হেড বাবুর্চি—তিরিশ বছর চাকরী করে পেন্সন্ নিয়ে···

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। বজ্রপাত ঠিক নয়, গুদামবাবু ঘরে ঢুকলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজের মুখখানা ভয়ে-ভক্তিতে একেবারে বিগলিত হয়ে উঠলো। দু'টো-হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—আসুন, কিছু বলবেন আমাকে স্যার—?

গুদামবাবু গম্ভীর গলায় বললে—বারোটার আগে খানা চাই আমার—দেরি করলে চলবে না—জাহাজ খিদিরপুরে পৌঁছবার পর আমি আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত পাবো না—

—যে আজ্ঞে হুজুর—যে-আজ্ঞে—

এক মিনিট আগেকার মহারাজ যেন এ নয়। গুদামবাবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে যেন এক ভেল্কি খেলা হয়ে গেল।

—তা'হলে মনে থাকে যেন ওই কথা—

—যে-আজ্ঞে হুজুর—যে-আজ্ঞে—

—ঝকমারি হয়েছে গুদামের কাজ করা—বলতে-বলতে গুদামবাবু যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গুদামবাবু বেরিয়ে যেতেই মহারাজ উঁকি মেরে একবার বাইরেটা ভাল করে দেখে নিলে। তারপর আরো গোটাকতক লঙ্কা পটাপট ডালের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বললে—দেখলি তো ভোম্বল, দেখলি তো তুই—তেজটা দেখলি তো—দেখে নিস আমি ও-তেজ ভাঙবো ওর—আমি যেন গরু-ছাগলের সামিল রে—এক এক সময় যখন খুব রাগ হয়, ভাবি, যদি সত্যযুগ হতো এই পৈতে ছুঁয়ে এমন শাপ দিতাম যে সঙ্গে-সঙ্গে গুদামবাবু ভস্ম হয়ে যেত, আর আমি সেই ছাই নিয়ে দিতাম উনুনের ভেতর ফেলে—

জাহাজ থেকে নেমে ভোম্বল চার পয়সার চিনে বাদাম কিনলে। বললে—খা-খারে—

ডকের বাইরে এসে ভোম্বল বললে—এ ক'দিন তোর খুব কষ্ট হলো—কিছু মনে করিস নে, রাগ করে কখন কী বলেছি—জানিস তো কখনও মায়ের ভালব-সা পাইনি, লাটুগুণ্ডার কাছে থাকলে এদ্দিন কেবল গুণ্ডামিই শিখতুম—কিন্তু সে থাকগে—যদি কখনও আমার কথা মনে পড়ে ভাবিস আমি একটা ভবঘুরে পাগল, আমার কোনও মতির ঠিক নেই। যদি কোনও দিন বড় হতে পারি, হয়ত খবরের কাগজে আমার নাম দেখবি—আমার ম্যাজিক দেখবার জন্যে হয়ত হাজার-হাজার লোক ভিড় করবে···সেদিন যদি কখনও আসে তখন আমার সঙ্গে দেখা করিস, তার আগে নয় ভাই—

হাঁটতে-হাঁটতে দু'জনে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়েছে। অসংখ্য বাস, ট্রাম, রিক্সা, মানুষের স্রোত। রাতুল ভালো করে চেয়ে দেখতে লাগলো। কত

বছর পরে আবার কলকাতায় এল। আগে ট্রামে-বাসে রাস্তায় তো এত মানুষ ছিল না। খিদিরপুরে সে আগেও দু'একবার এসেছে। এ-সব চেনা জায়গা। মনে হলো—এত দেশ, এত মানুষ সে দেখে এল ,এত জায়গা ঘুরে এল, কিন্তু কোথাও এত ভালো লাগেনি তার। এরা সবাই, এই রাস্তা, বাড়ী, বালি সব যেন তার প্রিয়। এরা তার দেশের মানুষ। কাছের মানুষ। ধূলো, বিকেল হয়েছে, অফিসের ছুটির পর বাসে ট্রামে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। ছুটি হয়েছে ডকের কুলিদের। কয়লা মাখা, ময়লা পোশাক পরা পুরুষ আর মেয়ে কুলি। দু'পাশের ফুটপাথ দিয়ে সারি-সারি চলেছে নিজের-নিজের আস্তানার দিকে। যা কিছু দেখছে রাতুল সমস্ত ভালো লাগে, ভালো লাগে পায়ের তলায় দেশের মাটির ছোঁয়া। ভালো লাগে গঙ্গার হাওয়া আর এই মানুষগুলোকে।

ভোম্বল বললে—কী ভাবছিস বল্‌তো—

—কিছু তো ভাবছি না—রাতুল বললে।

তারপর হঠাৎ কোমল হয়ে এল ভোম্বলের গলার সুর। বললে—হ্যাঁরে, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না? ব'লে নিজেই ভোম্বল হো-হো করে হেসে উঠলো।

রাতুল জিগ্যেস করলে—হাসলি যে—

—না, থাক্—সে তুই বুঝবি নে—তুই তা'হলে যা এখন, বাড়ী যা—বাসে ওঠ্

ভোম্বল রাতুলের পিঠে হাত দিয়ে বিদায় দেবার ভঙ্গী করলে।

—তুই ও চল্ না আমার সঙ্গে—রাতুল বললে।

—আমি? আমাকে নিয়ে যাবি তোদের বাড়ী—?

—বাবা তোকে দেখলে খুব খুশী হবেন—

—বাড়ীতে তোর আর কে আছে? মা নেই?

—না, মাকে আমি দেখিনি—

—তোরও মা নেই—তবে তোরা তো খুব বড়লোক, না?

—তা' জানি না—

—তোকে দেখে মনে হয় খুব বড়লোক তোরা, তুই ঠিক আমাদের দুঃখ বুঝবিনে—আমি যাবো না তোদের বাড়ী, যদি কোনদিন নিজে বড়লোক হতে পারি তবেই তোর সঙ্গে মিশবো তখন—

রাতুল হাসলো। বললে, বড়লোকেরা কি খুব খারাপ?

—বড়লোকেরা গরীবদের বড় ছোট মনে করে—তুই যখন বড় হবি বুঝবি···বড়লোকেরা মনে করে যাদের টাকা নেই, তাদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মন,

কিছুই নেই বুঝি—

—তুই এত কত কথা কী করে জানলি ভোম্বল ?

—কত লোকের কাছে কত রকম কাজ করেছি, কত লোকের বাড়ীতে বাসন মেজেছি, রান্না করেছি, ঘর ঝাঁট দিয়েছি, সব কথা তোর শুনে দরকার নেই, শুনলে বুঝতেও পারবি না হয়ত—আমাদের দুঃখ কেবল আমরাই বুঝি আর ভগবান থাকলে ভগবানও বোঝে—

...আমার বুঝে দরকার নেই ও-সব...তুই চল্ আমাদের বাড়ী।

—বলে ট্রামে উঠে পড়লো দু'জনে।

খানিকক্ষণ পরে ভোম্বল বললে—তোকে দেখে বাড়ীতে সবাই অবাক হয়ে যাবে, না ? ..

...অবাক হবার আছে আর কে ? বাবা তো এখন বাড়ী নেই...থাকবার মধ্যে আছে কেবল গোবিন্দ...বহুদিনের চাকর আমাদের...

বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যাওয়া। ছাদের রড ধরে টলা। কণ্ডাক্টার এসে চারিদিকের লোকের কাছ থেকে টিকিট চাইছে। কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে, দেখা যায় না। বাড়ীতে যখন পৌঁছুবে রাতুল, গোবিন্দ তখন হয়ত উনুনে আগুন দিয়েছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিতে আসবে। ভাববে হয়ত বাবু এসেছে। কিন্তু যখন দেখবে খোকাবাবুকে, খুবই অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করবে না হয়ত। যাকে মারা গেছে বলে জানে, তার আবির্ভাব হঠাৎ চমকে দেওয়ারই কথা। তারপর চা করে আনবে। কাঁদবে হয়ত কিছুক্ষণ। আনন্দের কান্নাই সেটা। কিন্তু গোবিন্দ যদি বাড়ীতে না থাকে কিম্বা যদি সে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে বহুদিন আগে! যুদ্ধের মধ্যে কত কিছু বদলে গেছে। কিছুই বিচিত্র নয়। হয়ত অন্য একটা চাকর এসেছে তাদের বাড়ীতে। নতুন মুখ। সে চিনতে পারবে না রাতুলকে। বলবে...কে আপনি, কাকে চান...হয়ত ভেতরে ঢুকতে দিতে চাইবে না প্রথমে। রাতুল ..বাবুর ছেলে তো যুদ্ধে মারা গেছে বহুদিন হলো! জোচ্চুরি করবার জায়গা পাওনি! বাবু বাড়ীতে নেই। ও-সব চলবে না। বাবু আসুক—তিনি এলে যা হয় করবেন। অচেনা কাউকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই। আর নেহাতই যদি বসতে হয়, তো বাইরের ঘরে বসো না। বাবু যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ। তিনি না বললে বাড়ীর ভেতরে কী করে ঢুকতে দেবো ?

—সর্বনাশ! ভোম্বল আঁতকে উঠেছে হঠাৎ।

—কী হলো ? রাতুল জিগ্যেস করলে।

—আমার মানিব্যাগ ?

নিজের সব ক'টা পকেট হাতড়াতে লাগলো ভোম্বল। কোথাও নেই।

গেল কোথায়। এই তো সবে মাত্র দু'মাসের মাইনে নিয়ে বেরিয়েছিল। প্রায় শ' দেড়েক টাকা রয়েছে তাতে। গেল নাকি 'পকেটমার' হয়ে। ভাগ্যিস কিছু খুচরো পয়সা ছিল আলাদা। কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইলে।

রাতুল বললে—আমার কাছে তো একটা কানাকড়িও নেই····

ভোম্বল বললে···তোদের বাড়ী যাওয়া হলো না রে···

—কেন ?

—আমার মানিব্যাগের খোঁজে যেতে হবে মেছোবাজারে···

—সে কি আর পাওয়া যাবে···? রাতুল হতাশার ভঙ্গী করলে।

—নিশ্চয় পাওয়া যাবে—যাবে কোথায় আর—আড্ডায় গেলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

—কোন্ আড্ডায় ? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—লাটু গুণ্ডার আখড়ায়—মেছোবাজারে—সব চোরাই মাল তো আগে আখড়ায় জমা হবে···যা থাকে কপালে, চল্—বেশী দেরি হলে হয়ত মাল ভাগ হয়ে যেতে পারে—

রাতুল বললে—আমিও যাবো ?

—চল্ না, বেশী দেরি হবে না, যাবো আর আসবো—

—কিন্তু এতদিন পরে লাটু গুণ্ডা যদি দেখতে পায় তোকে—যদি ধরে আটকে রাখে, আর আসতে না দেয় ?

ভোম্বল সাহসে ভর করে বুক চিতিয়ে বললে—দেখাই যাক না, দেড়শো টাকা একেবারে উবে যাবে—আমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা যে রে—

পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে ট্যাক্সি। আশু মুখার্জি রোড ধরে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে ট্যাক্সি গিয়ে পড়লো হাজরা রোডের মোড়ে। তারপর ডান দিক দিয়ে চললো সোজা হাজরা রোড ধরে। ট্যাক্সি ছুটছে আর চারটে চাকা থর থর করে কাঁপতে-কাঁপতে ঘুরছে। গোবিন্দ বসেছে ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সীট-এ বসেছে নিত্যানন্দ সেন আর ক্ষিতীনবাবু।

সন্ধ্যে সাতটায় শহরের একটা 'হল'-এ সভা আছে তাঁর। একবার হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন। এখনও কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুচ্ছে না কারো। একটা অভ্রভেদী আতঙ্ক আর আনন্দ মেশানো কৌতূহল ছুটন্ত মোটরের ভেতরকার আবহাওয়ায় থমথম করছে।

কালাঘাট রোডের মোড়ে এসে ট্যাক্সিটা বাঁ-দিকে ঘুরল। এবার সোজা

রাস্তা। তারপরেই কালীর মন্দির বাঁ-দিকে। আর পাঁচ মিনিট পরেই দেখতে পাওয়া যাবে খোকাবাবুকে। ছোটবেলায় যখন হয়েছিল, গোবিন্দই কোলে করে মানুষ করে একরকম। গিন্নিমা সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। এক হাতে রান্না, এক হাতে বাজার করা আর এক হাতেই ছেলে মানুষ করা। সব কাজ এই গোবিন্দই করে এসেছে। ছোটবেলায় কী দুষ্টুই ছিল খোকাবাবু। দুপুরবেলা সদর দরজার পাশে ঘুমোচ্ছে গোবিন্দ। গরমের দুপুর। বাবু কলেজে চলে গেছেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেনের ছোট সরু গলিটা দিয়ে আইসক্রীমওয়ালা আসতো। খোকাবাবু আস্তে-আস্তে টিপি-টিপি পায়ে নামতো রাস্তায় যাবার জন্যে। হঠাৎ যেন গোবিন্দর ঘুম ভেঙে গেছে—

—কে—কে—

খোকাবাবু গোবিন্দকে দেখেই পালিয়ে গেছে ওপরে। যত সব ছাইভস্ম—ওই সব খেয়েই তো পেটের ব্যামো হয়। বাবুকে কতদিন বলেছে গোবিন্দ, খোকাবাবুর হাতে পয়সা না দিতে।

—কেন ওইটুকু ছেলের হাতে পয়সা দেন বাবু? ফিরিওয়ালারা যত নষ্টের গোড়া—এত বাড়া আছে পাড়ায়, কিন্তু ঠিক এই বাড়ীর সামনে এসেই হাঁকবে: চাই চিনেবাদাম, চাই ডালপুরি—ঘুগনিদানা—নকুলদানা—জলকচুরি—ওদের মরণ হয় না গা!

ছোটবেলায় পড়তেই কি বসতো খোকাবাবু! ওই বাবুর ভয় দেখিয়ে পাড়া থেকে তাকে খুঁজে নিয়ে আসা। ওদিকে মাষ্টারবাবু বসে আছে তো বসেই আছে। গিন্নিমা মরার আগে কিছুই বলে যেতে পারেন নি। শেষের দিকে কতদিন তো কথাই বন্ধ ছিল। তা সগ্যে গিয়ে তো দেখছেন তিনি। তার হাতেই একরকম তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কতদিন আর নজরে-নজরে রাখা যায়। বড় হলে ছেলেরা কি আর বাবার কথাই শোনে! বাবু তো জানতে পারে নি। তারপর প্রথম ক'দিন কী কষ্টেই না কেটেছে। গলা দিয়ে ভাত নামতো না বাবুর। ভাতের থালার সামনে বসে চুপ করে কী সব মাথা-মুণ্ডু ভাবছেন। ভাত তেমনি পড়ে আছে। পাশের বাড়ীর বেড়ালটা এসে মাছটা টপ করে তুলে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে গোবিন্দ খেতে দিয়ে নিজে রান্না-ঘরের হুড়কোটা টেনে দিয়ে সামনে বসে খাওয়াতো।

—ওটা শুক্তো···তেতো···আর ওই বড় বাটিতে ডাল···আর ওটা পটল ভাজা···

—গিন্নিমা চলে যাবার পর থেকে আপনার আর খাওয়ার জুত হচ্ছে না···সেদিন ক্ষিতীনবাবুর মা'র কাছে গিয়ে তাই ওই শুক্তো রান্না শিখে এসেছি।

—কাল কড়ায়ের ডাল কিনে এনেছি, বড়ি দেব ভাবছি, বড়ি ভাজা

খেতে আপনি ভালবাসতেন···একা ডাল বাছা, ভিজোন, বাটা, তারপর বড়ি দেওয়া···শুধু কি তাই, সব কাজ ফেলে রেখে রোদ্দুরে বড়ি পাহারা দেওয়া—নইলে কাকের জ্বালায় কিছু কি থাকবে···

বাবু বলতেন···এত রান্না করিস্ কার জন্যে গোবিন্দ···মিছিমিছি খাটুনি—আমাকে দু'টো ভাত আর আলুভাতে শুধু দিবি···

জামা কাপড় একে-একে ছিঁড়ে যায়। আর নতুন করানো হয় না। এক দিন দোকান থেকে দর্জি ডেকে নিয়ে এসেছে গোবিন্দ।

বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—বেশ ভালো করে মাপ নাও বাপু···সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে···খারাপ হলে কি অপছন্দ হলে দাম কাটা যাবে, বলে রাখছি—

বাবু কলেজ যাওয়া বন্ধ করলেন শেষে। কোথাও বেরলেন না। সারা দিন-রাত ওই ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকেন। দরজা ঠেলে ডেকে-ডেকে খাওয়াতে হয়। দুপুরে আধঘণ্টা আর রাত্রে আধঘণ্টা শুধু খাওয়ার সময় দেখা হতো বাবুর সঙ্গে; টেবিলের ওপর বসে খেতে-খেতে বই পড়তেন। কী খাচ্ছেন, সেদিকে মাথা ঘামাতেন না। আর বসে-বসে চিঠি লিখতেন গাদা গাদা—সেই চিঠির গাদা গোবিন্দ ফেলে দিয়ে আসতো ডাক বাক্সে। কলেজ গেল, বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়া গেল—ওই সারা দিন কেবল ঘরের মধ্যে বসে কী যেন করতেন ভগবান জানে। চেহারা শুকিয়ে এই দড়ির মত হয়ে গেল। এমনি চললো বছর কয়েক। অতবড় যুদ্ধ গেল, বোমা পড়লো কলকাতায়, দুর্ভিক্ষ হলো, কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেল, জন-মনিষ্যি নেই পাড়ায়, ব্ল্যাক-আউট হলো—কোনও দিকে খেয়াল নেই, দুপুর আর রাত্তির বেলা বাবুকে খাইয়ে বেরিয়ে আসতো গোবিন্দ। তারপর কোনও কাজ নেই। ওই দরজার পাশটিতে শুয়ে আকাশ-পাতাল এলোপাতাড়ি ভাবতো। আর সময় কাটতে চাইতো না। দু'টি মাত্র প্রাণী—তার জন্যে সংসারে আর কতটুকুই বা কাজ।

এমনি করে কত বছর কাটাবার পর, ঘর থেকে একদিন বেরুলেন তিনি। কিন্তু কলেজে আর গেলেন না। বললেন—চাকরি আর করবো না রে গোবিন্দ—আর কার জন্যেই বা করবো—একটা লোকের কোনও রকমে চলে যাবে যা'হোক করে—

ঘর থেকে আবার বেরুতে লাগলেন, বন্ধুবান্ধব আসতে লাগলো আবার বাড়ীতে। এখানে মিটিং হয়—ওখানে মিটিং হয়, দু'চার দিনের জন্যে মিটিং করতে যান কত দূর-দূর দেশে। পশ্চিমে যান, প্রয়াগে যান—আর গোবিন্দ থাকে সঙ্গে-সঙ্গে। কত বড়-বড় লোকজন আসে মোটর গাড়ী নিয়ে দেখা

করতে। ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। খোকাবাবুর মানুষ সমান ছবিটা ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছেন। তারপর বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘর অন্ধকার করে, দরজা বন্ধ করে কী সব করেন কয়েকঘণ্টার জন্যে—গোবিন্দ কিছু বুঝতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না।

—নেবে পড় গোবিন্দ—নেবে পড়—এসে গেছি—

ক্ষিতীনবাবুর ডাকে গোবিন্দর জ্ঞান ফিরে এল। কালীর মন্দিরের সামনে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেছে। বাবু নেমে চলতে শুরু করেছেন···ক্ষিতীনবাবুর পেছন-পেছন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার তাঁরা ফিরবেন ওই ট্যাক্সিতেই। পাথরের টালি বসান রাস্তা পেরিয়েই মন্দিরের উঠোন। ভিখারীর পাল জুটেছে পেছনে-পেছনে।

—একটা পয়সা দিন—একটা ডবল পয়সা দিন বাবু—

তিরিশ-চল্লিশটা ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি কাতর গলার ভিক্ষে চায়—

গোবিন্দ বলে···তোরা যা' দিকিনি বাপু, জ্বালাসনে·· আমরা তীর্থ করতে আসিনি···আ মলো, তবু পেছন-পেছন আসে···কানে কথা ঢুকছে না বুঝি ··

ক্ষিতীনবাবু রাস্তা দেখিয়ে-দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ মন্দিরে ভিড় একটু বেশী। তীর্থযাত্রীদের মেলা। মা'র মন্দিরের ওদিকটা লোকে লোকারণ্য। ডালার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার উপায় নেই। টানাটানি করে। তীর্থ-যাত্রী নয় দেখে চিনতে পারো না···এ কেমন পাণ্ডা মানুষ গো তোমরা! আমরা এসেছি কাজে···ছাড়ো···পথ ছাড়ো। আমরা বলে নিজেদের জ্বালায় মরছি! খোকাবাবুকে পাই, যুৎ করে বাগিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, ঘর করুক, সুমতি হোক···মানত করাই আছে, ষোড়শোপচারে পূজো দেব।' শুধু ডালা নয়। মায়ের দরজা ভোরবেলা খোলবার সময় যে-পেসাদ দেওয়া হয়··· সেই ভোগ···তারপর আরও হবে অন্নভোগ। আমাদের বাক্সর মত বাক্স পাবে না তোমরা।

মা'র মন্দিরের দক্ষিণে বড় হলটায় মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর···

ক্ষিতীনবাবু দেখালেন···ওই দেখ···

নিত্যানন্দ সেন দেখলেন···

গোবিন্দ আগেও দেখেছিল···এবার আরও মনোযোগ দিয়ে চুপ করে দেখতে লাগলো···

সুদূর নক্ষত্রালোকের কোন্ অবাঙ্মানসগোচর রহস্য অনাদিকাল থেকে মানুষের কৌতূহলকে উত্তেজিত করে আসছে—কত মহাপুরুষ সে-রহস্যের যবনিকা ভেদ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় জীবনপাত করে গেছেন, মানুষের ইতি-

হাসে তার সাক্ষ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। তবু বর্তমান থেকে শুরু করে দূর ভবিষ্যতের অজ্ঞাত মানুষ যুগে-যুগে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় প্রাণপণ পরিশ্রম করবে। এই-ই নাকি মানুষের মর্মান্তিক ললাট-লিখন। বিশ্ব-নিয়ন্তার এই সৃষ্টির তিলার্ধ পরিমাণ সত্য কেউ আবিষ্কার করতে সমর্থ হবে না জেনেও —সাধনার বিরাম ঘটবে না। প্রাণপাত বন্ধ থাকবে না। এই কি তাঁর জীবনের পরিণাম! রাতুলের মৃত্যু দিয়ে যে-সত্য আবিষ্কারের গর্বে আত্মশ্লাঘার আর অন্ত ছিল না তাঁর, সেই রাতুল পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাঁকে পরিহাস করতে এসেছে! তাঁর সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ করতে এসেছে! ছি—ছি—

গোবিন্দর ভেতরে-ভেতরে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হচ্ছিল। আর নিজেকে সে চেপে রাখতে পারলে না। দড়াম করে খোকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললে—খোকাবাবু আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? আমি তোমার গোবিন্দ যে—

কান্নায়, আনন্দে, উত্তেজনায় গোবিন্দর মুখ দিয়ে অর্ধেক কথা বেরুল না।

ক্ষিতীনবাবু বললেন—দেখ নিত্যানন্দ, মাথার চুলগুলো শুধু কামানো, নইলে হুবহু এক—আমার তো মনে হচ্ছে।

আরো কয়েক দল যাত্রী জড়ো হলো চারদিকে! বললে—কী হয়েছে মশাই?

একজন একটু বেশী কৌতূহলী। এগিয়ে একেবারে গোবিন্দর কাছে চলে গেল—হ্যাঁ গা, কী হয়েছে গা?

গোবিন্দ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো—ওগো ইনি আমাদের খোকাবাবু পালিয়ে এসেছে বাড়ী থেকে—সাধু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তোমরা পাঁচজনে বুঝিয়ে বলো না এঁকে—ওগো খোকাবাবু, বাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখ—চোখ ফেরাও—তোমার জন্যে ভেবে উনি যে আধখানা হয়ে গেছেন—শুনছো, ও খোকাবাবু—শুনছো—

ক্রমে আরও লোক জড়ো হলো। বললে—কী হয়েছে মশাই ?

—কার ছেলে?

—পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?

কে কার কথার উত্তর দেবে। ক্ষিতীনবাবু আর একবার চেয়ে দেখলেন নিত্যানন্দের দিকে। নিত্যানন্দ সেন প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে সমস্ত দেখছেন। অথচ কিছু যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সমস্ত সাধনা, সমস্ত সুখ্যাতি, বিদ্যা, বুদ্ধি সমস্ত আজ একদিকে—আর একদিকে এই পুনর্জন্মপ্রাপ্ত রাতুল। হঠাৎ নিজের শরীরটা যেন নিজের কাছেই বড় ভারী মনে হলো।

চারিদিকের ভিড় আর কৌতূহলাক্রান্ত জনতার প্রশ্নবান তখন অসহ্য হয়ে

উঠেছে। ক্ষিতীনবাবু বললেন—গোবিন্দ, একদিকে তুই ধর আর একদিকে আমি ধরছি—ও যখন কথা বলবে না—তখন ওকে গাড়ী করে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে নিরিবিলিতে সব জিজ্ঞেস করা যাবে—তুমি কী বলো নিত্যানন্দ?

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে বুঝি এসব মর্ত্যের কোলাহলের বহু উর্ধ্বে।

হঠাৎ বললে—কে তোমরা? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গোবিন্দ বললে—দেখলেন বাবু, আমাদের খোকাবাবুকে কেউ নিশ্চয় মন্তর করেছে—নইলে অমন সোনার চাঁদ আমাদের ফতেপুরের অষ্টবেহারীর ছেলে কামেখ্যায় গিয়ে এমনি বোবা-কালা হয়ে গিয়েছিল—এ মন্তর, আর কিছু নয়—

দু'জনে, দু'পাশে ধরে যখন রাতুলকে গাড়ীতে তোলা হলো, একজন লালপাগড়ী পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—কেয়া হুয়া ?

গোবিন্দ বললে—আমাদের ছেলে হুজুর—বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছিল—

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। সবাই ওঠবার পর ট্যাক্সি আবার ছাড়লো।

গোবিন্দ বললে—এবার চলো ভবানীপুর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন—

মেছুয়াবাজারের মোড়ে বাস থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকতে হয়। ভোম্বল আগে-আগে চলেছে, পেছনে রাতুল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বালক দত্ত লেন-এর মুখে এসে ভোম্বল বললে—তুই এখানে দাঁড়া—আমি চুপি-চুপি দেখে আসি লাটুগুণ্ডা আড্ডায় আছে কিনা—আমি না আসা পর্যন্ত চলে যাসনি, বুঝলি—

রাতুল সেইখানে একটা মনোহারী দোকানের সামনের রোয়াকে বসলো। পাশে এক ভদ্রলোক বসে-বসে "আনন্দবাজার পত্রিকা" পড়ছিল। রাতুল একখানা কাগজ নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলে। হঠাৎ নজর পড়লো ছোট একটা খবরের ওপর। ছোট খবরই বটে—

"সভা-সমিতি"র কলমে লেখা রয়েছে—"আজ সন্ধে সাড়ে সাত ঘটিকায় ডক্টর নিত্যানন্দ সেন "ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট" হলে "পরলোকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।"

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। এখনও অনেক দেরী! রাতুল সেই জনমুখর গলির রোয়াকে বসেই সন্ধ্যার অন্ধকারে অধীর হয়ে উঠল। ভোম্বল এখনও আসছে

না। এতক্ষণে কখন সে পৌঁছে যেত শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ। কতদিনের পর আবার নতুন করে পাওয়া। শুধু পাওয়া নয়, ফিরে পাওয়া। প্রথমটা আর শেষটা যেন জীবন, আর মাঝখানটা যেন দুঃস্বপ্ন। ওই দুঃস্বপ্নের পর প্রথম ভোর হওয়া। প্রথম আবিষ্কার, প্রথম আবির্ভাব, প্রথম অভ্যুদয়! একটা চিঠি পর্যন্ত সে বাবাকে দেয়নি—অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে অবাক করে দেবে তার বাবাকে, এই ছিল মতলব। হঠাৎ ভোম্বল এল। হাসি-হাসি মুখ। বললে—পেয়ে গেছি মানিব্যাগ—এই ছাখ—

ভোম্বলের নাম লেখা ব্যাগটা—অনেকগুলো টাকা। চিনতে পারলে রাতুল। ভোম্বল বললে—আর মিনিট পাঁচেক দেরি হলে আর পাওয়া যেত না রে—একেবারে পাকিস্তানে চলে যেত—নে চিনেবাদাম খা—

পকেট থেকে কয়েকটা দানা চিনেবাদাম বের করে দিলে রাতুলকে। ভোম্বল বললে—পাকিস্তানে চলে গেলে আর পাওয়া যেত না ভাই—বরাতটা ভালো ছিল তাই······

—পাকিস্তানে কেন? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—লাটুগুণ্ডা যে পাকিস্তানে হেড-অফিস করেছে এখন। ওখান থেকে এখানে চোরা-কারবার চালাচ্ছে, লতিফ বললে—লাটুগুণ্ডার এখন রমারম অবস্থা···গাড়ী কিনেছে, বাড়ী করেছে লাহোরে···আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসাটা-তেই এখন বেশি লাভ ··লতিফের সঙ্গে দেখা হলো···সে-ই সব বললে···

—লতিফ কে? রাতুল জিজ্ঞাসা করলে।

···আরে লতিফই যে এখন কলকাতার আপিসের কর্তা হয়েছে···অথচ আমি যখন দলে ছিলাম, আমার কাছেই লতিফের হাতেখড়ি। তখন ছিল ও আমার চ্যালা। এখন লাটুগুণ্ডার নেক্‌-নজরে পড়ে গিয়ে বিলকুল কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে···চুলে টেড়ি, হাতে রিস্টওয়াচ, চার আঙুলে সোনার আংটি···আমাকে অনেক করে বললে···দলে ফিরে আয় ··পাকিস্তানে-হিন্দুস্থানে চোরাকারবার চলাতে পারলে চারশো টাকা হাত-খরচ আর খাই-খরচ মিলবে। আমি বললুম—দরকার নেই ভাই, ম্যাজিকটা যদি আর একটু রপ্ত করতে পারি,···এই ধর বেশী কিছু না···যদি কাটামুণ্ডু জোড়া দেওয়ার খেলাটাও শিখে নিতে পারি তো ওই চারশো টাকার মাথায় আমি তখন লাথি মারবো···

তারপর খানিক থেমে বললে—আছে একজন, সাইগন-এ বুড়ো মানুষ, চীনেম্যান, ভীষণ আফিং খায় বেটা, চারভরি আফিং যোগাড় করে গিয়েছিলাম দেখা করতে সাইগন-এ তার বাড়ীতে, আফিংটা কৌটোয় ভরেও নিলে, তারপর অনেক টাকা চেয়ে বসলো···কিন্তু গুণীলোক···তাই তো গুদামবাবু

আর মহারাজের লাথি-ঝাঁটা খেয়েও ওইখানে পড়ে আছি, যা ষাট-সত্তর পাই জমিয়ে-জমিয়ে যেদিন হাজার খানেক টাকা হবে···সেইদিন···

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের মনে কী যেন ভাবতে লাগলো ভোম্বল। বললে···তা ছাড়া কোথায় পাকিস্তান-হিন্দুস্তান করে বেড়াবো, ধরা পড়লে দেবে লট্‌কে···তার চেয়ে এ-তবু একটা আশা নিয়ে বাঁচা···একদিন হয়তো মা'কে খুঁজে পাবো,···এই ভেসে-ভেসে বেড়ানো আর ভালো লাগে না, মনে হয় নিজের মা যদি কেউ থাকতো আর খুব বকতো-মারতো আমায়, যেন ভালো হতো। অনেক দিন ধরে মা'র বকুনি খেতে ইচ্ছে করে খালি···

চলতে-চলতে আবার ওরা ট্রাম লাইনের ধারে এসে পড়েছে। হঠাৎ একটা দোকানে ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই ভোম্বল চমকে উঠলো।

···আরে আজ যে আমার সাতটায় ডিউটি রে···আমি আর আজ তোদের বাড়ীতে যেতে পারবো না ভাই ··আমি চললাম ওই বাসটায়··· তুই যা তা'হলে···

বলে চলে যেতে-যেতে হঠাৎ থামলো। বললে···ওরে দাঁড়া···

কাছে এসে বললে···তোর পকেট তো ঢু-ঢু···আচ্ছা হাঁদা তো তুই ·· বাড়ী যাবি কী করে···এই নোটটা রাখ তোর কাছে···

দশ টাকার একটা আস্ত নোট রাতুলের দিকে এগিয়ে দিলে ভোম্বল। তারপর বললে···আর বোধ হয় তিন-চার দিন আছি এখানে, যদি সময় করে একবার আসতে পারিস তো দেখা হলো, নইলে আর হলো না···কাল সকাল সন্ধ্যেয় যখন ইচ্ছে আসিস না একবার, আর···আর কিছু নয়। মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই ভাই মিছেমিছি···

বলে একটা চলন্ত বাসে ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ল ভোম্বল। এক মুহূর্তে রাতুল সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। জীবনের মাঝখানটা যদি কেবল দুঃস্বপ্নেই কেটে থাকে তো কাটুক। তাতেও বেশি দুঃখ করবার নেই। ভোম্বল এমন একটা ছেলে। ওর সঙ্গে যে-ক'টা দিন কাটলো···সে ক'টা দিনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাক সারাজীবন। কোনও দিন রাতুলের নামটা পর্যন্ত জিগ্যেস করবার অপ্রিয় কৌতূহল প্রকাশ করলে না। এমন করে অচেনা-অজানাকে ভালবাসতে শেখালে ওকে কে! কোন্ ইস্কুলের শিক্ষা ওর, কে ওর মাস্টার! মানুষের সংসারের কত-টুকুই বা দেখেছে রাতুল। বেশী জানা, বেশী দেখার গর্ব ওর নেই, কিন্তু ওর মনে হলো সারা সংসারে এমন ছেলে বুঝি বড় দুর্লভ। ট্রামে উঠে পড়লো রাতুল। এখুনি সাড়ে সাতটায় সময় 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট' বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সভায় বক্তৃতার শেষে বাবার সঙ্গে সে দেখা করবে। তার আগে নয়। বাবা

খুব চমকে উঠবে যা' হোক। নিশ্চয় চমকে উঠবে। প্রথমে বলবে—কে, কে তুমি ?

রাতুল বলবে—আমি রাতুল বাবা, আমি রাতুল—মরিনি আমি—দেখো দিকিনি তোমরা সবাই মিলে আমাকে নিয়ে কী ভুলটাই করলে—কী মজাটাই'না হলো—

—সে কী রে! রাতুল!! রাতুল!!!

সেই চলমান ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের এককোণে বসে রাতুলের চোখের সামনে যেন নিত্যানন্দ সেন-এর শরীরী আবির্ভাব হলো। বহুবছর আগে দেখা চেহারাটা যেন আজও অবিকল তেমনি। তেমনি সস্নেহ গাঢ় আলিঙ্গনের পরিতৃপ্তিতে অধ্যাপকের চোখ দু'টো বুজে এল। বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট বাপের বুকের ভেতর মুখ লুকোল রাতুল। আর তারপর দু'জনের মানসদৃষ্টি থেকে বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ, ত্রিভুবন-বিশ্বসৃষ্টি-চরাচর বিলুপ্ত হয়ে গেল এক নিমেষে। রাতুলের মনে হলো—কেউ নেই পৃথিবীতে। দুঃখ-শোক-দুঃস্বপ্নময় পৃথিবী বুঝি হঠাৎ বড় প্রিয় আবাস হয়ে উঠেছে। আবার সেই বিশাল বক্ষদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে, স্নেহ-নিবিড় পক্ষপুটে সে নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভাবনায় দিনগুলো কাটিয়ে দেবে।

···কলুটোলা, কলুটোলা ···

···ঢং···ঢং···

চলন্তি ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে রাতুল। এখান থেকে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে সর্টকাট্। কিন্তু ইন্‌স্টিটিউটের কাছে গিয়ে রাতুল একটু অবাক হয়ে গেল। বাইরে অনেক লোকজন জমে জটলা করছে। ভেতর থেকেও অনেক লোক বাইরে বেরিয়ে আসছে। কোথাও কোনও শৃঙ্খলা নেই। এ কী! মিটিং কী হলো! একজনকে জিগ্যেস করলে রাতুল—হ্যাঁ দাদা, ব্যাপার কী ?

—কী জানি ভাই, গুজব তো অনেক রকম শুনেছি—বলে সে-ভদ্রলোক একদিকে সরে পড়লেন।

বাইরের দেয়ালে তখনও সভার কয়েকটা প্ল্যাকার্ড আঁটা রয়েছে। গোলমাল, চীৎকার, হৈ-চৈ—কোলাহল-মুখর পরিবেশ।

রাতুল আর একজনকে জিগ্যেস করলে—হ্যাঁ দাদা, মিটিং কী হলো ? হবে না আজ ?

—হবে না ভাই, হবে না ; আজ শুধু নয়, কোনদিনই আর হবে না—ব'লে ভদ্রলোক তেমনি চলে গেল ওদিকে, নিজের গন্তব্যস্থানে। ভিড় যেন ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসছে।

রাতুল আর একজনকে ওই একই প্রশ্ন করলে—মিটিং হবে না মশাই ?

ভদ্রলোক একবার রাতুলের মুখের দিকে চাইলেন। এই বয়েসে পরলোক সম্বন্ধে কৌতুহল একটু ব্যতিক্রম বৈকি। বললেন—কোথা থেকে আসছো ভাই ?

রাতুল জিগ্যেস করলে—কেন ?

—না, তাই বলছি, যদি দূরে বাড়ী হয় তো এখুনি বাড়ী ফিরে যাও—ও মিটিং-ফিটিং শোনবার আশা ছাড়ো—যত রকমের বোগাস্ ব্যাপার সব কি এই বাঙলা দেশে—এমন ভেজালের দেশ তো অরে ত্রিভুবনে কোথাও পাবে না ভাই—

ওদিকে কয়েকজন আলোচনা করতে-করতে চলেছে।

—ওহে, এতদিন শুধু দুধ ঘি-র ব্যাপারে ভেজাল চলছিল—এখন দেখছি বিদ্যে-বুদ্ধি-লেখাপড়া-ডিগ্রী-ডিপ্লোমার মধ্যেও ভেজাল—নাঃ আর কাউকেই বিশ্বাস নেই জগতে—সে যাই হোক্, বইগুলো কিন্তু বেচে বেশ কিছু টাকা-পয়সা করে নিয়েছে ভদ্দরলোক—এক-একটা বই-এর চার-পাঁচটা করে এডিসন—সব ফক্কিকারী—

সমস্ত কথাবার্তা-আলোচনা শুনে রাতুল কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। বাবা কি তবে মিটিং-এ আসেন নি। সবাই কি বাবাকে নিয়েই আলোচনা করছে। কে বোগাস্ ? কার সব ফক্কিকারী ? তার বাবার ? প্রফেসর নিত্যানন্দ সেনের! যিনি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেন নি। যিনি আপিসের দোয়াত-কলম-কালিতে নিজের ব্যক্তিগত একটা চিঠিও লেখেন নি কখনও। সত্যনিষ্ঠ, দার্শনিক, মহানুভব, সেই নির্লোভ, নিরাসক্ত পুরুষের কথাই এরা বলছে নাকি।

এবার আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারলে না রাতুল। জিগ্যেস করলে—হ্যাঁ মশাই, প্রফেসর নিত্যানন্দ সেন আজ আসেন নি মিটিং-এ ?

একদল লোকের মধ্যে একজন বলে উঠলো—না ভাই আসেন নি—আর কোন্ মুখ নিয়েই বা আসবেন বলো—

—কেন ? অভ্রভেদী কৌতুহল রাতুলের। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—আরে ভাই, যে-ছেলেকে নিয়ে এত সব পরলোক-টরলোক আওড়াচ্ছেন—ডিগ্রি-ফিগ্রি আদায় করেছেন—ভলিউম্-ভলিউম বই লিখেছেন—আসলে সে-ছেলে কিনা মরেই নি—এতদিন পরে সেই ছেলে বাড়ী ফিরে এসেছে··· এখন এর পর লজ্জায় মুখ দেখাবে কী করে ? নিজেও বোকা বনলো···

আর সবগুলো ইউনিভার্সিটিকেও বোকা বানিয়ে, দিয়েছে, ছি···ছি বিশ্বাস না হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসো গে···

আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়। বাসে উঠে পড়লো রাতুল।

আর আধ ঘণ্টা পরে রাতুল বাস থেকে নেমে শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এর বাড়ীর সামনে পৌঁছে দেখলে···সেখানেও অনেক লোকের ভিড়। রাত্রের অন্ধকারে জটলা করছে বহুলোক বাড়ীর দরজার সামনে।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন এখন আর সে-লেন নেই। আগে গ্যাসের আলো জ্বলতো। কিন্তু এখন এখানে-ওখানে আরো দু'চারটে দোকান হয়েছে। সেই দোকানের আলো এসে পড়েছে রাস্তায়।

রাতুল বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাট ভিড় হয়েছে একটা। সকলের দিকে মুখ করে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গোবিন্দ। হাত-মুখ নেড়ে গোবিন্দ কী যেন সব বলছে সকলকে।

গোবিন্দরও কী চেহারা হয়েছে! এ যে আর চেনাই যায় না। আগে কেমন দেখতে নাদুস-নুদুস ছিল। ভুঁড়িটা ছিল মস্ত বড়। ওই ভুঁড়ি চিত করে শুয়ে থাকতো সে। যখন মেজাজ ভালো থাকতো গোবিন্দের, রোয়াকের ওপর দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে বাঁ-হাতটা বুকের ওপর আর ডান হাতটা ভুঁড়ির ওপর রেখে, আঙুলগুলো দিয়ে একমনে তবলা বাজিয়ে যেত। আর মুখ দিয়ে বেরুত তবলার বোল্···তাগে নাধিন্ নাগেধিন···ক্রেকেটে তাক্, ক্রেকেটে তাক্-তাক্-তাক্ ··তাগে নাধিন্ নাগেধিন্···

দোতালার ওপরের ঘর থেকে শোনা যেত পায়রার বক্-বকম্ আওয়াজের মতন গোবিন্দের ভুঁড়ির তবলার বোল্। সে-ভুঁড়ি এখন চুপসে গেছে একেবারে। গায়ের মাংস এখন ঝুলে আসছে। রং আরো কালো হয়ে গেছে।

গোবিন্দ চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলছে···

···আমাকে আপনারা কেন মিথ্যে-মিথ্যে দুষী করছেন আজ্ঞে···আমি কে? আমি এ-বাড়ীর চাকর বই তো নয়···হুকুমের চাকর বটে তো। কর্তার অন্ন খাচ্ছি, কর্তাবাবুর হুকুম তামিল করতে হবে···আবার যে-দিবস আপনাদের অন্ন খাবো, সে-দিবস আপনাদেরও···

কে বুঝি ভিড়ের ভেতর থেকে বলে উঠলো···আচ্ছা, তুমি যাও না একবার···বলে এসো, রাখালবাবু এসেছেন···কী বলেন এসে বলো আমায়···

গোবিন্দও না-ছোড়বান্দা। বলে···আজ্ঞে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথা কেউ শুনলে তো। দরজায় ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে ক্ষিতীন-বাবু আর আমার কর্তাবাবু আমাদের খোকাবাবুকে নিয়ে কথাবার্তা বলছেন ·· আমার কথা এখন কে শুনবে আজ্ঞে— আমি তো সামান্য চাকর বটে···

তবু ভদ্রলোকেরা প্রতিবাদ করে···তোমাদের খোকাবাবু তা'হলে ফিরে এসেছে শেষ পর্যন্ত···মারা যায়নি ?

গোবিন্দ জিব কাটলে। বালাই ষাট···মারা যাবেন কেন হুজুর···কামিখ্যেয় গেলে যেমন মন্তর-তন্তর করে···এও তেমনি মন্তর-তন্তর করে রেখেছিল আর কি···

কে একজন বলে উঠলো···তবে এই নিয়ে এতদিন এত বই লেখা, এত বক্তৃতা···

আর একজন বললে···আহা, ওকে ওসব বলে লাভ কী মশাই ?

···বলুন তো, আপনিই বলুন তো ?

গোবিন্দ যেন জোর পেয়ে গেল এতক্ষণ।

···বলুন তো আপনি···আমি সামান্য চাকর বটে কি না···আমার ওপরে কর্তাবাবুর হুকুম আছে কাউকে যেন ভেতরে ঢুকতে না দিই—এখন আমি আপনাদের ঢুকতে দেই···আর তারপরে আমার চাকরিটি যাক—তখন আর দাঁড়াব কোথায়—এই বুড়ো বয়সে কে আমায় চাকরি দেবে শুনি ? না, আমার জমিদারী আছে, তাই ভাঙাবো আর খাবো ?

রাতুল তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গোবিন্দর কথা শুনছিল আর তার অঙ্গভঙ্গী দেখছিল। ওই চেহারাটাই যা বদলেছে গোবিন্দর, আসলে সেই আগেকার মত বাক্যবাগীশই আছে। কিন্তু সে যা হোক, এদিকে মজা তো মন্দ নয়।

রাতুল সেজে কে আবার এসে হাজির হলো তা'হলে। জাল প্রতাপচাঁদ নাকি। কিম্বা ভাওয়াল মামলার মত মেজকুমারের পুনরাবির্ভাব! সত্যি সত্যি মজা তো মন্দ নয়। এ যে রাতুলের জীবন নিয়েও আবার একটা ডিটেকটিভ্ উপন্যাস শুরু হলো দেখা যাচ্ছে। খুব হাসি পেল রাতুলের।

এমন করে ঘটনাস্রোত বদলাবে কে ভাবতে পেরেছিল। রাতুল ভিড়ের সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। একবার ডাকলে—গোবিন্দ—ও গোবিন্দ—শুনতে পাচ্ছো—

ডাকটা বোধ হয় গোবিন্দর কানে গেল। বললে—এখন গোবিন্দ কারো নয়। এখন কারো সঙ্গে কথাটি বলতে পারবো না। আমি—আমি হুকুমের চাকর—যেমন হুকুম পাবো তেমনি তামিল করবো—আমার কিসের দায় পড়েছে সকলের কথা শোনবার—

রাতুল একবার বলতে গেল—গোবিন্দ শোন এদিকে, আমি রাতুল—আমিই আসল রাতুল—কিন্তু বলতে গিয়ে ও বলা হলো না। কী যেন ভাবলে একবার। এর শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক্ না—কোথায় গড়ায় ব্যাপারটা। সারাটা জীবন যার সামনে পড়ে রয়েছে তার এত তাড়াহুড়ো করারই বা কী

প্রয়োজন। চিরকাল একটা মিথ্যেকে কখনও সত্যি বলে চালানো যায় না। কথাটা বাবার কাছেই শিখেছে সে। যা ফাঁকি তা একদিন ধরা পড়বেই। একদিন একসময় সবই জানাজানি হয়ে যাবে। তখনই মজা হবে।

রাতুল সেই অন্ধকারে ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো।

সিঁড়ির ওপরে উঠেই ডানদিকে একখানা ঘর। সে-ঘরটা কোনও কাজে লাগে না সাধারণতঃ। সে-ঘরটায় এখন যাবতীয় বাজে জিনিস ভরা। তার ঠিক পরের ঘরটাতেই ভেতরে খিল দিয়ে বসে আছেন নিত্যানন্দ সেন। আর একটা চেয়ারের ওপর বসে আছে ছেলেটি। ক্ষিতীনবাবু সামনে বসে একদৃষ্টে তাকে দেখছেন আর কথা বলছেন। ক্ষিতীনবাবু বললেন—সত্যি কথা বললে তোমার শেষ কী ক্ষতি হয় খোকা?

—আমি সত্যি কথাই তো বলছি।

ছেলেটি আস্তে-আস্তে মুখ নিচু করেই বললে কথাটা।

—কিন্তু এই ঘর, এই বাড়ী—এ সব তোমার, স্বীকার করছ তো—চেয়ে দেখ দিকিনি তোমার বাবার মুখের দিকে—তোমার কথা ভেবে-ভেবে চেহারা কী হয়েছে ওঁর—একটু মায়া-দয়াও নেই তোমার শরীরে—ছেলের জন্যে বাবার যে-দুঃখ, তা কি একটুও বুঝছো না—এতদিন ধরে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে কি এই শিক্ষা পেলে—

ছেলেটির মুখে কোনও কথা নেই—

আর একটা কথা···

ক্ষিতীনবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে সরে এলেন আরো কাছে।

···আর একটা কথা, রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে চেহারার যা দশা হয়েছে, তা-তো দেখছিই। কী ছিলে আর কী হয়েছ! কতদিন আমার পিঠে চড়ে তুমি খেলা করেছ—সেই রাতুল তুমি, এ কী সর্বনাশ করছো বলতো, শুধু নিজের সর্বনাশ নয়, বাবারও সর্বনাশ করেছো—অথচ সমস্ত চুকে যায় যদি একবার বাবা বলে ডাকো ওঁকে···ওই তো দেখছ উনি মুখ ঢেকে অন্য দিকে চেয়ে তখন থেকে বসে আছেন, কিন্তু এখনি তোমার ডাকটি শুনলে সব ভুলে আবার তোমায় বুকে তুলে নেবেন।

তারপর একটু থেমে বললেন · বলো, কথা বলো, তোমার কী বলবার আছে মুখ ফুটে বলো উত্তর দাও···সেই ছটফটে ছেলেকে এমন বোবা করে দিলো কে যে ··

খানিক পরে বিরক্ত হয়ে ক্ষিতীনবাবু বললেন—থাকগে, তুমি আজ

রাত্তিরটা বরং ভাবো···সমস্ত রাত ধরে ভাবো···খাও- দাও···ঘুমোও বিছানায় শুয়ে, অনেকদিন তো আরামে ঘুম হয়নি···তারপর, তারপর যখন বুঝবে যে তোমার ভালোর জন্যেই এত বলা···তখন উত্তর দিও কথার···কী বলো ভাই নিত্যানন্দ ?

ক্ষিতীনবাবু চেয়ার থেকে উঠে নিত্যানন্দর কাছে গেলেন। দুই হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে আছেন তিনি।

কাছে গিয়ে ক্ষিতীনবাবু বললেন···এখন ওকে বিরক্ত করবার দরকার নেই ···কী বলো ভাই—আমি বলি কি ওকে একটু বিশ্রাম দেওয়া যাক। ক্রমাগত প্রশ্ন করলে ও নার্ভাস হয়ে যাবে···তাছাড়া নিজের ঘর, নিজের বাড়ীতে দিন দুই বাস করলে তখন আবার পুরোন কথা মনে পড়বে। মা'র কথা মনে আসবে··· দেখতে-দেখতে, শুনতে-শুনতে, তখন ও-ঘোরটা কাটতে পারে···সাধু-সন্ন্যিসী হওয়া-টওয়া ও-সব একটা ব্যাধি তো—জিজ্ঞেস করো তোমার গিরীন্দ্রশেখর বোসকে ওরা জানে···আরে কত দেখলাম ভাই জীবনে···

তারপর একটু ভেবে বললেন···আরে তুমি সুধীরকে চিনতে তো··· আমাদের ক্লাশ-ফ্রেণ্ড সুধীর চাটুজ্জে—দশ ছেলের বাপ···পয়সা-কড়ি কোথাও কিছুর অভাব নেই···সেই আমাদের সুধীর হে—চিনতে পারছো তো ?

একটা কথারও উত্তর দিলেন না নিত্যানন্দ। ক্ষিতীনবাবু এবার প্রসঙ্গ বদলে বললেন···মন খারাপ করে কী করবে···কিছু ভেবো না, আমি তো আছিই···দেখবে তোমার ঘরের ছেলে ঘরেই থাকবে···কোনও ভাবনা নেই।

তবু নিত্যানন্দ সেন যেমন বসেছিলেন তেমনি চুপ করে মুখ নিচু করে বসেই রইলেন। ক্ষিতীনবাবু যেন একটা পাষাণস্তূপের সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেটি যেমন নির্বিকার-নির্বিরোধ, তেমনি ওর বাপও যেন সমাধি লাভ করে এক অচৈতন্য-লোকে বাস করছে। দুই-এর মাঝখানে ক্ষিতীনবাবু একলা কেবল বেঁচে আছেন, জেগে আছেন। কিন্তু তাঁকে এখন হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। এতদিন পরে রাতুল যদিই বা ফিরে এল—তার মৃত সত্তা নিয়ে তাঁদের কী কাজ হবে। আবার নিত্যানন্দকে সংসার করতে হবে। রাতুল আরো মাথা উঁচু ক'রে বাপের যশ সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি, প্রতিভা প্রতিষ্ঠার উত্তরাধিকারী হবে—তবেই তো বাপের মুখ উজ্জ্বল হবে।

—কে রে—ক্ষিতীনবাবু বাইরের দিকে চাইলেন।

খিল-বন্ধ দরজার বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি গোবিন্দ—

—কী খবর···সবাই চলে গেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ চলে গেছে সবাই···

—বাইরে এখন গোলমাল-টোলমাল নেই তো···

—আজ্ঞে, না নেই···

—এইবার একটা কাজ করতে হবে তোমায় গোবিন্দ, আমার বাড়ীতে টুপ্ করে গিয়ে একবার একটা খবর দিয়ে আসতে হবে, তারা হয়তো সব ভাবছে। খবর দিও যে আমার ফিরতে একটু রাত হবে আজ—এদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে···ঘরে শুইয়ে দিয়ে তবে আমার আজ ছুটি।

···খাবার আমার তৈরী বাবু···বাবুকে জিগ্যেস করুন এখন কি খাবেন?

এতক্ষণে কথা ফুটলো নিত্যানন্দর। মুখ নিচু করেই বললেন···আজ্ঞে খাবো না আমি···

—সে কী? ···গোবিন্দ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ, তুই এখন যা তো···

—কিন্তু খোকাবাবু? ছেলেমানুষ কতক্ষণ না খেয়ে থাকবেন···

নিত্যানন্দ জবাব দিলেন না। জবাব দিলেন ক্ষিতীনবাবু। বললেন···কেন, তোমারও খেয়ে নিলে ভালো হতো না নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ আস্তে-আস্তে বললেন···আমার আজ ক্ষিদে নেই।

তারপর রাত আরও গভীর হয়ে এল শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ। এক ফাঁকে হঠাৎ রাতুল দেখলে গোবিন্দ বাড়ীর দরজা খুলে বাইরে এল। তারপর সোজা চলতে লাগলো গলির পূব দিকে। রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। রাতুল এক ফাঁকে নিঃশব্দে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ীর ভেতরে।

রাতুলের মনে হলো যেন প্রত্যেকটি পদপাতে রোমাঞ্চ জাগছে। দু'পাশের অন্ধকার সব তার চেনা। এই অন্ধকারগুলোর সঙ্গে যেন তার বহুদিনের পরিচয়। ছোটবেলায় ওরা তাকে ভয় দেখিয়েছে কতবার। আবার এক-এক সময় ওই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে কত ভালোই যে লেগেছে সেকালে। রামধনুর সাত রঙ মেশানো অন্ধকার সব। মনে হয় আঙুল দিয়ে একটু ছুঁলেই অন্ধকারগুলো টুং-টাং শব্দে বেজে উঠবে। যেন সাত-রঙা পরীর পায়ে ঘুঙুরের বাজনা। আবার ওদের ভয় দেখানোও ছিল বড় অদ্ভুত। শোবার ঘরের ছোট জানালা দিয়ে উঠোনের কোণটার দিকে চাইতেই মনে হতো যেন আম্বিবুড়ি ওর দিকে ড্যাব্-ড্যাব্ করে চেয়ে দেখছে। আম্বিবুড়ির কপালজোড়া সিঁদুর, কড়ির মত সাদা-সাদা চোখ আর জট-পাকানো শনের দড়ির মত কালো-কিষ্টি চুল-ভর্তি মাথা।

সদর দরজা যেমন ভেজানো ছিল তেমনি ভেজিয়ে রেখে রাতুল রোয়াকের সিঁড়ির রেলিং-এ হাত দিলে। চেনা হাতের ছোঁয়া পেয়ে রেলিংটা যেন চমকে উঠেছে। কোথাও কিছু বদলায় নি। আছো তো ভাই তোমরা তেমনি? সবাই তেমনি আছো? আর রেলিং-এর শিকগুলো? মাঝে-মাঝে

এক-একটা ভাঙা। তাও তেমনি সব। কত মেরেছি তোমাদের লাঠি দিয়ে— যখন পড়া বলতে পারতে না। দেখতে তো চুপচাপ, শান্ত-শিষ্ট ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়ে সব, কিন্তু কী দুষ্টুমি ছিল ভেতরে-ভেতরে। মাস্টারকে অপগ্রাহ্যি! ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে কতবার পা পিছলে চিতপটাং। ওই রেলিঙের শিকগুলো ছিল তার সব ছাত্র আর রাতুল ছিল ওদের মাষ্টার।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে রাতুল মনে-মনে হাসলে। তা মনে পড়লে এখনও হাসি পায় বৈকি। সেদিন ফুটবল খেলে বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেছে। খেলতে গিয়েছিল রসার মাঠে। হাতে-পায়ে জামায় কাদা লেগে আছে। মতলব ছিল সবাই-এর চোখে ধুলো দিয়ে আস্তে-আস্তে ঢুকে জামা কাপড় বদলে ফেলার।

—কে যায় রে—কে যায় ওখানে—পেছনে গোবিন্দর গলা।

গোবিন্দকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালাতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামনেই বাবা। ভূত দেখার সামিল।

বাবা বলেছিল—গোবিন্দ দেখ্ এসে—কাদের ছেলে রে—কাদের ছেলে এটা···

—ছাই ফেলে কুলোটা নিয়ে গোবিন্দ এসে দেখে—খোকাবাবু—

—এ যে আমাদের খোকাবাবু—

—না তুই ভালো করে দেখ্ গোবিন্দ—তুই নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিস—নিত্যানন্দ সেন মাথা নাড়তে লাগলেন।

—সে কি কথা বাবু, এ যে নির্ঘাৎ আমাদের খোকাবাবু—আর কেউ নয়—

—যত বাজে কথা তোর গোবিন্দ—আমার খোকা হলে কি এমন কাদা মেখে বাড়ী ফেরে—গোবিন্দর কথা না শুনে লুকিয়ে পালায়—কক্ষনো নয়, আমার খোকা এ কক্ষনো নয়—তুই ভালো করে দেখ গোবিন্দ—চোখ বোধ হয় তোর খারাপ হয়েছে—আহা এই বয়েসেই চোখটা নষ্ট হলো তোর—

—না বাবু—আপনি কি বলছেন—এই দেখুন ভালো করে চেয়ে দেখুন—বলে রাতুলের চিবুকটা তুলে ধরতে যেতেই রাতুল কেঁদে বাবার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল—

—আমি আর করবো না বাবা, আর আমি কখনও এমন করবো না—

এমনি শিক্ষার রীতি ছিল বাবার। কখনও রাগ নয়, বকাবকি নয়, ধমকানো নয়। কখনও কোনও অন্যায় করতে বারণ করেন নি বাবা। বাবা তার বন্ধু। কতদিন দু'জনে একসঙ্গে দোতলার বারান্দায় বল খেলেছে। খেলতে-খেলতে বাবাকে হারিয়ে দিয়েছে। বাবার সঙ্গে গুলি খেলতে গিয়ে

বাবার সব গুলি জিতে নিয়েছে। 'চোর-পুলিস' খেলতে-খেলতে বাবাই তো বেশীর ভাগ দিন চোর হতো। আবার সেই বাবাকেই রাতুল অন্য সময় যেন চিনতেই পারতো না। খুব ভোরে উঠতো বাবা। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে—সূর্য ওঠেনি তখনও। চুপি-চুপি লেপ ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে—মস্ত ভারী একখানা মহাভারত নিয়ে বাবা পড়ছে। চারদিকে ধূপ জ্বলছে। খালি গা—তসরের কাপড় পরা। সেই মাথা নিচু করে পড়া—সাড়া নেই—শব্দ নেই, কোনও দিকে খেয়াল নেই! একমাত্র নিজের মনের সঙ্গেই যেন নিজের মনের গলাগলি ভাব। আর সবাই তারপর।

এক-একদিন সেই সময়ে সাহস করে পাশে যেতেই বই-এর দিকে চোখ রেখেই ডান হাত দিয়ে রাতুলকে কাছে টেনে নিয়েছে বাবা। কিন্তু পড়া তার বন্ধ হয়নি। অনেক পড়া শেষ করে বই বন্ধ করে বাবা জিজ্ঞেস করেছে—সকালে ওঠা খুব ভালো রে খোকা—

—আমিও রোজ ভোরে উঠে বই পড়বো—

বাবা বলেছিল—যদি উঠতে ভালো লাগে তো উঠো—নইলে নয়···তাতে শরীর খারাপ হবে তোমার ··

ভোরে ওঠা হয়নি রাতুলের। কিন্তু আশ্চর্য, বাবাও আর কখনও পেড়াপীড়ি করেনি। অথচ রাতুল ভালো করেই জানে···সে ভোরে উঠে পড়াশোনা করলে বাবার মতন আর কে বেশী খুশি হতো!

তবু রাতুলের মনে হতো কোথায় কেমন করে বাবাকে যেন সে সম্পূর্ণ করে পায় না। মন ভরে না। ছুটির দিন দুপুরবেলা কেউ যখন বাড়ীতে থাকে না, তখন ভূগোলের ম্যাপের দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মন এই পিচ-ঢালা রাস্তা পেরিয়ে চিলের পাখায় ভর করে এশিয়া মাইনর ছাড়িয়ে, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন আর দ্বীপ-দ্বীপান্তর পার হয়ে থামে গিয়ে পেঙ্গুইন আর এস্কিমোদের দেশ উত্তরমেরুতে—তারপর আবার এক সময় উত্তরমেরু ছাড়িয়ে কোথায় কোন রহস্যপুরীর অন্দর মহলে গিয়ে হারিয়ে যায়, কেউ আর তার ঠিকানা জানে না। তারপর একদিন যখন আরও কিছু বড় হলো রাতুল—কাউকে বোঝানো যায় না তার কথা। তার কথাও কেউ বোঝে না আর—

খিদিরপুর ডক্ থেকে জাহাজটা যখন ছেড়ে দিলে সেদিন, জেটিতে এসে কোনও চেনা মুখ তো তাকে আনন্দ-বিদায় দিতে আসেনি। এলে হয়ত দেখতে পেত জাহাজের অসংখ্য পোর্ট হোলের একটির মধ্যে একটি শুধু মুখ···

কোনও বিশেষ দিকে তার দৃষ্টি আটকে নেই। কিন্তু তার এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠে এল রাতুল। এখানে অন্ধকার একটু পাতলা। দূর আকাশের জ্যোস্নায় অন্ধকার এখানে ছাই-ছাই হয়ে এসেছে। আগেকার মস্ত টিয়া পাখীটা খাঁচায় ঝুলছে এখনও।

নিজেকে হঠাৎ লুকিয়ে ফেলল রাতুল। এখুনি তাকে দেখতে পেলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চীৎকার শুরু করে দেবে। এতদিন হয়ে গেছে···হয়ত আগেকার মত কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকলে আর শিস্ দেবে না। এখন হয়ত ভয় পাবে। পাখীরা তো অন্ধকারেও দেখতে পায়।

কিন্তু লুকোতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো গঙ্গারাম তো অনেকদিন মারা গেছে। মনেই ছিল না তার স্মরণশক্তিটা কি এখনও ভালো ফেরেনি তবে।

সেই গঙ্গারাম। সে অনেক দিনের কথা। গোবিন্দ তার দেশ থেকে এনেছিল পাখীটা। তখন সবে রাতুল জন্মেছে। একই সঙ্গে মা-হারা রাতুল আর গঙ্গারামকে বাঁচিয়ে তোলবার মহৎ ভার নিয়েছিল ওই গোবিন্দই।

রাতুলকে সবাই ডাকতো···খোকা···

গঙ্গারাম শুনে-শুনে বলতে শিখলে—খোকা—ও খোকা—

কিন্তু বিদ্যের দৌড় ওই পর্যন্তই। প্রথমভাগ শেষ করে যখন আস্তে-আস্তে ফার্স্ট বুক ধরলে রাতুল, তখনও গঙ্গারাম 'ক-খ'ই শেষ করেনি। কিন্তু সেই গঙ্গারাম একদিন হঠাৎ মারা গেল। আর রাতুল? সে তো কবেই মরে গেছে। বেঁচে আছে যে সে তো 'কেস নম্বর ৪৯'।

গঙ্গারামের মৃত্যুর ঘটনাটা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

গোবিন্দ খাঁচা নিয়ে গঙ্গারামকে স্নান করাচ্ছিল। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো—কান্না শুনে ওপর থেকে সবাই ছুটে নিচে এসে দেখে খাঁচার ভেতর গঙ্গারাম দাঁড় থেকে ছিট্‌কে কাত হয়ে নিচে পড়ে আছে। উঃ, গোবিন্দর সে কী বুকফাটা কান্না। রাতুলেরও সমস্ত বুক ফেটে যেন কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সে আর গঙ্গারাম, গঙ্গারাম আর সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ তাকে কালিঘাটের আদিগঙ্গায় গিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

মনে আছে রাতুলের সে-রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি। কেবল মনে হয়েছে গঙ্গারামকে বাঁচানো হলো না কেন। বাড়ীতে খবরের কাগজ আসতো "দৈনিক যুগবার্তা"। সেই "দৈনিক যুগবার্তা"র সামনের পাতায় বড়-বড় হরফে বিজ্ঞাপন থাকতো—

"মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় বিদ্যুৎ সলিউশন্"

যে-কোনও মানুষ বা যে-কোনও জীবজন্তু নাকি বিদ্যুৎ-সলিউশনের গুণে মরে যাবার পর আবার বেঁচে উঠতে পারে। সে-বিজ্ঞাপনটা বছরের পর বছর রোজরোজ দেখে-দেখে কেমন যেন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একই কাগজের একই জায়গায়, একই বিজ্ঞাপনের যে কী মোহ আছে, কে জানে। সেদিন রাতুলের শিশু-মনে এই প্রশ্নই জেগেছিল যে গঙ্গারামকে 'বিদ্যুৎ সলিউশন্' খাওয়ানো হলো না কেন। তা'হলে তো সে আবার বেঁচে উঠতো।

হঠাৎ একবার যেন সদর দরজা খোলার মত শব্দ হলো। রাতুল টপ্ করে সিঁড়ির পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়েছে। গোবিন্দ বোধ হয় ফিরে এল।

এ-ঘরটায় যেন বহুদিন পা দেয়নি কেউ। রাতুলের মা নাকি এই ঘরে থাকতো। এখন অবস্থা দেখে মনে হলো—নানা জিনিসের সমাবেশ হয়েছে বুঝি এ-ঘরটায়। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। দরজাটা ভেজানো ছিল। দরজার কপাট খুলতেই ক্যাঁচ্ক্যাঁচ্ শব্দ করে থেমে গেল। দেখা যাক্ না। পাশের ঘরেই আলো জ্বলছে। ওখানেই বোধ হয় আলোচনা চলছে। বেশ একটা জটিল সমস্যায় পড়েছে সবাই। কিন্তু এ-ঘরে যদি কেউ ঢুকেই পড়ে! তা' হলেই তো সর্বনাশ। তা, সর্বনাশ আর কিসের! তোমার বাড়ী তুমি এসেছ—তোমার অধিকার আছে এ-বাড়ীতে। কী আর হবে। জেলও হবে না—হাজতও হবে না। যে জাল-রাতুল, সে-ই বিদায় নেবে।

সিঁড়ি দিয়ে যেন কার ভারী পায়ের শব্দ হলো। রাতুল নিমেষে নিজেকে সুস্থির করে নিলে। তারপর আর যখন কোনও আওয়াজ নেই কোথাও, চেয়ারটা সরিয়ে একটা মস্ত-বড় সুটকেসের পাশে গিয়ে বসলো। দু'টো ঘরের মধ্যে একটা দরজা। দরজার মধ্যে একটা ছোট ফুটো দিয়ে দৃষ্টি দিলে ওদিকের ঘরে। প্রথমটা স্পষ্ট করে দেখা গেল না।

তারপর কী মনে হতেই রাতুল সুটকেসটা ঠেলে সরিয়ে দিলে। বেরিয়ে পড়লো আর একটা বড় ছিদ্র। তার ভেতর দিয়ে উঁকি দিতেই রাতুল অবাক হয়ে গেল। ওপাশে ক্ষিতীনবাবু—আর পেছন ফিরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আছে বাবা। আর মেঝের ওপর বসে—ও কে? ওই বুঝি জাল রাতুল!

আশ্চর্য! হঠাৎ রাতুলের আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো। আরে ও যে হরিদাস! ভবতোষবাবুর বন্ধু হরিদাস!

এতক্ষণে সমস্ত রহস্যটা রাতুলের কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। ছি-ছি, এই নিয়ে এত কাণ্ড! এইবার যখন সে নিজে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন অবশ্য সকলের ধারণা বদলে যাবে। মিছিমিছি সেই হরিদাস বেচারাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। ও তো সন্ন্যাসী মানুষ। সংসারধর্ম ওর পোষায় না। ভবতোষবাবুর

মুখেই শুনেছে সে। নইলে ভবতোষবাবুকে একলা ফেলে কোথায় কোন্ হিমালয়ের গুহার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন্ নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছিল। আবার ঘুরে-ঘুরে এ-কোন্ সংসারের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে।

কান পেতে শুনতে লাগলো রাতুল। ক্ষিতীনবাবু বলছেন—রাখো তোমার বুজরুকি—তোমার জন্যে একটা লোক জীবনপাত করছে, তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে দিনরাত পাগলের মত প্ল্যানচেট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে—চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—আর তুমি কিনা—

বাইরে গোবিন্দর গলা—বাবু—

—কে গোবিন্দ এলে—বাড়ীতে খবরটা দিয়ে এসেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

নিত্যানন্দ সেন এতক্ষণে কথা বললেন—তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় গোবিন্দ—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই, গোবিন্দ কেন বসে থাকবে—কিন্তু তুমি কেন খাবে না নিত্যানন্দ ?

বাবা বললে—আমার ক্ষিদে নেই—

—ক্ষিদের আবার থাকাথাকি কি ? ও সব পাগলামি ছাড়ো—এখন ছেলে ঘরে ফিরে এলো বাড়ীতে, কোথায় আমোদ-আহ্লাদ করবে তা নয়—

বাবা কিছু কথা বললে না।

ক্ষিতীনবাবু হরিদাসের দিকে চেয়ে বললেন—তোমারও খাবার দেওয়া হোক্—বাবার সঙ্গেই বসে পড়—আগে তো একসঙ্গেই খেতে বসতে—তুমি না খেলে নিত্যানন্দর খাওয়া হতো না মনে আছে—মনে নেই ভাই তোমার ?

তারপর গোবিন্দকে ডেকে ক্ষিতীনবাবু বললেন—তা'হলে বাবু আর খোকাবাবু দু'জনেরই একসঙ্গে খাবার দিয়ে দাও গোবিন্দ—একি, এতদিন পরে হারানো ছেলে ফিরে এল, আর তোমাদের কারো গা নেই—

হরিদাস মুখ তুললে এবার। বললে—আমি রাত্রে কিছু খাইনে যে—

—সে কী—বরাবর তো রাত্রে খেতে···

—আগে খেতাম, কিন্তু দীক্ষা নেবার পর থেকে আর খাইনে··

—দীক্ষা ? দীক্ষা-টিক্ষা সব ভুলে যাও—

—আজ্ঞে না, দীক্ষা ভুলতে পারবো না, গুরুর নির্দেশ—

—গুরু, কে তোমার গুরু ? চল দিকিনি যাই সবাই তোমার গুরুর কাছে—ভদ্রলোকের ছেলেদের ধরে বিষমন্ত্র দেওয়া—কোথায় তোমার গুরু ?

—আজ্ঞে, সে অনেক দূর—

—শুনিই না কতদূর—

—হিমালয়ের দক্ষিণে—টেরাই-এর জঙ্গলে—

—তা' বেশ, যাওয়া যাক সেখানে—তোমার নাম যে রাতুল সেন, তোমার বাবার নাম যে নিত্যানন্দ সেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ যে তোমার বাড়ী—তুমি যে যুদ্ধে গিয়েছিলে বাবাকে না বলে—তারপর কোথা দিয়ে কেমন করে যে কোন্ সাধুর পাল্লায় গিয়ে পড়ে সন্ন্যিসী হয়েছ, ছাই-ভস্ম দীক্ষা নিয়েছ—সব আমি প্রমাণ করে তবে ছাড়বো—

ক্ষিতীনবাবু এবার বাবার কাছে গিয়ে বললেন—সাউথ ক্যালকাটার পুলিসের ডেপুটি কমিশনার আমার বিশেষ বন্ধু বুঝলে, তা'কে একবার টেলিফোন্ করবো নাকি—ও হিমালয়ই হোক আর যেখানেই হোক—ঠিক সব ধরে ফেলবে সে···

বাবা পেছন ফিরে বসেছিলো। কথা শুনে তেমনি বসেই রইলো। মাথাও তুললো না। শুধু হাত তুলে জানালো—না থাক্, কাজ নেই—

ক্ষিতীনবাবু বললেন—তা'হলে কী করতে চাও—বলো—

বাবা বললে—তোমাকে এখন কিছুই করতে বলছিনে—

ক্ষিতীনবাবু বললেন—কিন্তু এও বলে রাখছি ভাই, খোকা যদি একটু সুযোগ পায় তো বাড়ী ছেড়ে পালাবে—

বাবা বললে—আমাকে একটু ভাবতে দাও—

—এতে ভাববার কী আছে ?

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

—কিন্তু তোমাদের দু'জনকে এ অবস্থায় ফেলে আমিই বা কেমন করে চলে যাই বলো—তুমিও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলে, ওদিকে খোকাও খাবে না বলছে—আমি তোমার বন্ধু হয়ে তাই দেখতে পারি নাকি—

বাবা বললে—তা'হলে ওকে তুমি খাইয়ে নিয়ে এস—আমি একটু বসে-বসে ভাবি—

—তা বেশ, ভাবো না—কিন্তু শেষে তোমাকে খাইয়ে তবে আমি বাড়ী যাবো ভাই—বলে ক্ষিতীনবাবু হরিদাসকে হাত ধরে ওঠালেন।

বললেন—চলো হে—চলো আমার সঙ্গে—

—কোথায়—

—চলোই না আমার সঙ্গে—

হরিদাসকে জোর করে টানতে-টানতে ক্ষিতীনবাবু দরজা খুলে বাইরে গেলেন। ওরা দু'জনে বাইরে যেতেই মনে হলো বাবা যেন মাথা তুললো। দরজার ফাঁক দিয়ে রাতুল ভালো করে দেখতে লাগলো। বাবা যেন অনেক

বুড়ো হয়ে গেছে। রাতুলের মনে হলো—এখুনি, এই মুহূর্তে বাবার বুকের মধ্যে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাবা এবার নড়ে উঠলো। আবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর ধীর-স্থির ভাবে পায়চারি করতে শুরু করলো। সেই আগেকার মতন। গায়ে শাল জড়ানো। কিন্তু সত্যিই বাবার বয়েস হয়েছে। সামনের দেয়ালে মা'র সেই বড় অয়েলপেন্টিংখানার নীচে গিয়ে দাঁড়ালো একবার, একদৃষ্টে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ সেইদিকে। তারপর উত্তরের দেয়ালে রাতুলের নিজের ফটোটার সামনে এসে দাঁড়ালো।

রাতুলের সেই ছোট ফোটোখানাকে অনেক বড় করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। যুদ্ধে যাবার পথে বর্মায় নেমে সেই ফটোখানা তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাবাকে। মিলিটারি পোশাক-পরা চেহারা। কোমরে ক্রস্‌বেল্ট্। মাথায় ফোরেজ্ ক্যাপ্।

সেই ফটোটাই রাতুলের শেষ ছবি। তারপর আর কোনও ছবি তোলা হয়নি। ওইখানার আশেপাশে রাতুলের ছোটবেলাকার আরো নানা ছবি টাঙানো রয়েছে।

বাবা সেই দিকে চেয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো ঠোঁট দু'টো তার যেন মৃদু-মৃদু নড়ছে। রাতুলের ছবি লক্ষ্য করে কি যেন বলছে। যেমন করে লোকে রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তেমনি করে। কিন্তু বাইরে কোনও শব্দ নেই। যেন আত্মায়-আত্মায় যোগাযোগ। অন্তরে-অন্তরে কানাকানি। রাতুল এতদিনে বুঝতে পারলে—তার মৃত্যু-সংবাদ, তার বিচ্ছেদ—কতখানি কষ্ট দিয়েছে বাবাকে।

রাতুল দেখলে—বাবা তারই ফোটোখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আর দু'গাল বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে অজস্র জল ঝরে পড়ছে। বাবাকে কখনও কাঁদতে দেখেনি রাতুল। বরাবর দার্শনিক মানুষ বাবা। আজ বিশেষ করে যেন বাবাকে চিনতে পারলে সে। তার লুকোচুরির অর্থ কি। কোথাকার কাকে নিয়ে মিথ্যে টানাটানি চলেছে—অথচ সে তো এখুনি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।

বাবার দিকে চেয়ে দেখতে-দেখতে রাতুলেরও চোখ ভিজে এল। সে সত্যিই বড় নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছে সে—মর্যাদাহানি করেছে।

রাতুল উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে আস্তে-আস্তে চারদিকের জিনিসপত্র ঠাহর করে দরজা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করলে। এতক্ষণ ক্ষিতীনবাবু হরিদাসকে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে হয়ত তাকে খাওয়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কী কর্মভোগ হরিদাসের। সে সংসার-বিবাগী হয়ে কোথায় কোন্

গুহায় বসে ধ্যান করবে—না কোন্ ঘটনাচক্রে পড়ে এই বিপত্তি। হয়ত ভারতবর্ষের তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে—লোকালয়ের মানুষের সংস্পর্শে এসেই হয়ত এই দুর্ভোগ।

রাতুলের মনে পড়লো—হরিদাসকে লেখা সেই চিঠিগুলো। কোথায় কোন্ সেই বাঙলা দেশের এক গ্রামের একটি মেয়ে। নাম তার শৈল। বছরের পর বছর চিঠি লিখেই চলেছে তার পল্টুদাকে। পল্টুদার চিঠি হয়ত কোনও দিনই সে পাবে না। সেই তার বুড়োশিবের মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়ত কোনও কাজেই লাগবে না আর। তবু একজন বৃদ্ধা আর একটি মেয়ে হয়ত হরিদাসের পথ চেয়েই বসে থাকে আজো···। হয়ত এডেনের মা-আলা রোডের ওপারে ভবতোষবাবু এখনও আশা করে—রাতুল একদিন ফিরবে। ফিরে বর্মায় হরিদাসের দাদামশায়ের উইল করে যাওয়া দু'লক্ষ টাকার সম্পত্তি হরিদাস সেজে আদায় করে নেবে। হয়ত মনে আশা আছে—সেই দু'লক্ষ টাকা যে-ই নিক্, তার কিছু অংশ দেবে ভবতোষবাবুকে। একদিন ভাইদের সংসার থেকে যে-মানুষটা বেরিয়ে এল পৃথিবীর পথে—এক স্নেহনিবিড় ঘর বাঁধবে বলে, সে ঘর সে বাঁধলো যেখানে সেটা হয়ত মাটি নয়, বালির চর। নিজের দেশ নয়, নিজের পৃথিবী নয়। তবে বন্ধু বলে সঙ্গে যাকে নিয়েছিল—সে-ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন।

এবার হয়ত রাতুলের যাত্রা শেষ। পৃথিবী পরিক্রমার পর আজ যখন সে নিজের কোঠরে এসে প্রবেশ করতে চলেছে, তখন আরও একজনকে তাঁর মনে পড়লো। সে ভোম্বল। ভোম্বল কাকে খুঁজে বেড়াবে সারা জীবন?

সে কি তার—মা?

ভোম্বল কোন্ আদর্শ নিয়ে অনির্দিষ্ট যাত্রা করেছে?

সে কি তার—ম্যাজিক?

ওর মা'র পেছনে ধাওয়া করা যেন একদিন শেষ হয় হে ঈশ্বর!

আর ম্যাজিক?

ইন্দ্রজালের মোহও যেন একদিন ঘুচে যায় ওর।

রাতুল আস্তে-আস্তে দরজা খুলে বাইরে এল। সারা বারান্দাটা অন্ধকার। বারান্দার ওপর দিয়ে পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাতুল। তারপর ভেজানো দরজাটা নিঃশব্দে খুলে বাবার ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো।

বাইরে কা'দের কথাবার্তার শব্দে রাতুলের ঘুম ভেঙে গেল। একজন

বলছে—শুনলাম কিনা বাবুর ছেলে ফিরে এসেছে—খবরের কাগজেও দেখলুম কাল, তাই দেখতে এলুম—ব্যাপারটা সত্যি কিনা—

রাতুল সেই দরজা-বন্ধ ঘরে চারদিকে চোখ মেলে দেখলে। কাল সে রাত্রে এই ঘরে ঢুকে লুকিয়ে-লুকিয়ে যা' কিছু দেখেছে, সব মনে করতে চেষ্টা করলো। স্বপ্ন তো নয়। সত্যিই। বাইরের দরজার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো উঁকি দিচ্ছে। তবে কি দিন হয়ে গেছে। রোদ উঠছে নাকি! বেলা হয়েছে। কী সর্বনাশ! কখন সে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়েছে জ্ঞান ছিল না। আধা-স্বপ্ন আধা-জাগরণের মধ্যে দেখা গত-কালের সমস্ত ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠতে লাগলো। সেই ভবতোবাবুর বন্ধু হরিদাস! কোথায় গেল সে। সেই ক্ষিতীনবাবু আর. তার বাবা—প্রফেসর নিত্যানন্দ সেন! তাঁরাই বা কোথায় গেলেন।

এবার আর একজন ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—আমিও দেখলাম কাগজে—ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে মিটিং হবার কথা ছিল, সে মিটিংএও নিত্যানন্দবাবু যান্‌নি, তাঁর ছেলে ফিরে এসেছে বলে…

প্রথম ভদ্রলোক বললেন—আমিও তাই ভাবলাম যে সেই ছেলে যদি ফিরেই এসে থাকে তো আমি—আমি ছেলেকে ঠিক চিনতে পারবোই—আট-দশ বছর আগে দেখেছি—যখন এ-বাড়িতে আসতুম, আমার কোলে চড়ে কত বেড়িয়েছে—আর এতদিন পরে যত বড়ই হোক—দেখলে চিনতে পারবো নিশ্চয়ই—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন—আমিও সেই চাকরি নিয়ে কলকাতা ছেড়েছি—আর তো আসা হয়নি এদিকে—বড় মন খারাপ ছিল ওই ব্যাপারে—এক-মাত্র ছেলে মারা গেলে প্রাণে যে কী হয়, যে বাপ হয়েছে সে-ই বলতে পারে—

প্রথম ভদ্রলোক বললে—ও গোবিন্দ শুনে যাও—

গোবিন্দ বললো—আজ্ঞে যাই—এই ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েই যাচ্ছি—

খানিক পরে গোবিন্দ এল। বললে—আর একটু বসুন—এই এলেন বলে—

—কতক্ষণ গেছেন?

গোবিন্দ বললে—এই আধঘণ্টা হলো—তা' আমার বাবুর ইচ্ছে ছিল না আজ্ঞে, থানা পুলিসদের বাবু পছন্দ করেন না তো, কিন্তু ক্ষিতীনবাবু ধরে বসলেন, ওর এক বন্ধু আছেন, পুলিসের বড় চাকরি করেন—সেখানে নিয়ে যাবেনই—ক্ষিতীনবাবু নিজে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির, বললেন—যেতেই হবে তোমাকে—তুমি মন খারাপ করে থাকলে চলবে না—

—আর তোমার খোকাবাবু?

—তাকেও নিয়ে গেলেন মোটরে তুলে।

—তাকে তো তুমি ছোটবেলা থেকে নিজে মানুষ করেছে—তুমি যেমন চিনবে এমন আর কেউ চিনবে না, তা' তোমার কী মনে হয়? ওকি তোমার খোকাবাবু সত্যি-সত্যিই—

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে আপনারা বাবুর পুরোন ছাত্র সব, ভালোমানুষ লোক। বলুন তো আজ্ঞে, আমি চিনবো না তো কে চিনবে? আমিই তো প্রথম কালীঘাটে দেখে আসি, বাবুকে এসে খবর দেই, তারপর ক্ষিতীনবাবু এলেন খবর দিতে—তা' বাবুর বিশ্বেসই হয় না। বললেন—তোর চোখ খারাপ হয়েছে গোবিন্দ, তুই চশমা নে—হ্যান্-ত্যান্—কত কী—কী বলি বলুন তো বাবু, আমার হলো চোখ খারাপ—তো আপনাদের দেখেইবা চিনলাম কী করে?

—তা' তো বটেই, তুমি না চিনবে তো চিনবে কে?

আজ্ঞে তাই বলুন আপনারা, আমি তাই বললাম—খোকাবাবু কামিখ্যে গিয়ে মন্তর নিয়ে ওমনি হয়ে গেছেন—এখন কি আর সেপাই-পুলিসের কম্ম—এখন ওঝা ডেকে ঝাড়াতে হবে তবে ঘাড় থেকে ভূত নামবে—তা আমার কথা কেউ শোনে না আজ্ঞে—

—তা' তোমার বাবু এখন কী বলছেন?

—কিছুই বলছেন না হুঁজুর—কাল সারা রাত উপোষ, কিছুই খেলেন না, অতগুলো ভাত তো নষ্ট করতে পারি না, ভাত হলো মা-অন্নপূর্ণা—খোকাকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছিলুম—আর আমি সেই দু'জনের ভাত খেয়ে মরি—পেটটা দম্‌সম্ মেরে আছে—বুড়ো বয়েসে অত খাওয়া সহ্য হবে কেন—সকাল থেকে এখনও হাতের জল শুকুচ্ছে না—বাড়িতে একে ওই বিপদ, তার ওপর আবার আমার এই বিপদ—

—তা তোমার খোকাবাবু কী বলছেন?

—তার মুখে কথা বার করে কার সাধ্যি? কথা বলবার কি ক্ষমতা রেখেছে—মন্তর-তন্তর করে মাথার দফাটি সেরে দিয়েছে একেবারে—খোকাবাবুরও কি কম নাকাল চলছে কাল থেকে—

ভদ্রলোক দু'জন বললেন—তা' হলে বাড়িতে খুব বিপদ চলছে বলো?

—বিপদ বলে বিপদ বাবু, কাল রাত্তিরে লোক ছেঁকে ধরেছিল বাড়ির বাইরে—সকলকে ঠেকিয়ে রেখেছে এই একা গোবিন্দ শর্মা—তারপর ভোর হতে না হতে খবরের কাগজের লোক, বাইরে লোক, লোকের যেন আর কামাই নেই—এই দেখুন না, এই একগাদা 'তার' এসেছে বাবুর নামে—কে যে কোন দিকে দেখে, আমি একলা মানুষ—বাজার করবো, রাঁধবো, বাসন মাজবো না ভাববো—তার ওপর আবার আমার এই পেটের···আচ্ছা

আপনারা বসুন, আমি আবার উনুন খালি রেখে এসেছি, কয়লাগুলো জ্বলে যাচ্ছে—কয়লার যা দাম—

গোবিন্দ চলে গেল। ভদ্রলোক দু'জন বসে গল্প করতে লাগলো।

একজন বললেন—কী কাণ্ড বল দিকিনি ? যদি প্রমাণ হয় যে এই ছেলেই ওর আসল ছেলে রাতুল—তা'হলে কী হবে বলো তো ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন—সত্যিই, তা'হলে সমস্যার কথা।

প্রথম ভদ্রলোক বললেন—শুধু সমস্যার কথা, ভয়ের কথা—অথচ আমরা সবাই চাই যে ছেলে তাঁর ফিরেই আসুক—রাতুলের বেঁচে থাকার খবরটা যেন সত্যি হয়—

—কিন্তু উল্টোদিকের কথাটা ভেবে দেখো—মাস্টার মশাই-এর অবস্থাটা কী হয়। এই এত যশ, নাম, ডিগ্রি, টাকা, বই লেখা, প্রতিষ্ঠা—সব ওই ছেলের মৃত্যুর ওপর ভিত্তি করে—ছেলে যদি সত্যিই ফিরে আসে, তখন এতদিনের সব কিছু যে ধূলিসাৎ—

রাতুল বন্ধ ঘরের ভেতরে চুপ করে এতক্ষণ সমস্ত কথাবার্তা শুনছিল।

না আর নয়। এবার তাকে সামনে এগিয়ে এসে নিজের কাজ করতে হবে। প্রথম হরিদাসের মুখোসটা খুলে দিতে হবে। যা'কে নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক, কল্পনা-জল্পনা, যাকে নিয়ে এত পুলিস-[illegible] হচ্ছে, তাকে প্রকাশ করে দিতে হবে। অযথা মাঝখানে পড়ে তার হয়রানি। বেচারী কোথায় সংসার-সমাজ সব ছেড়ে ঈশ্বরের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করেছে, ঘটনার বিচিত্র আবর্তে পড়ে তার এ কী বিপদ ! হরিদাসকে উদ্ধার করলে—সবাই উদ্ধার পাবে ! বাবাও শান্তি ফিরে পাবে।

দরজার ফাঁক দিয়ে রাতুল একবার উঁকি মেরে দেখল।

পাশের ঘরে বসে সেই দু'জন ছাত্র আবার নিজেদের মধ্যে তখনও আলোচনা চালিয়েছে। বাইরে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় আস্তে-আস্তে এসে দাঁড়াল রাতুল ! এখান থেকে একটু নিচু হলে রান্নাঘরের ভেতরটা দেখা যায়। রান্নাঘরে গোবিন্দ নেই। তবে নিশ্চয়ই কল-ঘরে। কাল দু'জনের ভাত পেট ভরে খেয়েছে—শরীর খারাপ হয়েছে। ঘন-ঘন কল-ঘরে যাচ্ছে ; সিঁড়িতে একধাপ নেমে দেখলে উঠোনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের কল-ঘরটার দরজা বন্ধ বটে। ভেতর থেকেই বন্ধ মনে হচ্ছে। বাইরেও শেকল খোলা।

এই সুযোগ। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রাতুল। সকলের দৃষ্টির আড়ালে হঠাৎ নিজেকে অদৃশ্য করে নিঃশব্দে দরজা খুললে। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করতে যাচ্ছিল রাতুল, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে দেখতে গিয়ে দেখলে—গলির মুখে একটা মোটর ঢুকছে। হুড্‌খোলা

মোটর। দিনের আলোয়, দুপুরের সূর্যের তলায় স্পষ্ট দেখা গেল—গাড়ির মধ্যে ক্ষিতীনবাবু, বাবা আর নেড়া-মাথা গেরুয়া পরা চেহারা—হরিদাস।

এক নিমেষে গলির উল্টোদিকে মুখ করে চলতে লাগলো রাতুল।

আজ এখনি হরিদাসের ব্যাপারটার একটা সমাধান করতে হবে। হরিদাসের সমস্যাটা মিটলে—তখন রাতুল নিজের কথা ভাবতে পারবে।

পেছনে মোটর থামার শব্দ হলো একবার। পেছনে ফিরে না চেয়ে, রাতুল সোজা শম্ভুনাথ লেন-এর উল্টোদিকে চলতে লাগলো।

এ-রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে রাতুল ভবানীপুর পোস্ট অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। রাতুল ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর 'টেলিগ্রাফ' লেখা কাউন্টারের সামনে এক ভদ্রলোককে বললে—টেলিগ্রামের ফরম্ দিন তো—

ভদ্রলোক ফরম্ দিলেন।

রাতুলের হঠাৎ মনে পড়লো—কলমও তো তার নেই—

—আপনার কলমটা একবার দেবেন দয়া করে ?

ভদ্রলোকের বোধ হয় কলম দেবার অবসর ও ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। একহাতে করে টরে-টক্কা করছেন, অন্যদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন···কলম এখানে ঝুলছে···নিন্ ··

অনেক খুঁজে পেতে রেলিং- এর একধারে একটা ভাঙ্গা নিব-ওয়ালা কলম দড়িতে বাঁধা ঝুলছে-দেখা গেল। তার পাশেই লোহার বিরাট হাঁ-মুখ দোয়াতও একটা। ভূষো কালি। তা হোক। ভাগ্যিস, ভোম্বল সেই দশটাকার নোটটা দিয়েছিল তাকে। ভোম্বলের ওপর কৃতজ্ঞতায় রাতুলের বুকটা ভরে উঠলো। হরিদাসের ফয়সলাটা হয়ে যাক, তারপর রাতুল আত্মপ্রকাশ করে বাবাকে বলে তার একটা ভালো চাকরি করে দেবে।

ভদ্রলোক ফরম্খানা নিয়ে অক্ষরগুলো বার দুই গুণে দেখলেন।

বললেন—টাকা এনেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আরো দুই বার অক্ষরগুলো গুণে দেখে বললেন—আপনার লাগবে পাঁচটাকা তেরো আনা—ওই ওখানে স্ট্যাম্প বিক্রি হচ্ছে—কিনে এইখানা এঁটে লাগিয়ে দিন—

তারপর···তারপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুরের মধ্যে খিদিরপুর ডকের ভেতরে খুঁজে-খুঁজে বার করলে ভোম্বলদের জাহাজখানা! বড়-বড় অক্ষরে জাহাজের গায়ে লেখা রয়েছে—NEPTUNE জলদেবতা—

ভোম্বলও আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে— কীরে ? হঠাৎ তুই ?

—কেন ? আসতে নেই ?

—না, তা কেন, বেশ করেছিস্—এইনে' চিনেবাদাম খা—

পকেট থেকে চিনেবাদাম বার করে দিয়ে ভোম্বল বললে—তোর কথাই ভাবছিলাম একটু আগে, তুই অনেকদিন বাঁচবি—তোর শরীর খারাপ নাকি ?

—না,··· তোদের জাহাজ আর ক'দিন এখানে থাকবে রে ?

—এই বড় জোর তিন কি চারদিন—

—এই তিন-চারদিন তোর এখানে থাকবো—থাকতে দিবি আমাকে ?

ভোম্বল আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কেন ?

—সে কথা জিগ্যেস করিস্ নি—এখন কিছু খাওয়া আমাকে, কাল রাত্তিরে কিছু খাওয়া হয়নি—

ভোম্বল বললে—তা দিচ্ছি—কিন্তু আমি ভাবছি···

রাতুল বললে—থাকতে এলুম—দিবিনে থাকতে তোর কাছে ? এই দু'তিন দিনের জন্যে বড় জোর—

ভোম্বল কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—থাক তুই, তার জন্য কিছু নয়, কিন্তু কেন ?

—সে যে কেন তা তুই এখন জিগ্যেস করিস্ নি, একদিন সময় হলে সব বলবো তোকে, এতদিন একসঙ্গে কাটালুম, একবার আমার নামটাও জিগ্যেস করিস্নি তুই, আজও তাই জিগ্যেস করতে বারণ করছি—কেন নিজের বাড়ি ছেড়ে তোর কাছে ফিরে এসেছি ! তিন-চারটে দিন থাকতে দে তোর কাছে—

ভোম্বল কী যেন ভাবতে লাগলো। রাতুল বললে—তোর পায়ে পড়ছি ভোম্বল, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তোর—

ভোম্বল বললে—কিন্তু জাহাজ যদি তার আগেই ছাড়ে ? তখন কী করবি ?

—কবে ছাড়বে তোদের জাহাজ ?

—ঠিক নেই, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যেই।—

রাতুল বললে—সেই দু'তিন দিনই তো থাকি—তার আগেও অবিশ্যি আমার কাজ হয়ে যেতে পারে—আর একটু কষ্ট কর, আর অন্ততঃ দু'টো দিন।

দুটো দিন !

ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। চারিদিকে শুধু জল, ডেক, ক্রেইন আর কয়লা। কড়-কড় শব্দে ক্রেইন নামছে। আবার উঠছে। অন্ধকারে ডেকের তলায় নিয়ে গেল ভোম্বল। ছোট একটা প্যাকিং বাক্স দেখিয়ে দিয়ে বললে—এই-খানে বোস্ তুই—দেখি মহারাজকে বলে, ভাঁড়ারে কিছু খাবার-দাবার আছে কিনা।

ক্রমে রাত হলো। আলোর মালা পরে সমস্ত ডক্ যেন নতুন করে সেজে উঠলো। আর কতদিন! কতদিনকার প্রতীক্ষা! জাহাজের অন্ধকার ডেকের ওপর বসে রাতুল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অসংখ্য তারার ভিড়! একটা তারা বুঝি খসে পড়ল। পড়তে-পড়তে অনেক দূর নিচেয় নেমে এসে কোথায় শূন্যে হারিয়ে গেল ঠিক নেই। হঠাৎ মনে হলো অনেক উঁচু দিয়ে যেন একটা তারা সোজা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলেছে। ওটা কি তারা, না এরোপ্লেন। আসছে বহু দূরের বার্তা নিয়ে। অজানা পৃথিবীর রহস্য উন্মোচন করবে ও।

এডেন-এর সেই বন্দরে এতক্ষণ কি উটের পিঠে চড়ে ডাক-পিওন চলেছে? না সাইকেল, কিম্বা জিপ্-গাড়ীতে চলেছে আরবী পিওন। চায়ের দোকানে এখনও কি তেমনি রেডিও চলছে আজও। রাত কত হলো এখন। ভবতোষবাবুর কি বাঙলা গান শোনার সময় হলো!

টেলিগ্রামটা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। হঠাৎ টেলিগ্রামটা পড়ে একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে বৈকি। হয়ত ভাববে— কোথা থেকে কে তাকে টেলিগ্রাম করে বসলো। এতদিন পরে হঠাৎ হরিদাসের খোঁজ পাওয়ার আনন্দে হয়ত সেই মুহূর্তেই বন্ধ করবে দোকান। বলবে—আজ তোমাদের সব ছুটি ভাই—বন্ধ করো দোকান—সব ঘরে যাও—

কর্মচারিরা বলবে—খদ্দেররা সব ফিরে যাবে যে—

—যাক্ গে ফিরে—দরকার নেই দোকানের। হরিদাসকে পাওয়া গেলে দোকান নিয়ে কী হবে। অমন একশোটা দোকান চালাবে ভবতোষবাবু।

হয়ত এতক্ষণে ভবতোষবাবু জাহাজের সন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু যদি এরোপ্লেন পাওয়া যায়—তাইতেই বোধহয় আসবে ভবতোষবাবু। তাড়াতাড়ি আসবার জন্যেই তো লিখেছে রাতুল।

রাতুলের ঘুম আসে না। ডেকের অন্ধকারে বসে নিজের ভাগ্য নিয়ে ভাবতে ভাল লাগে। বেশ মজা হবে। এতবড় একটা নাটকের প্লট জমে ছিল তার জীবনে কে জানতো। কিন্তু সবে তো এখন চতুর্থ অঙ্ক—এর পর যখন পঞ্চম অঙ্কের শুরু হবে, তখন দেখা যাবে—স্টেজের ওপর হাজির হয়েছে ভবতোষবাবু। জাল-রাতুলকে দেখিয়ে বলেছে—এ যে আমার বন্ধু হরিদাস—এর জন্যে এতদিন ধরে কত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছি—এর নাম রাতুল কোনও কালে নয়—আমি আমার বন্ধুকে পেয়ে খুশী হয়েছি আজ—কিন্তু ডাক্তার নিত্যানন্দ সেনকে অতি দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে—এ তাঁর ছেলে নয়—

পঞ্চম অঙ্ক। সেই পঞ্চম অঙ্কের শেষ যবনিকা পড়বার আগে রাতুলের আবির্ভাব হবে। নতুন করে পুনর্জন্ম নেবে রাতুল সেন—কেস নম্বর ৪৯।

অন্ধকার ডেকের ওপর বসে সেই দিনটার জন্যে রাতুল মুহূর্ত গুণতে লাগলো। পাশে ঘুমোচ্ছে ভোম্বল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। হঠাৎ হাউ-মাউ শব্দে কেঁদে উঠলো ভোম্বল। নিজের কান্নার শব্দে নিজেই জেগে উঠেছে। বললে—ভারী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম রে—

রাতুল জিজ্ঞেস করলে—কিসের স্বপ্ন ?

—বড় খারাপ স্বপ্ন ভাই, মনে হলো, তুই যেন ডুবে গেলি···

হাসলো রাতুল। বললে—কেন—ডুববো কেন ?

ভোম্বল বললে—স্বপ্ন মিথ্যে, কিন্তু···মনে হলো সমুদ্রে আমাদের জাহাজটা হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেছে—সবাই জলে ভাসছি, চারদিকে হাঙর আর কুমীর—অনেক দিন ধরে ভাসতে-ভাসতে চলেছি তুই আর আমি—শেষকালে একটা জাহাজ এসে আমাদের তুলে নিলে—কিন্তু ফিরে দেখি তুই নেই—ভালো করে চেয়ে দেখি, তুই তখনও জলে ভাসছিস্। সবাইকে বললাম··· ওকে তোল···ওকেও তোল। কেউ শুনলে না, ওরা বললে—ও মরে গেছে। মনে হলো সবাই মিথ্যে কথা বলছে। তোকে বাঁচাবার জন্যে আমি জলে ঝাঁপ দিলুম···কিন্তু কোথা থেকে একটা মস্ত ঢেউ এল···সঙ্গে-সঙ্গে আমি হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠলুম···

রাতুল ভোম্বলের কথা শুনে হেসে উঠলো আবার। বললে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলে গেছেন—স্বপ্ন মিথ্যা—

—তা-তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু নিজের বাড়ী ছেড়ে কেন তুই এখানে এলি—সেটাই বুঝতে পারছিনে আমি—

—আর দু'তিনটে দিন সবুর কর—সব জানতে পারবি—বলে সেই খোলা আকাশের নীচে তারাদের মুখোমুখি ডেকের ওপর শুয়ে পড়লো রাতুল।

সকালবেলার খিদিরপুরের ডক এলাকা। রাত থাকতে বাঁশী বাজে। ভোর হবার আগেই সকাল হয়। কাজ আরম্ভ হয় ঘুম ভাঙবার আগেই।

ভোরবেলা খবরের কাগজটা পড়েই হো-হো করে হেসে উঠলো রাতুল।

হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। পাশ দিয়ে হনহন করে কে যেন যাচ্ছিল। চোখ চাইতেই রাতুল দেখল—গুদামবাবু—

গুদামবাবু চলতে-চলতে বলছেন—ঝকমারী হয়েছে গুদামের কাজ করা—এক কাজ করতে-করতে আর এক কাজের ডাক—

ব্যস্ত হয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। রাতুল আবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। কাগজে বাবা বিবৃতি দিয়েছেন। লম্বা বিবৃতি।

বাবা লিখেছেন ঃ আমি আর একবার প্রমাণ করিলাম মৃত্যুর পর আমরা ওপারে ঠিক এপারের মতই বাস করি। শুধু জড়দেহ থাকে না বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারি না। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর আমরা আত্মাকে ইচ্ছামত এপারে আহ্বান করিতে পারি, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি, এমন কি তাহাকে দেখিতে পর্যন্ত সমর্থ হই। আমার এ-কথা আরব্য উপন্যাস নয়—যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহারাই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া হরিদাস ঘোষ নামক একটি বালককে আমার পুত্র বলিয়া চালাইয়া দিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—লোক-চক্ষে আমাকে হেয় এবং মিথ্যাবাদী ভণ্ড বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। জগতে সমস্ত ধর্মগত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, প্রত্যেক মানবের জড়দেহের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম দেহধারী এমন একটা জিনিস আছে যাহা অমর, যাহার বিনাশ নাই—এই অমর জিনিসকেই আত্মা বলা হয়—যাহা হউক, যাহারা আমার অনুরাগী তাঁহারা নিশ্চয়ই এই মিথ্যা প্রচারে ভুলিবেন না, বা ভুলেন নাই। যাহাকে 'রাতুল' বলিয়া হাজির করা হইয়াছিল, তাহার বন্ধু ভবতোষ মিত্র সুদূর এডেন হইতে আসিয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন—আজ সকলকে সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করি। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য পেশ করিবেন—এবং আশাকরি এবার আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, আমি যাহা এতদিন ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছি তাহা সমস্ত সত্য। আমার পুত্র জড়দেহ ত্যাগ করিয়া এখন সূক্ষ্ম-আত্মা লইয়া পরলোকে বাস করিতেছে—ইহাই সত্য। তাহা না হইলে আমার এতদিনকার সাধনা, গবেষণা, বিদ্যা-বুদ্ধি সমস্ত মিথ্যা—ইত্যাদি-ইত্যাদি—

পড়তে-পড়তে রাতুলের আবার ভীষণ হাসি এল। সত্যিই যখন এবার সে নিজে আত্মপ্রকাশ করবে, তখনই চূড়ান্ত যবনিকা পড়বে—তার নাটকের শেষ অঙ্কে। অনেক পথ চলার পর, এবার চলার পথের শেষ মিলবে। কোথায় যে যেন কোন্ বইতে পড়েছিল—আবার সেই কথাটা মনে পড়ল তার; পৃথিবী গোল—সে গোলাকার পৃথিবী, ভূগোলের পৃথিবী; মানুষের পৃথিবী বড় বন্ধুর, বড় চড়াই-উৎরাই, এ পৃথিবীতে খানা-খন্দ অনেক, অনেক প্রতিবন্ধক, অনেক দুঃখের পাহাড়, অনেক চোখের জলের সমুদ্র এখানে—

ভোম্বল এল। বললে—তোকে তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে এলাম—

—কী?

…আজ রাত্রে আমাদের জাহাজ ছাড়বে—

—কখন, ক'টার সময়? রাতুল জিজ্ঞেস করলে।

—তা' ঠিক নেই, সন্ধ্যেবেলাও ছাড়তে পারে—আবার রাত দু'টোও হতে পারে।

রাতুল বললে—আজই তা'হলে তোর সঙ্গে শেষ দেখা? আবার কতদিন পরে আসবি?

—তার কি ঠিক আছে। হয়ত আর ফিরেই আসবো না। হয়ত টিম্বাক্টু কিম্বা কিম্বারলিনে নেমে যাবো—আমার কিসের টান বল, তোর মতন নিজের বাবা-মাও নেই, নিজের দেশও নেই। সব জাতই আমার স্বজাত, সব দেশই আমার স্বদেশ···

—আমি চলে যাবার আগে নাম জিজ্ঞেস করবার লোভ হচ্ছে না তোর?

ভোম্বল হাসলো। হাসতে-হাসতে বললে—আমি কাঁদি না কখনও—কিন্তু তুই দেখছি আমাকে না কাঁদিয়ে ছাড়বি না ভাই—

ভোম্বল কথাটা বলেই হঠাৎ ওধারে হনহন করে চলে গেল। আর ফিরে এল না।

বেলা বাড়ছে। কে একজন এসে দুপুরবেলা রাতুলের জন্যে একথালা ভাত দিয়ে গেল। রাতুল জিজ্ঞেস করলে—কার জন্যে? কে পাঠিয়েছে?

—ভোম্বল—বলে লোকটা চলে গেল।

তারপর ক্রমে দুপুর বাড়তে লাগলো। খিদিরপুরের ডকের বাতাসে অনেক কয়লার গুঁড়ো আর গরমের হল্‌কা এসে লাগলো মুখে। একবারও ভোম্বল এল না, দুপুরে একটার ঘণ্টা বাজলো। দু'টোর ঘণ্টা; বাজলো তিনটের। তারপর চারটের। আর অপেক্ষা করা যায় না, ওদিকে মিটিং আরম্ভ সাড়ে পাঁচটায়। আস্তে-আস্তে জাহাজের বাইরে এসে ভোম্বলের চেনা মুখটার জন্যে চারিদিকে চাইতে লাগলো। কিন্তু যে ধরা দেবে না, তাকে ধরতে যাওয়াই বৃথা।

একলা ডক পেরিয়ে এসে ট্রামে উঠলো রাতুল। আর বেশী দেরী নেই। সভায় আসবে বাবা। আর আসবে ভবতোষবাবু। রাতুলের টেলিগ্রাম পেয়েই এসে গেছে। নিশ্চয়ই প্লেনে-এ করে এসে গেছে। আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা হবে। জাল রাতুল তার স্বস্থানে ফিরে যাবে—আর—

বিরাট সভা বসেছে। মাঝখানে বসে আছে নিত্যানন্দ সেন। আশেপাশে আরো অনেক লোক। ভবতোষবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা দিলে।

অনেক কথা বললে। বললে—আপনারা যাকে 'রাতুল সেন' বলে জানেন সে আমার বন্ধু হরিদাস। হরিদাস ঘোষ। এই দেখুন তার ফটো। আমরা

দু'জনে এক গাঁয়ে মানুষ—একসঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম—একসঙ্গে চায়ের দোকান করেছিলাম—

তারপর ভবতোষবাবু সমস্ত ইতিহাস বলে গেল তার। কবে গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়ে, কোথা দিয়ে কেমন করে এডেন-এ গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তারা। তারপর হরিদাসের কেমন সব সময়েই সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ঝোঁক। তারপর একদিন কেমন করে হঠাৎ হরিদাস নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কেমন করে ভবতোষবাবু সমস্ত জায়গা ঘুরেছে। তারপর দাদামশাই-এর দু'লক্ষ টাকার উইলের কথাটাও বললে।

তারপর ভবতোষবাবু বললে—আমি প্রেতত্ত্ব বা পরলোকতত্ত্ব বুঝি না, আমি এসেছি আমার বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে··বর্মায়। যেখানে সে গিয়ে দাঁড়ালেই দু'লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবে·· আর আরও এসেছি একথা বলতে যে এ ভদ্রলোকের নাম রাতুল নয়, প্রফেসর নিত্যানন্দ সেনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই···আমার বন্ধু হরিদাস আপনাদের সামনে নিজেই তার আত্মপরিচয় বলতে রাজী হয়েছে···

সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গেরুয়া কাপড়-পরা হরিদাস এবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় চোখ নীচু করে বললে—আমি হরিদাস ঘোষ আমার নাম রাতুল সেন নয়···আমি সন্ন্যাসী, আমার অন্য কোনও পরিচয় থাকা উচিত নয়···তবু সকলের অনুরোধে আমি আমার পূর্ব-পরিচয় প্রকাশ করলাম···

কিছু শোনা গেল, কিছু শোনা গেল না। তবু চারদিকে তুমুল হাততালি পড়তে লাগলো। সমস্ত সভায় আজ জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে নিত্যানন্দ সেনের বক্তৃতা শোনবার জন্যে। তিনি উঠলেন। আজ তাঁর গলায় আবার ফুলের মালা, আজ তাঁর চোখ আনন্দ-উজ্জ্বল আজ সাফল্যের জ্যোতিতে তিনি ভাস্বর। রাত্রের দুঃস্বপ্নের পর আজ তাঁর নব-জাগরণ হয়েছে। তিনি বললেন ··বন্ধুগণ, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ···

সমস্ত সভায় ছুঁচ পড়লে বুঝি শব্দ হবে ··এমনি নিস্তব্ধতা।

মূককে যিনি বাচাল করেন, পঙ্গুকে যিনি গিরি লঙ্ঘন করতে শেখান, আমি সেই অনন্ত-অনাদি পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।

আবার হাততালি পড়লো।

···মানব সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু দেখেছি, তার মধ্যে ভারতবর্ষের ঋষিদের জ্ঞানরাজ্যে দু'টি বিষয়ের গবেষণার গুরুত্ব সর্বাধিক। আমাদের জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হিসেবে তা' অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলে মনে হয়। সে দু'টি বিষয় হচ্ছে···ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মৃত্যু-রহস্য···

তারপর একে-একে নিত্যানন্দ সেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেদ, বেদান্ত উপনিষদ, ঈশ্বর, ইহলোক—সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা বললেন। যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর দুই পত্নীকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন, তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন—"যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম্।" অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমৃতা না হবো, তা নিয়ে আমি কী করবো! আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই বাণী বারবার নানাভাবে ধ্বনিত হচ্ছে—"কেমন করে সেই মৃত্যুকে এড়ানো যায়।" ইস্‌লাম ধর্মে মৃত্যুকে 'ইন্তেকাল' বলে। এই শব্দের অর্থ 'পরিবর্তন,' এই মতে আত্মার নাশ হয় না। কোরাণ শরীফে আছে, "আমরা এ-জগতে খেলনার মত সৃষ্টি হইনি, আমাদের দেহত্যাগের পর অনন্ত জীবনের আরম্ভ হবে।"

গীতা এ-যুগের মহাবেদ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

অর্থাৎ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। জন্মগ্রহণ না করেও এর অস্তিত্ব থাকে। ইহা সর্বদাই আছে, ইহা জন্মরহিত, নিত্য এবং প্রাচীন, শরীর শেষ হলেও ইহার নাশ হয় না—এই তো গেল আত্মার কথা—

বলে নিত্যানন্দ সেন রুমাল দিয়ে মুখটা মুছলেন—তারপর বললেন—

—আত্মার অস্তিত্বের স্বীকার সম্বন্ধে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মমত বিন্দু-মাত্র ইতস্ততঃ করেনি। কিন্তু আজ আমি দেখাবো—আত্মা শুধু অমরই নয়, আত্মাকে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতেও পারি। আমার পরলোকগত পুত্র রাতুলের কথাই বলি—তার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পর আমি তা'র যে ফটোগ্রাফ তুলেছি, তা-ও আমার সঙ্গে আছে, আপনাদের তা' দেখাবো—তার আগে এখানে হয়ত অনেকে আছেন, যাঁরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না, কিন্তু আজ বোধ হয় তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে রাতুল আজ আর বেঁচে নেই—এ-পৃথিবীতে। পিতার পক্ষে পুত্রশোক যে কত মর্মান্তিক, তা পিতা মাত্রেই অনুমান করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার তোয়াক্কা করে না—আমার পুত্রশোক যত বড় সত্যই হোক—আমার বিজ্ঞান তার চেয়ে আরও বড় সত্য। সেই বিজ্ঞান-লব্ধ সত্যের ভিত্তিতেই আমি আজ বলতে পারি যে, আমার পুত্রের মৃত্যুর বিনিময়ে আমি লক্ষ-লক্ষ-কোটি কোটি পিতার পুত্রশোক দূর করতে…

হঠাৎ বাধা পড়লো। পাশের একটি ভদ্রলোক আচ্‌মকা নিত্যানন্দ সেন-এর কাছে এসে বললেন—এই শ্লিপ্‌টা একটু দেখুন তো স্যার—

নিত্যানন্দ সেন্ বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বক্তৃতা থামালেন। বললেন—এখন না, পরে—

—একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমরা তাকে ভেতরে ঢুকতে দিইনি। বললাম—পরে দেখা করো, সে বললে,—না, এখনই এই শ্লিপ্‌টা দিন ওঁকে গিয়ে—বিশেষ পেড়াপীড়ি করতে লাগলো, মনে হলো বিশেষ জরুরী—

—কই, দেখি—

চশমাটা বার করে স্লিপ্‌টা পড়তে লাগলেন তিনি। ছোট এক টুকরো কাগজ। পড়তে বেশীক্ষণ সময় লাগবার কথা নয়। কিন্তু পড়া যেন আর তার শেষ হয় না। সমস্ত সভার জনসমুদ্রের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। পল, দণ্ড, মিনিট—সমস্ত নিঃশব্দে পার হয়ে চলেছে।

নিত্যানন্দ সেন যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে গেছেন। হঠাৎ মাথায় বজ্রাঘাত হলে মানুষের যেমন হয়—এও যেন তেমনি।

হঠাৎ সোজা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

হৈ-চৈ উঠলো চারদিকে। জল আনো, পাখা, বরফ, ভিড় ছাড়ো, অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠাও। ডাক্তার কেউ আছেন এখানে? সর্বনাশ বাড়ীতে খবর পাঠাও। বাড়ীতে ওঁর কেই বা আছে এক চাকর ছাড়া! তা'হলে কী হবে? কোথায় গেল কাগজটা! ভিড়ের মধ্যে লোকের জুতোর চাপাচাপিতে সে কি আর আছে এতক্ষণ। কে শ্লিপ্‌টা পাঠিয়েছিল—তাকে খোঁজো! কে সে? কেউ তো নেই কোথাও। কে তাকে দেখেছিল? কে শ্লিপ্ নিয়ে এসেছিল? কী সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল কে জানে? ভিড়ের মধ্যে খোঁজা কি সহজ? গেট দাও বন্ধ করে। নইলে পালিয়ে যাবে সে। তাছাড়া পুলিসেও খবর পাঠানো হোক।

নিত্যানন্দ সেন তখনও সেইভাবেই পড়ে আছেন।

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে হলের ভেতর তখন অন্য এক ঘটনা ঘটে চলেছে। বিরাট জনতা। গিজ্ গিজ্ করছে লোক। রাতুল তাদেরই মধ্যে এক জায়গায় একটা চেয়ারে চুপ করে বসে দেখছিল। স্টেজের ওপর আলো জ্বলছে। সেখানে একটি মূর্তিকে লক্ষ্য করে সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। সে মূর্তি তার বাবার। নিত্যানন্দ সেনের। আজ যেন চোখ দিয়ে

তাঁর আনন্দ ঠিকরে বেরুচ্ছে। এ যেন সেদিনের সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন-এ দেখা তার বাবা নয়। সেদিন গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসেছিল বাবা। কারো সঙ্গে কথাটি বলতে দেখেনি তাকে। অথচ আজ—আজ তো তাঁর চরম সার্থকতার দিন! আজ সাফল্যের গৌরবে গরীয়ান। আজ ষড়যন্ত্রের কুট-জাল ভেদ করে স্ব-মহিমায় দেদীপ্যমান।

ভবতোষবাবু বেরিয়ে এল। কিছু বলবেন যেন। কানে গেল না বিশেষ কিছু। ভবতোষবাবুরও আজ আনন্দের সীমা নেই। দু'লক্ষ টাকার সম্পত্তির কিছু অংশ নিশ্চয়ই পাবে। তারপর কথা বললে হরিদাস।

সেই আজন্ম সন্ন্যাসী পলাতক হরিদাস রাতুলের জীবন-নাটকের মধ্যে প্রবেশ করে দুর্ভোগ ঘটিয়ে দিয়ে গেল। এবার আবার রাহুমুক্ত সূর্যের মত সে ভাস্বর করবে রাতুলকে। রাতুলের জীবনে হরিদাস রাহুই তো বটে। সম্পূর্ণ না হোক—আংশিক তো নিশ্চয়ই।

তারপর নিত্যানন্দ সেন বক্তৃতা দিতে উঠলেন—

—মূককে যিনি বাচাল করেন, পঙ্গুকে যিনি গিরিলঙ্ঘন করান—সেই অনন্ত-অনাদি পরমেশ্বরকে প্রণাম করি—

চারিদিকে হাততালি পড়লো। তিনি আবার বলতে লাগলেন—মানব-সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত যত-কিছু দেখেছি, তার মধ্যে ভারতবর্ষের ঋষিদের জ্ঞানরাজ্যে দু'টি বিষয়ের গবেষণার গুরুত্ব সর্বাধিক। আমাদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী হিসেবে তা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলে মনে হয়। সে দু'টি হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মৃত্যু-রহস্য—

রাতুল এক মনে শুনছিল। হঠাৎ পাশের এক ভদ্রলোক বললে—যত সব বোগাস্।

আর একজন পাশে বসে সব শুনছিল। সে বললে—সব না শুনেই আগে থেকে বোগাস্ বলছিস কেন?

—আরে ভাই, বেশী বিদ্যে হলেই বুদ্ধিমান হওয়া যায় না, বিদ্যে আর বুদ্ধি দু'টো আলাদা জিনিস।

—সে কী রকম?

—এই যেমন নিত্যানন্দ সেন, লেখাপড়া শিখেছেন ভদ্দরলোক, কিন্তু যা হলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি হয় তা' হয়নি, কেবল অলৌকিক ব্যাপারের ওপর ঝোঁক, যাকে মানুষের চোখ, কান, নাক দিয়ে বোঝা যায় না।

—কিন্তু এটা তো মানো—There are more things in heaven and earth, Horatio, than your philosophy can dream of—

—ওটা হলো অবিজ্ঞান, যা বলবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বলো।

—কিন্তু বিজ্ঞানই কী সব ? আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিরা হাজার-হাজার বছরের সাধনার ফল দিয়ে যা ··

নিত্যানন্দ সেন তখন সেই কথাই বলছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর দুই পত্নীকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন, তখন মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম"···অর্থাৎ "যার দ্বারা আমি অমৃতা না হবো, তা নিয়ে আমি কী করবো'। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই বাণী বার-বার ধ্বনিত হচ্ছে, কেমন করে সেই মৃত্যুকে এড়ানো যায়···"

ভদ্রলোক আবার বললে···আবার সেই বড়-বড় কথা বলে ধাপ্পাবাজি করবার চেষ্টা···দেখছ ? কংক্রীটের ধার দিয়ে যাচ্ছেন না।

পাশের লোকটি বললে···তোর এ মিটিং-এ আসা উচিৎ হয়নি···এ-জিনিষটা যে অতিপ্রাকৃত জিনিস·· সুতরাং তার আলোচনাও অতি-প্রাকৃত ঘেঁষা হবে তো।

শেষকালে, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ঈশ্বর, ইহলোক···সমস্ত নিয়ে আলোচনা করে বললেন···আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম-মত বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেনি, কিন্তু আমি আজ দেখাবো···আত্মা শুধু অমরই নয়, আত্মাকে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতেও পারি। আমার পর-লোকগত পুত্র রাতুলের কথাই বলি···তার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পর আমি তার যে ফটোগ্রাফ তুলেছি তাও আমার সঙ্গে আছে···আপনাদের আজ তা দেখাবো···

পাশের লোকটি বললে—এইবার, এইবার তোর কংক্রীট তো এসেছে, এইবার তো বিজ্ঞান বোঝাচ্ছেন—

ভদ্রলোক বললে—দাঁড়া শেষ পর্যন্ত দেখি—ওটা বিজ্ঞান কি ম্যাজিক—শেষে মন্তব্য করবো।

পাশের লোকটি বললে—কিন্তু বিশ্বাস না থাকলে বিজ্ঞানকেও ম্যাজিক বলে মনে হবে তোর।

নিত্যানন্দ সেন তখন বলে চলেছেন—এ পৃথিবীতে পিতার পক্ষে পুত্রশোক যে কত মর্মান্তিক, তা' পিতা মাত্রেই অনুমান করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার তোয়াক্কা করে না। আমার পুত্রশোক যত বড় সত্যই হোক—আমার বিজ্ঞান তার চেয়ে আরো বড় সত্য। বিজ্ঞান-লব্ধ সত্যের ভিত্তিতেই আমি আজ বলতে পারি যে, আমার পুত্রের মৃত্যুর বিনিময়ে আমি লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পিতার পুত্রশোক দূর করতে···

ভদ্রলোক বললে—সব হামবাগ্, পুত্রশোক দূর করতে না ছাই, আসলে

পুত্রশোকটা ক্যাপিটাল করে বেশ মূলধন বাড়ানো হচ্ছে—বই বিক্রি হচ্ছে—আসলে এ-পৃথিবীতে স্নেহ প্রেম-দয়া-মায়া সব পণ্য।

—তুই একটা নাস্তিক।

—নাস্তিক হই আর যাই হই, আজ যদি সত্যি-সত্যি এই সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ ঘোষণা করে যে সে রাতুল—আর সে বেঁচে আছে—তা'হলে কী হবে বলো তো?

—যদি সত্যিই তাঁর ছেলে হয়, তা'হলে নিত্যানন্দ সেনও তাকে বুকে তুলে নেবেন।

—কখনো না, আজ আমি বলছি, উনি তা'কে দেখে অজ্ঞান হয়ে হয়ত পড়ে যাবেন, হয়ত আত্মহত্যাও করতে পারেন।

—অসম্ভব—

রাতুল বহুক্ষণ ধরে এদের কথাবার্তা শুনছিল। অনেকক্ষণ ধরেই ঠিক রেখেছিল যে বাবার বক্তৃতা দেবার শেষে সে নিজে গিয়ে নাটকীয় ভাবে আত্ম-প্রকাশ করবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকদের কথাবার্তা শুনে কেমন যেন সে অবাক হয়ে গেল। স্নেহ, প্রেম, মায়া, সবই কি তবে পণ্য। পৃথিবীতে কি ওদের কোনও মূলই নেই। মিথ্যে কথা। খাঁটি মিথ্যে কথা। তার বাবা—সত্যপরায়ণ দার্শনিক। তার মৃত্যুর সম্বন্ধে কোথাও যদি মিথ্যা প্রচার হয়ে থাকে তো তা'র জন্যে বাবা দায়ী নয়। নিশ্চয় অতি ভালবাসার ফলেই এর সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত দিনের পর দিন প্রতি মুহূর্তের চিন্তার জন্যে তাকে স্বপ্নে দেখেন, আর সেই স্বপ্নকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু রাতুলের চেয়ে তার সেই রাতুলের স্বপ্নই কি বেশি প্রিয় হবে। রাতুলের চেয়ে তাঁর যশ, তাঁর অর্থ, তাঁর সুনাম কি বেশি মূল্যবান।

পাশের লোকটি বললে—কোথায় চললেন দাদা?

রাতুল চেয়ার ছেড়ে উঠছিল। বললে—একটু ঘুরে আসি—

বলে সোজা স্টেজের দিকে সে চলে গেল। তারপর এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে লিখলে—

"বাবা, আমি রাতুল, আপনার কাছে আমি আবার সশরীরে ফিরে এসেছি। আমি মরিনি। এবার আর জাল রাতুল নয়, আমি স্মৃতি-ভ্রংশ হয়ে হাসপাতালে অনেক দিন পড়েছিলাম। আবার আমার স্মৃতি ফিরিয়ে পেয়েছি। আমাকে যদি আপনি গ্রহণ করেন তবেই আমি আত্মপ্রকাশ করবো—নচেৎ নয়। আর আমি যে সত্যি রাতুল তার প্রমাণ স্বরূপ এখানে লিখছি যে,

ছোটবেলায় ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটতে গিয়ে আমার বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে গিয়েছিল—সে-দাগটা এখনও আছে। জবাব দেবেন।” ইতি—রাতুল।

তারপর গেটের কাছে একটি লোকের কাছে গিয়ে রাতুল বললে—এটা একটু প্রফেসর সেন-কে দেবেন।

—তিনি তো এখন খুব ব্যস্ত—

—তা হোক, এই বক্তৃতার মধ্যেই ওঁকে দেওয়া চাই—আমি ওঁর বাড়ীর লোক, বিশেষ জরুরী স্লিপ—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভদ্রলোক স্লিপটি নিয়ে ভেতরে গেল। রাতুল উদ্‌গ্রীব হয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে রাতুল। এবার তার বাবা তাকে আর জাল বলে এড়াতে পারবে না। তা ছাড়া ওই আঙুল কাটার ঘটনা তো আর কারো জানবার কথা নয়। পরীক্ষাই হয়ে যাক আজ। স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়া ও-সব কি পণ্যই তবে।

সামনে এসে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি দেখতে লাগলো বাবাকে। নিত্যানন্দ সেন স্লিপটা বিরক্তির সঙ্গে নিয়ে পড়ছেন। ছোট একটুকরো কাগজ। পড়তে বেশীক্ষণ সময় লাগবার কথা নয়। কিন্তু পড়া যেন আর তার শেষ হয় না। সমস্ত সভার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। পল, দণ্ড, মিনিট—নিঃশব্দে পার হয়ে চলেছে। বাবা যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে। হঠাৎ বজ্রাঘাত হলে হলে যেমন হয়—এ-ও তেমনি। তারপর হঠাৎ চিঠিটা পড়তে-পড়তে এক সময়ে নিত্যানন্দ সেন সোজা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন স্টেজের ওপর।

সঙ্গে-সঙ্গে রাতুল বেরিয়ে এল। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না।

সেই সভা, জনতা, জন-কোলাহল সমস্ত ফেলে হঠাৎ দৌড়ুতে শুরু করলো। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না। বাইরে এসে দাঁড়িয়েও যেন ভয় গেল না। কেউ চিনে ফেলতে পারে। এবার এ-পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হবে নিজেকে। সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমার পর যেখানে আশ্রয় চেয়েছিল রাতুল, একটি সামান্য আঘাতে সে-আশ্রয় তার ফুটো হয়ে গেছে। এ-ঘটনার পর এ-সংসারে রাতুলের অস্তিত্বেও আর কোন প্রয়োজন নাই। তার অস্তিত্ব মানে বাবার সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা সব ধূলিসাৎ!

রাতুল ছুটতে লাগলো। এ-পৃথিবীতে নয়—অন্য কোথাও।

দৌড়ুতে-দৌড়ুতে রাতুল যখন খিদিরপুরের ডকে এসে পৌছল, তখন রাত হয়েছে বেশ।

—ভোম্বল, ভোম্বল আছে? খোঁজ করতে লাগলো রাতুল।

ভোম্বল এল। বললে—কথা বলবার সময় নেই, উঠে আয় ওপরে, এখুনি জাহাজ ছেড়ে দেবে রে—

আবার সেই দিগন্ত বিসারী সমুদ্র। সীমাহীন বারিধি। ডায়মণ্ডহারবার পেরিয়ে বঙ্গোপসাগর। আস্তে-আস্তে বাঙলা দেশের গাছ, মাটি, আকাশ মিলিয়ে গেল। তখনও রাতুল চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ওই বাঙলা—তার চেনা পৃথিবী—সমস্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ। শেষ হোক স্মৃতি। আবার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাক্ সে। স্মৃতি-বিস্মৃতির অনেক উর্ধ্বে এক অনন্তলোকে সে চলে যাক্, যেখানে রাতুল বলে কেউ তাকে চিনবে না। রাতুল সেন-এর নাম-গন্ধ কেউ যেখানে শোনেনি। আকাশের সব তারাগুলো রাতুলের অশ্রু-সজল চোখের ওপর বিনিদ্র ইশারা করতে লাগলো সারারাত। সে ইশারার অর্থ জানে রাতুল। বড় সর্বনেশে তার অর্থ! সেই অবাঙ্-মানসগোচর মৃত্যু-তীর্থের দিকেই ওরা ইশারা করছে ওকে!

রাতুল বললে—বুঝেছি-বুঝেছি তোমাদের ভাষা, তোমাদের ইঙ্গিত আর ইশারা! বুঝেছি সব আমি—

সেদিন রেডিওতে শোনা গেল—নিত্যানন্দ সেন সামরিক অসুস্থতার পর আবার এক বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। তিনি এবার প্রমাণ করবেন—সেই দিন সেই সভায় যে ব্যাক্তি তাঁকে স্লিপ পাঠিয়েছিল, সে তাঁর মৃত পুত্রের অশরীরী আত্মা ছাড়া আর কেউ নয়। এবার তাই নিয়েই তিনি আলোচনা করবেন।

এবার আর অজ্ঞাত-কুলশীল, নামগোত্রহীন প্যাসেঞ্জার নয়। এবার টিকিট কাটতে হয়েছে বহুদূরের উদ্দেশ্যে ভোম্বল জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবি?

—অনেক দূর—

—সে-দেশের নাম নেই?

—নামও নেই, ঠিকানাও নেই, সে এক অদ্ভুত দেশ—সেখানে একবার গেলে আর কেউ ফিরে আসে না—

ভোম্বল আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। রাতুলকে দেখে আজকাল যেন সে বোবা হয়ে গিয়েছে। তার বোবা জিজ্ঞাসা সমুদ্রে, আকাশে, জলে, তারায়, সীমাহীন দিকচক্রবালে মাথা কুটে মরে। বলে—হে বিশ্বচরাচরের প্রভু, মহাদেবতা, আলো দাও, অন্ধকার দূর করো—

ভোম্বলের বোবা জিজ্ঞাসার উত্তরে নীলাকাশের অদৃশ্য দেবতা বুঝি আরো বোবা হয়ে যায়। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে—চাঁদ ওঠে, চাঁদ ডোবে—জলের ঢেউ

ওঠে নামে, পাখীরা এ-দিগন্ত থেকে ও দিগন্তে উড়ে যায়—কিন্তু কেউ কিছু কথা বলে না। কেউ আলো জ্বালে না—অন্ধকার যেন আরো নিরন্ধ্র হয়—

জাহাজের প্রতিদিনকার জীবনে আজো সেই কুটিল কলহ চলে। চলে সেই ক্ষমতা-লোলুপ মানুষের বিষাক্ত প্রতিযোগিতা। স্থলের মানুষ জলের জগতে এসেও তা'র স্বধর্ম ছাড়েনি যেন। গুদামবাবু আর মহারাজের ঝগড়া। বড়-ছোটর প্রশ্ন। উচ্চ-নীচের প্রশ্ন। বংশমর্যাদার প্রশ্ন।···অনাদি-অনন্তকাল ধরে যেন এমনি চলবে ওদের। রাতুল দেখে আর হাসে।

এমনি করে একদিন ভারত মহাসমুদ্র পার হয়ে যায় জাহাজটা আবার সেই বহুদিন আগেকার দৃশ্য। এডেন-এর বন্দর! ভেতরের বন্দর থেকে একখানা আরবী বজরা ধীরে-ধীরে বাহির সমুদ্রের দিকে চলেছে। কালো সমুদ্রের জল সূর্যের আলো লেগে একটু চিক্ চিক্ করে।—প্রায়ান্ধকার সমুদ্রের বুকে দূরে হয়ত একটা উড়ন্ত মাছ জল থেকে দশ-বারো ফুট লাফিয়ে উঠে আবার জলে পড়ে গেল। তার পেছনে আর একটা! জেটির গা ঘেঁষে একটা নৌকা আস্তে-আস্তে ছেড়েছে। কোথায় বুঝি কোন দ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে। মাল্লারা তালে-তালে দাঁড় বাইছে আর চীৎকার করে বলছে—"ইয়াহুদি ও আল্লা!" "ইয়াহুদি ও আল্লা!" সকালের ঝিরঝিরে বাতাসে সমুদ্রের বুকে মৃদু ঢেউ দেখা দেয়। একটা জাহাজ তখন হয়ত আরো দূরে দক্ষিণে চলে গিয়ে ভোরের অন্ধকারে কৃষ্ণবিন্দুর মত মিলিয়ে যায়।

দিন আর রাত্রি! রাত্রি আর দিন! শেষে একদিন অবধারিত দিন এল। তখন গভীর রাত। ঢং-ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠলো। তবু ঘুমের ঘোরে যা'র যা'র ডিউটিতে উঠে পড়েছে। মস্ত-মস্ত মাল নামে। ঘটাং ঘট্ শব্দ হয়। জেটির মুখে একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে টিকিট দেখে ছাড়ছে। একজন দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক আসতেই প্রহরী বললে—কোন্ হ্যায় তুম্?

—আমি ভোম্বলের লোক—ছাড়ো—

দাড়িগোঁফওয়ালা লোকটা তৎক্ষণে জেটি পার হয়ে সোজা নারকোল গাছ ঘেরা বালি ভরা বন্দরের ডাঙাতে এসে পৌঁছেছে। তারপর একবার সন্তর্পণে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে অদূরের হাসপাতাল-বাড়ীটাকে লক্ষ্য করে চলতে লাগলো হনহন করে। হু-হু করে হাওয়া আসছে দক্ষিণের কলার বাগানের দিক থেকে। কোনও দিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

ওদিকে জাহাজের ডেকের নীচে ভোম্বলের মাঝরাত্রে কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙতেই পাশ ফিরে চেয়ে দেখলে—কোথায় গেল! সেই বাঙালীর বাচ্চাটা।···কোথায় গেল সে! হয়ত আসবে এখনি ফিরে—ভাবলে ভোম্বল।

ভোম্বল রাতুলকে পয়সার ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার আগে পর্যন্ত সে এলো না। ভোম্বল আবার যেমন ভাবে শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে রইল। মরুক গে! কোথাকার কে! একদিন যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার চলেও গেছে। কেন গেল কে জানে। বাঙালীরা যেমন খাপছাড়া খেয়ালী জাত। সেই বাঙালীর বাচ্ছাই তো! মরুক গে। কেউ কারো নয় দুনিয়ায়—মরুক গে!

হাসপাতালে সেদিন ভোর হলো আবার। রোদ এসে পড়েছে ভেতরে। সকাল বেলার মিষ্টি রোদ। চারিদিকের সমুদ্রের হাওয়ায় দুলছে দরজার পর্দা। ঝলমলিয়ে উঠছে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়া রোদের কাঁচা সোনা। যে-সব রোগী উঠে দাঁড়াতে পারে, তারা ডাক্তার আসার আগেই জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে বাইরেটা। নারকোল গাছের সার যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকে সমুদ্রের শুরু। কালো-কালো জেলেরা চলেছে সার বেঁধে। কাঁধের ওপর রাখা লম্বা একটা বাঁশের ওপর ভারি মাছ ধরবার জাল ঝুলছে। বালির চড়ার ওপর খান কয়েক নৌকা ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

আজ চীনে সর্দার ল্যাং-টোয়াং এসেছে আবার। হাতে হিসেবের খাতা!

—হু—লু—লু—লু—লু—লু—লু—

মুখের ভেতর দুই হাতের আঙুল পুরে দিয়ে ওরা অদ্ভুত ভাবে একটা শব্দ করে। সেই শব্দ এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া—সমস্ত পাড়াটা সচকিত করে তোলে। দলে-দলে সবাই এসে জোটে। সর্দার এসেছে রে—সর্দার এসেছে —সাড়া পড়ে যায় ওদের মধ্যে।

কালো পায়জামা পরা, ছুঁচলো লম্বা গোঁফ চীনে সর্দারের।

ল্যাং-টোয়াং চীৎকার করে—মক্‌ফু পাঁচ লুপিয়া—বিশুখ্ সাড়ে তিন লুপিয়া—ভিরমি, দো লুপিয়া—

হাসপাতালের রুগীরা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে সব। জাহাজ থেকে নামে কাপড়, সিগারেট, তামাকপাতা, চিনি, আরো কত কী। নামে খেলনা, চা, ওষুধ, সাবান যাবতীয় খুচরো মাল। ওঠে কলার কাঁদি, ডালচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, সাবুদানা, আর ওঠে মাছ, চিপ্‌সে শুকনো মাছ।

কর্ণেল ওয়াট্‌সন রোজকার মতন সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। —ও গুলো কী, ওই যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, ওগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি কেন, যতসব জঞ্জাল—

সিঁড়ি দিয়ে না নেমে কর্ণেল সোজা বাঁদিকে ঘুরে এলেন। বাঁদিকে প্রথম মোটা হরফে কাল কালিতে কাঠের ওপর লেখা—"**কেস নম্বর ৪৯**"।

সাইনবোর্ডটা এখনও লাগানো রয়েছে কেন? রোগী যখন পালিয়েছে, তখন আর খালি রেখে লাভ কী। কর্ণেল ওয়াটসন বিরক্ত হয়েছে—

কর্ণেল তারপর নোট বইটা বার করলেন। মোটা চশমার ভেতর দিয়ে পড়তে লাগলেন—'মেডিক্যাল জার্ণালে' তো এই কেসটারই ছবি বেরিয়েছিল। একটা ছবি আর কেস্-এর হিস্ট্রী। একে নিয়েই আমেরিকার মেডিক্যাল জার্ণালে প্রবন্ধ বেরোয়, একে দেখতেই বার্লিন থেকে ডাক্তার সুলজ বার্জার এখানে আসেন আর আমেরিকা থেকে আসেন মেডিক্যাল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার থিয়োডোর ক্লেয়ার। এখনও এর সম্বন্ধে দেশে কিছু রিপোর্ট পাঠানো হয়নি। প্রায় পনেরো বোল দিন হয়ে গেলে। আর কতদিন দেরি করা যায়। এর জন্যে মেট্রনকেই দায়ী করতে হবে।

হঠাৎ মেট্রন মোটা শরীর নিয়ে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে এসে হাঁফাতে লাগলো —স্যার, অদ্ভুত কাণ্ড—

—হোয়াটস্ দ্যাট্—কীসের কী—

—কেস্ নম্বর ৪৯ কে পাওয়া গেছে—আশ্চর্য—

—কোথায়? কী করে পাওয়া গেল তাকে?

—কী জানি, হঠাৎ ঘরে গিয়ে দেখি বিছানায় শুয়ে আছে আগের মতন—

—জিজ্ঞেস করলে কী বলছে ?

—কিছুই বলতে পারছে না স্যার, বললাম—তুমি কোথায় গিয়েছিলে এতদিন ? কী নাম তোমার ? বাড়ী কোথায় ? বাবার নাম কি ?—উত্তর দিলে না। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে শুধু চেয়ে থাকে—

—চলো দেখি—বলে কর্ণেল ওয়াটসন মেট্রনের পিছু-পিছু কেবিনের দিকে চলতে লাগলেন।

আমার ভাই বোনেরা, তোমরা যদি কখনও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ওই দ্বীপটার ওই হাসপাতালে যাও, তো দেখতে পাবে রাতুল সেন আজো ওইখানে এক নম্বর কেবিনে শুয়ে আছে। ওরা ওখানে ওকে 'কেস্‌ নম্বর ৪৯' বলে জানে। ওকে যদি তোমরা জিজ্ঞেস করো—তোমার নাম কী ? তোমার বাড়ী কোথায় ? তোমার বাবার নাম কী ? ও কিছু উত্তর দেবে না, শুধু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তোমাদের দিকে চেয়ে দেখবে। তোমাদের মনে হবে ও বুঝি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কিছুই মনে নেই ওর। কিন্তু তা' নয়। আসলে কিছুই ভোলেনি ও। কিন্তু ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত আবর্তে ও-ছাড়া বুঝি আর অন্য কোন গতি ছিল না ওর। ওই ভাবেই ও পৃথিবী থেকে নিজেকে মুছে ফেলেছে। আর তিলে তিলে মৃত্যু-বরণ করছে! সমস্ত জেনেও ও মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে বলে তোমরা ওকে ক্ষমা করো, ওর জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো, ওকে করুণা করো—এই আমার অনুরোধ!

———

বাঞ্ছারামের ইচ্ছে হলে কিচ্ছু তার অসাধ্য, নাই,
বাব্‌লা গাছে ধরায় কাঁটাল্—কাঁটাল গাছে মাসকলাই।
ইস্কুলে তো পড়িস সবাই বিদ্বের সব জাহাজ শুনি—
একটা করে প্রশ্ন করি—বল তো ন্যাড়া, ক্ষ্যান্ত, ঝুনি,
ছ'মাস ধ'রে উপোস ক'রে কুম্ভকর্ণ বাঁচ্‌তো কিসে?
বল্‌তে পারো—মোনার মামা, বোঁচার কাকা, ঝুনির পিসে?
এই তো সেদিন ইচ্ছে হ'লো—ছিলাম ডুবে নদীর জলে;
সারাটা রাত আয়েস ক'রে সকালবেলা এলাম চ'লে।
সে'বার আমার মামার বাড়ী, ইচ্ছে হ'লো—লাগাই তাগ্‌—
এক ঘুঁসিতে সাব্‌ড়ে এলাম জ্যান্ত গোটা পাঁচেক বাঘ!
যোগেশকে তুই জিগেস্ করিস্—ওদের বাড়ী সেদিন গিয়ে,
এক জালা জল সাব্‌ড়ে দিলাম একটি শুধু চুমুক দিয়ে!
খুব বেশী নয়—এই তো সে'বার—খুব বড় জোর ছ'মাস আগে
আমার সঙ্গে নন্তু খুড়ো গিয়েছিল হাজ্‌রীবাগে।
মস্ত দু'টো জন্তু এসে নন্তু খুড়োর চড়্‌লো ঘাড়ে'
আমিই তা'দের দন্তপাটি উপ্‌ড়ে ফেলি দুই আছাড়ে।
তর্ক ক'রে লাভ কি দাদা, জানে সেদিন সত্য কামার—
বাঞ্ছারামের হস্তে—শুনিস্—কী লাঞ্ছনা পঞ্চু মামার।
তবে যদি বলিস্—সেদিন পট্‌লা পিটে কর্‌লে খুন,
আমি কেন দিই নি দু'ঘা—মুখটি ছিল শুক্‌নো চুণ;
পিট্‌লে, তা' সে বেশ করেছে, পিটেই সে তো কর্‌বে ঘা'ল—
ইচ্ছে হ'লে দেখিয়ে দিতুম—ক'সের ধানে ক'সের চাল।

———

আমরা ছোটবেলা থেকেই বঙ্কাকে ঠাট্টা করে এসেছি। বঙ্কা মানে বঙ্কুবিহারী মুখার্জি। বঙ্কা আমাদের পাড়ার ছেলে। লেখাপড়ার দিকে বঙ্কার বিশেষ ঝোঁক ছিল না। কেবল মাছ ধরে আর লাট্টু খেলে বেড়াতো। আমরা যখন সন্ধ্যেবেলা বই-পত্র নিয়ে সবে পড়তে বসেছি, তখন হঠাৎ বাইরের দিকে জানালায় এসে উঁকি মেরে ডাকতো—এই—

বঙ্কা আমার পিসীমাকে বড় ভয় করতো। চুপি-চুপি বলতো, নাজিদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবি?

বলতাম, না ভাই, পিসীমা বকবে।

আমার কাছেই যে বঙ্কা আসতো, তাই নয়। সব বন্ধুদের কাছেই যেত বঙ্কা। সবাই নানান ছুতো করে তাড়িয়ে দিত তাকে। সকলের বাড়ি থেকেই ছেলেদের বাবা-মা-পিসীমারা বঙ্কাকে দেখলেই তাড়া দিত। বলতো, এই, লেখাপড়া নেই তোর? কেবল খেলা? যা, এখন থেকে চলে যা।

আমার পিসীমা আবার একটু বেশী কড়া ছিল। একেবারে লাঠি নিয়ে তাড় করতো। বলতো, ফের যদি বিলুকে ডাকতে আসবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো—বেরো-বেরো এখান থেকে।

বোশেখ-জষ্টি মাসে গরমের ছুটির সময় আমাদের ফাঁকা গলিটা খাঁ-খাঁ করতো। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে আমরা তখন ঘুমোতুম, কিংবা গল্পের বই নিয়ে পড়তুম। সেই সব দুপুরবেলাও বঙ্কার চোখে ঘুম ছিল না। বঙ্কার যেন বিশ্রামেরও দরকার হতো না। ভোরবেলা থেকে পাড়ায় ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েও যেন তার ক্লান্তি হতো না। কোনোরকমে নাকে-মুখে ভাত

গুঁজে দিয়েই আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো। যে-বাড়িতে যেত, সেখানেই গালাগালি খেত। তাতেও বুঝি তার চৈতন্য হতো না। রাগ করতো না, আবার খোসামোদ করতো যেত যদি কেউ তার সঙ্গে খেলা করে।

অঙ্কের মাস্টার রমেশবাবু ছিলেন বড় কড়া মানুষ। বলতেন, কান ধরে ওঠ্-বোস কর্—কর্ ওঠ্-বোস।

সেই একঘর ক্লাসের ছেলের মধ্যে সকলের সামনে বঙ্কা নিজের কান ধরে ওঠ্-বোস করাব জন্যেও কখনও মুখভার করতে দেখিনি বঙ্কাকে।

আমি বলতুম, কেন মন দিয়ে পড়িস না বলতো? লেখাপড়া করলে তোকে তো আর মার খেতে হয় না।

বঙ্কা বলতো, আমার ভাই লেখাপড়া করতে ভালো লাগে না।

—কিন্তু ভালো না লাগলে চলবে কী করে? পাস না করলে চাকরি পাবি কী করে?

বঙ্কা বলতো—আমি তো তোদের মত ভালো ছেলে নই, আমি কিছুতেই পাস করতে পারবো না—দেখে নিস—

—তাহলে বড় হয়ে কী করবি?

বঙ্কা বলতো—বড় হয়ে কী করবো সে-কথা এখন ভাবতে ভাল্লাগে না—

সত্যিই বঙ্কার যেন আমাদের মত কোনও ভাবনা-চিন্তাই ছিল না। বঙ্কার জন্যে আমরা তার বন্ধুরা যত ভাবতো, তার বিধবা মা যত ভাবতো, তার এক কণাও সে ভাবতো না।

সে বলতো—ভাবার চেয়ে খেলতে বেশী ভাল্লাগে আমার—

তারপরেই একটু থেমে বলতো—চল্ না, কাল ইস্টিশানের পুকুরে গিয়ে মাছ ধরে আসি—

আমি বললুম—না ভাই, আমার পিসীমা জানতে পারলে বকবে—

—আরে, সে তো আমার মা'ও জানতে পারলে বকবে। কাউকে না জানিয়ে গেলেই তো হলো—কাউকে বলিস নি কোথায় যাচ্ছিস। আমি তো আমার মাকে বলি না, আমি কোথায় কখন যাই—

আমার কিন্তু সত্যিই বকুনির ভয় ছিল, মার খাওয়ার ভয় ছিল। লোক-লজ্জার ভয়ও ছিল। লোকে কী বলবে তাই নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম। ফেল করলে লোকে নিন্দে করবে বলেই মন দিয়ে পাস করাবার চেষ্টা করতুম সমস্তই অন্য লোকের মুখ চেয়ে। কিন্তু বঙ্কা বেপরোয়া। ইস্কুলে যেমন মার খেতেও তার লজ্জা এ্যাগজামিনে ফেল করতেও তেমনি তার লজ্জা নেই।

আমরা নিজেদের ভালো দেখাবে বলে ভালো নাপিতের কাছে চুল ছাঁটতুম, ভালো দোকান থেকে সার্ট-প্যান্ট করাতুম, আমাদের পাড়ার সব বন্ধুরাই প্রায়

একই রকম ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতুম। নিজেদের সম্বন্ধে আমরা সবাই কম-বেশি সচেতন ছিলুম। কিন্তু বঙ্কাই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। বঙ্কার খেয়ালই থাকতো না ও সব সম্বন্ধে। চান করার পর চুলটা যে আঁচড়াতে হয়, মুখখানায় যে সাবান ঘষতে হয়, তাও তার জানা ছিল না। বঙ্কা বলতো—তাড়াতাড়ি ইস্কুলে আসবার সময়ে চুল আঁচড়াবার কথা মনে ছিল না—

—তা মুখখানায় সাবান দিতে পারিস না?

বঙ্কু বলতো—সাবান নেই বাড়িতে, একটা সাবান কিনতে হবে এবার—

তারপর বলতো—আর যা কালো রং আমার, সাবান দিলেও বেশী ফরসা হবে না, ও কয়লার এপিঠ-ওপিঠ—

একদিন আমাদের হেডমাস্টারমশাই রজনীবাবু হঠাৎ পড়াতে-পড়াতে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা বড় হয়ে কে কী হবে, ভেবেছো কিছু?

বড় হয়ে আমরা কে কী হবো, তা সেই বয়সেই একটা ধারণা করেছিলুম আমরা। আমি বললুম—আমি বড় হয়ে সাহিত্যিক হবো স্যার—

—সাহিত্যিক?

এ উত্তরটা বোধহয় রজনীবাবু কারোর মুখ থেকে আশা করেননি। তাই প্রথমে অবাক হয়ে পাশের বলরামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি?

বলরাম বললে—আমি এঞ্জিনীয়ার হবো স্যার—

এমনি কেউ বললে এঞ্জিনীয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ কবি, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ মিনিস্টার। সবাই বড়-বড় চাকরি করবে। সবাই বিখ্যাত মানুষ হবে। কেউ ছোট হয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে জন্মায়নি।

তারপর রজনীবাবু বঙ্কুকে জিজ্ঞেস করলেন—আর তুমি?

বঙ্কু এসব কিছুই হয়ত ভাবেনি। জীবনে যে সে কিছু হতে চায়, এটা তাঁর কল্পনার বাইরে বোধহয়। বঙ্কু উত্তর দিচ্ছে না দেখে রজনীবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বড় হয়ে কিছু হবে না?

বঙ্কু হঠাৎ বললে—না স্যার?

—সে কী? কিছুই হবার ইচ্ছে নেই তোমার?

বঙ্কু বোধহয় লজ্জা পেয়ে বললে—ও নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি স্যার—

তা বঙ্কু যে কিছু হবার জন্যে কখনও ভাবেনি, তা আমরা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু হেডমাস্টার রজনীবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন—আশ্চর্য তো—

সত্যিই বঙ্কু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, হতে পারেনি। কারণ হতে চায়ইনি। আমগাছে তো কত বোল হয়। সবগুলো যদি আম হয়ে ফলতো তো গাছ ভেঙে পড়তো আমের ভারে। জীবনে সবাই যদি রাজা হয়, তো প্রজা হবে কে? অথচ প্রজা না থাকলে রাজা হয়ে লাভটা কী?

· যাক গে, অত কথা বঙ্কু বোধহয় কখনও ভাবেনি। অত কথা ভাববার বোধহয় সময়ও ছিল না তার।

কিন্তু আমি ভাবতুম! আমার বড় কষ্ট হতো বঙ্কুর কথা ভেবে-ভেবে। বঙ্কুদের অবস্থা ছিল আমাদের সকলের চেয়ে খারাপ। বঙ্কুরা ছিল পরের গলগ্রহ। বঙ্কুরা দূরসম্পর্কের এক কাকার কাছে থাকতো। তাদের বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করতো বঙ্কুর মা। রান্না করা থেকে জুতোসেলাই, চণ্ডীপাঠ সবই করতে হতো। সকাল থেকে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকতো, তখন আর কোনও দিকে খেয়াল থাকতো না। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে, রাত সব-সময়েই বঙ্কুর মা রান্নাঘরে। কর্তারা কেউ খাবে সকাল ন'টায়, কেউ দশটায়, কেউ বারোটায়, কেউ দু'টোয়। সকলের খাওয়ার তদারকি করতে হবে বঙ্কুর মাকে।

এত যার কাজ, তার বিনিময়ে কিন্তু কিছুই পেত না বঙ্কুর মা। শুধু কর্তারা বঙ্কুর লেখাপড়ার খরচাটা যোগাতো। ইস্কুলের মাইনে, বই-খাতা-পেনসিল কেনার টাকাটা দিত তারা। কাকাদের বিরাট বাড়ি। সংসারে বহু লোক। ছেলে-মেয়ে অনেক। তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। তারা মিশনারী ইস্কুলে পড়তো।' সে ইস্কুলে অনেক টাকা মাইনে। সেখানে শুধু বড়লোকরাই পড়তে পারে। সেখানে বঙ্কুর জায়গা হয়নি, তাই এসেছিল আমাদের দিশি ইস্কুলে। এ ইস্কুলে কম মাইনে। এখানকার ছেলেরা গরিব লোকের বাড়ির ছেলে। এদের বাবারা অফিসে কম মাইনের চাকরি করে। সুতরাং বঙ্কুর কাকারা বড়লোক হলেও আমাদের ইস্কুলেই তার গতি হয়েছিল।

কিন্তু বঙ্কুর বোধহয় গতি হবার কপাল নয়। তার গতি হোক এও বোধহয় সে চাইত না। আমি জিজ্ঞেস করতুম—তুই যে সারাদিন খেলে বেড়াস, তোর মা কিছু বলে না?

বঙ্কু বলতো—মা তো জানতে পারে না—

—কেন, তুই তো মার সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকিস—

বঙ্কু বলতো—তা থাকলেই বা, আমি খেলুম কি খেলুম না, তা দেখবার সময়ও নেই মা'র। মা তো সারা দিন রান্নাঘরে—

—তোকে ভাত কে দেয়?

—হরি, আমাদের চাকর, সে ভাই আমাকে পেট ভরে খেতে দেয় না। ভাত চাইলে বলে আর ভাত নেই—

—তা তুই মাকে বলিস না কেন?

বঙ্কু বলতো—দূর, মাকে বলে দেখেছি, মা কিছু করতে পারে না, শুধু কাঁদে—বলে বঙ্কু হো-হো করে হাসতো।

আমি জিজ্ঞেস করতুম—মা'র কান্না দেখে তোর হাসি আসে কী করে ?

বঙ্কু বলতো—দূর, আমার ভাই ওসব কান্না-ফান্না ভাল্লাগে না—

—তা কী ভালো লাগে তোর ?

বঙ্কু বলতো—শুধু খেলতে—

তা এই বঙ্কাই হঠাৎ একদিন বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠলো। লেখাপড়ায় নয়, খেলায়। ইস্কুলের ক্রিকেট-খেলায় বঙ্কা বেশ নামজাদা খেলোয়াড় হলো একদিন। অদ্ভুত খেলোয়াড়। বরাবর মাছ ধরেছে বঙ্কা আর গুলি খেলে বেড়িয়েছে। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিলে ম্যাচের দিনে। আমাদের ইস্কুলের সঙ্গে ভবানীপুর ইস্কুলের ক্রিকেট খেলায় আমাদের ইস্কুলই জিতে গেল। হেডমাস্টারমশাই বললেন—আরে, বঙ্কা তো বেশ খেলে—

বঙ্কা বাঁ হাত দিয়ে এমন বল ছুঁড়তো, যে বাঘা-বাঘা ব্যাটস্‌ম্যান সব সেই বলে কাত্। বঙ্কার ন্যাটা হাতের বল ছোঁড়া দেখতে কালীঘাট-ভবানীপুর থেকে ছেলেরা আসতো সব। একবার বঙ্কার জন্যেই আমাদের ইস্কুল একটা জার্মান-সিলভারের কাপ পেলে। সেদিন বঙ্কাকে আমরা সবাই কাঁধে তুলে প্রোসেশান করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। বঙ্কার জন্যে আমাদের গৌরব বাড়লো, আমাদের ইস্কুলের সুনাম হলো। হেডমাস্টারমশাই বঙ্কাকে ফ্রী-স্টুডেণ্ট করে দিলেন। তার আর মাইনে লাগলো না পড়তে।

আমরা লেখাপড়ায় বঙ্কার চেয়ে ভালো, কিন্তু তা হলে কি হবে; বঙ্কা খেলার জন্যে আমাদের সকলকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গেল।

তখন আর পড়া-না-পারার জন্যে কেউ কিছু বলে না বঙ্কাকে। তখন এগ্‌জামিনে ফেল করলেও ক্লাসে উঠিয়ে দিতে লাগলেন হেডমাস্টারমশাই।

একদিন শুনলুম মোহনবাগানের এক খেলোয়াড় বঙ্কার খেলা দেখে অবাক্ হয়ে গেছে। সকলকে বলেছে—এ ছেলেটা বড় হয়ে ইণ্ডিয়ার নাম রাখবে—

তারপর বঙ্কাকে বলে গেছে—খুব মন দিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করো—হবে—

হেডমাস্টারমশাইকে সবাই বলতে লাগলো—ছেলেটাকে ইস্কুল থেকে কিছু স্টাইপেণ্ড দেবার ব্যবস্থা করুন—

ফার্স্ট বয়, সেকেণ্ড বয়, থার্ড বয়, সকলের খাতির গেল। খাতির বাড়তে লাগলো বঙ্কার। কিন্তু তবু বঙ্কার কোনও বদল নেই।

আমরা বলতাম—তোর তো এখন খুব নাম রে বঙ্কা—

বঙ্কু বলতো—দূর, আমি অত নাম চাই না—

আমরা বলতাম—এখন কাকারা তোকে খুব খাতির করে আগের চেয়ে ?

বঙ্কা বলতো—না রে, উলটো হয়েছে ভাই, আগে আমাকে মোটে দেখতে পারতো না, এখন আমাকে আর দু'চক্ষে দেখতে পারে না—

আমরা জিজ্ঞেস করতাম—বড় হয়ে আমাদের ভুলে যাবি না তো ভাই ?

বঙ্কা বলতো—আমি বড় হবোই না, তা ভুলে যাবে কিরে ? বড় হলে অনেক ঝামেলা, আমার ওসব ঝামেলা ভাল্লাগে না—

আমরা ভাবতাম, সত্যিই বঙ্কা একদিন হয়তো বিলেতে যাবে ইণ্ডিয়ার হয়ে খেলতে। ইণ্ডিয়ার ক্রিকেট ক্যাপটেন হবে। ব্রাডম্যান, সোবার্স, চ্যাপেল, রিচার্ডস, লয়েড, গাভাসকার পৃথিবীর সব বড়-বড় খেলোয়াড়েরা বঙ্কার সঙ্গে খেলায় হেরে যাবে। রেডিওতে বঙ্কার নাম রিলে করবে—আর পৃথিবীর ঘরে-ঘরে বঙ্কার নাম শুনবে সবাই। পৃথিবীর সব খবরের কাগজে বঙ্কার ছবি ছাপা হবে। তার নীচেয় লেখা থাকবে—ইণ্ডিয়ার বিখ্যাত ব্যাট। বোলার বি, বি, মুখার্জি। অর্থাৎ বঙ্কুবিহারী মুখার্জি।

সেবার আমাদের স্কুল অল্-বেঙ্গল স্কুল-স্পোর্ট্স্-এর ক্রিকেট খেলায় গভর্নরের সিলভার কাপ পেয়ে গেল বঙ্কুর জন্যে। আর একটা গোল্ড মেডেল পেলে বঙ্কা নিজের দলের ক্যাপটেন হিসাবে। বঙ্কু একা চার ওভারে দশটা উইকেট নিয়েছে। ইণ্ডিয়ার স্কুল ক্রিকেট হিস্ট্রিতে এ একটা রেকর্ড!

তখন আমরা ক্লাস টেন-এ উঠেছি। বেশ সাবালক হয়েছি নিজেদের কাছে। হঠাৎ একদিন দেখি বঙ্কু ইস্কুলে আসেনি। বঙ্কু ইস্কুলে আসেনি শুনলে তখন হেডমাস্টারমশাই-এর পর্যন্ত টনক নড়ে।

অথচ সেই দিনই ইণ্টার-স্কুল ক্রিকেট ম্যাচ! সর্বনাশ আর কাকে বলে। হেডমাস্টারমশাই বাড়িতে দারোয়ান পাঠালেন খবর আনতে। দারোয়ান এসে যে-খবর দিলে তা শুনে ইস্কুল-সুদ্ধ সবাই হতভম্ব!

কী হয়েছে ? না, বঙ্কুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার একটা হাত কেটে গেছে।

কোন্ হাত ? না, বাঁ হাত!

আমাদের ইস্কুল-বাড়িটার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলুম সবাই বঙ্কুদের বাড়িতে। বঙ্কুর কাকার দারোয়ান কাউকেই ঢুকতে দিলে না। বললে—সে বাবু হাসপাতালে আছে, হাসপাতালে যাও।

হাসপাতালে গিয়ে দেখি সেখানেও আমাদের ঢোকা নিষেধ। বিকেল চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে রোগীর সঙ্গে দেখা করবার নিয়ম। হেডমাস্টারমশাইও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁকেও ঢুকতে দেওয়া হলো না

ওয়ার্ড-মাস্টার বললেন—রোগী অচেতন এখনও—তবে বিশেষ ভয় নেই—

জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল মশাই ?

ওয়ার্ড-মাস্টার বললেন—একটা ধারালো কাটারি দিয়ে রোগী নিজের বাঁ হাতটা কেটে ফেলেছে—

—কেটে ফেলেছে মানে ?

—মানে, বাঁ হাতটা কনুই থেকে আর নেই—আলাদা হয়ে গেছে—

কী সর্বনাশ। বাঁ হাতটাই যে বঙ্কুর সম্পদ্! ওই বাঁ হাত দিয়ে বল করেই যে বঙ্কু চার ওভারে দশটা ব্যাট্স্ম্যানকে আউট্ করেছে। বঙ্কু যে ন্যাটা বোলার। যা হোক, আমরা রোজ যাই। বঙ্কুকে বিছানায় অজ্ঞান করিয়ে রাখা হয়েছে। সাত দিন পরে একটু জ্ঞান হলো, আমাদের সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। বঙ্কু কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নার্স আমাদের চলে যেতে বললে।

তারপর যখন আরও সুস্থ হয়ে উঠলো, তখন জিজ্ঞেস করলাম—তুই হাতটা কাটতে গেলি কেন ভাই ? কেন এমন সর্বনাশ করলি তোর ?

বঙ্কুর অসুস্থ মুখেও একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

বললে—ওই বাঁ হাতটাই ছিল যত ঝামেলা—তাই দিলুম কেটে ফেলে।

—তা ডান হাতটা কাটতে পারলি না ? তাতে তোর কোনও ক্ষতি হতো না।

—দূর, আমি যে ন্যাটা বোলার, তাই তো বাঁ হাতটা কাটলুম। জীবনে যাতে আর ক্রিকেট না খেলতে পারি, তাই···

আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম—কী হয়েছিল বল্ তো ? কেউ কিছু বলেছিল তোকে ? তোর মা কিছু বলেছিল ?

বঙ্কু বললে—দূর, মা কেন আমাকে বকবে। মা আমাকে দেখতেই পায় না, মা'র সময় কোথায় দেখবার ?

—তা হলে কী হয়েছিল ?

বঙ্কু প্রথমে কিছু বলেনি। আমরা হাজার প্রশ্ন করেছি, কিছুতেই উত্তর দেয়নি। সেই রকম হাসতো কেবল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেও এ প্রশ্নের কোনও জবাব কোনও দিন দেয়নি। তারপর আমরা সবাই পাস করে কলেজে ঢুকেছি। কিন্তু বঙ্কু সেই যে আগে যেমন সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াতো, তেমনি আড্ডা দিয়ে খেলে বেড়িয়েছে। তার সেই কাটা বাঁ হাতটার ওপর থেকে সার্টের হাতটা ঝলঝল করে ঝুলতো। আর পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো বঙ্কু। কিন্তু কোনও দিন মুখ ফুটে কারোর বিরুদ্ধে কোনও নালিশ করেনি।

পরে শুনেছিলাম, বঙ্কুর খুড়তুতো ভাইরা কেউ মানুষ হয়নি বলে কাকারা নাকি খুব অত্যাচার করতো বঙ্কুর ওপর। বঙ্কুর তখন খুব খেলায় নাম হচ্ছে। বহু নামজাদা লোক কাকাদের কাছে বঙ্কুর খেলার প্রশংসা করতো, অথচ কাকাদের নিজেদের ছেলেরা একটাও সাহেবদের ইস্কুলে পড়েও ভালো নাম করতে পারেনি। তাদের ছেলেদের কেউ প্রশংসা করতো না কখনও।

শেষকালে কাকাদের আর তা সহ্য হলো না। আমাদেরই খেয়ে-পরে আমাদেরই গলগ্রহ হয়ে থেকে শেষে কি বঙ্কুটা আমাদেরই মাথায় উঠবে?

একদিন বঙ্কুর মা'র ওপরেই জুলুম শুরু হলো। অকারণে বঙ্কুর মায়ের ওপর অত্যাচার আরম্ভ হলো। একদিন দারোয়ান দিয়ে বঙ্কুর মা'র ওপর বলা হলো—এ কোঠিসে নিকাল্ যাও—

অপরাধ তুচ্ছ। বড় কর্তা নাকি খেতে বসে রান্না খেয়ে থুথু করে ফেলে দিয়েছেন। বলেছেন—এ ছাই-এর রান্না।

আর তারপর থেকেই মা-বেটার ওপর জুলুম। বঙ্কুটা বাড়ির আর পাঁচটা ছেলেকে খারাপ করে দিচ্ছে। বঙ্কুর সংসর্গেই বাড়ির অন্য ছেলেরা মানুষ হবে না। এইসব কথা উঠলো।

শেষ কালে যেদিন বঙ্কুর মাকে বাড়ির দারোয়ান অপমান করলে সেদিন বঙ্কু কাউকে কিছু বললে না। তার খেলার নামের জন্যেই যদি এত অশান্তি তো যে হাত দিয়ে সে ক্রিকেট খেলে নাম করেছে, সেই হাতটাকে আর না-রাখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এই ভেবে সেই রাত্তিরেই একটা ধারালো কাটারি দিয়ে নিজের বাঁ হাতে কোপ দিয়ে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। বঙ্কুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—হ্যাঁ রে বঙ্কু, যা শুনলুম তা সত্যি?

বঙ্কু তখনও সেই রকম টোটো করে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়।

শুনে হোহো করে হেসে উঠলো। বললে—দূর ওসব বাজে কথা—সব বাজে কথা

—তাহলে সত্যি করে বল্ তো বাঁ হাতটা কাটলি কেন সেদিন? আজ যদি তোর বাঁ হাতটা থাকতো তো তোকে আজ এরকম টোটো কোম্পানি করতে হতো না—কত বড় নামজাদা খেলোয়াড় হতিস—

বঙ্কু হেসে বললে—নামজাদা হয়ে লাভ কী বল্ না। বড় হলেই তো ঝামেলা ভাই—নামজাদা হলেই তো আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা সব পর হয়ে যায়—

তারপর একটু থেমে বললে—তার চেয়ে বেশ আছি ভাই, খাচ্ছি, দাচ্ছি টোটো করে বেড়াচ্ছি। কেউ আর আমার ওপর হিংসে করে না—আমি মাকে আর কেউ অপমান করে না—মা কাকাদের বাড়িতে রান্না করে সকলের, আর আমি আড্ডা দিয়ে বেড়াই, আমি কারোর চক্ষুশূল নই—

বলে বঙ্কু যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলে গেল।

আমার তখন কলেজে যাবার তাড়া। বঙ্কুর সঙ্গে কথা বলার সময় তখন আমার হাতে ছিল না। তার দিকে চেয়ে দেখলাম শুধু একবার। বঙ্কুর বাঁ হাতের সার্টের হাতাটা তখনও ঝলঝল করে ঝুলছে। হঠাৎ তার দিকে চেয়ে মহাভারতের একলব্যর কথাটা মনে পড়লো। একলব্য না হয় গুরু দক্ষিণা দিয়েছিল নিজের বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে ফেলে। কিন্তু বঙ্কু কাকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে। কে তার গুরু?

———

# পোড়া মা

দেখতে-দেখতে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এ-রকম অদ্ভুত কাণ্ডের কথা আগে কেউ কখনো শোনেনি। যে শোনে সেই-ই অবাক হয়ে যায়। সবাই ভিড় করে আসতে লাগলো আমাদের গ্রামে।

আমাদের গ্রামের নাম ময়নাডাঙা। ময়নাডাঙা খুব নগণ্য একটা গ্রাম। বামুন-কায়েত মিলে মাত্র হয়ত শ'আষ্টেক লোকের বাস। বেশির ভাগ লোকই গরিব। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে, যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়। আর সবই তপসিলী ভুক্ত শ্রেণীর লোক। একমাত্র খেতে না পাওয়ার দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সেখানে আর কারো কোনও কষ্ট নেই।

একদিন বোম্বাই থেকে আমার মামা চিঠি লিখলেন—তোদের ওখানে নাকি কী এক জাগ্রত পোড়া-মা উঠেছে, তার কাছে নাকি যে যা চাইছে, সে তাই-ই পাচ্ছে—

আমি লিখে জানিয়ে ছিলাম—হ্যাঁ, আমিও তাই শুনছি। এখন ময়নাডাঙায় দূর-দূর থেকে অনেক লোক আসছে, আর মা'র মন্দিরে পূজো দিচ্ছে। আমরা এখনও কেউ মন্দিরে যাইনি, তুমি কোথা থেকে সে-খবর জানতে পারলে? খবরের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে নাকি?

সত্যিই সে এক আজব কাণ্ড।

খবরটা আমরা অনেক দিন ধরেই শুনছিলাম! কিন্তু সে-খবরটা যে বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, তা জানতাম না। আর তা ছাড়া আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ও সব বুজরুকি। কারণ ও-ধরনের অনেক কাণ্ড আগে অনেক জায়গাতেই ঘটেছে, হাজার হাজার লোক সে-খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় করেছে। ঠাকুরের অনেক অলৌকিক কাণ্ডের কথা শুনে সবাই

ভক্তিতে গদগদ হয়ে পুজোও দিয়েছে। দামী-দামী কাপড় দিয়েছে, দামী-দামী গয়না দিয়েছে, গাদা-গাদা টাকার প্রণামীও দিয়েছে। এমন খবরও পেয়েছি যে, সেখানে ঠাকুরের কাছে পুজো দিয়ে নাকি অনেক লোকের সাংঘাতিক-সাংঘাতিক রোগও সেরে গেছে।

তারপর কিছুদিন পরে সে-সব ঠাকুরের কোনও নাম-গন্ধও আর শুনতে পাইনি। তারপর কোনও লোকই নাকি আর সেখানে যায় না। আগে জায়গাটা যেমন খাঁ-খাঁ করতো, এখনও জায়গাটা নাকি আবার সেই রকমই খাঁ-খাঁ করছে আগেকার মতন। এ অনেকটা হুজুগেরই মত।

হুজুগ এ-রকম একদিন আসেও, আবার একদিন সে-হুজুগ চলেও যায়। অনেকটা বন্যার জলের মত। আসতেও যেমন, যেতেও তেমনি।

ময়নাডাঙার এক প্রান্তে একটা বটগাছ বহুকাল ধরেই ছিল। তার নীচেয় ছিল একটা ভাঙা মন্দির। সেই মন্দিরের পেছন দিকে ছিল কুমোর পাড়া। সেখানে তারা চিরকাল ধরে বংশানুক্রমে বাস করে আসছে। তারা নদী থেকে পলি-মাটি এনে মাটির হাঁড়ি কলসী, ঘট, পুতুল, এইসব তৈরি করতো। তার সঙ্গে কুঁজো, বাটি, মালসা, এই সবও তৈরি করতো। আবার বায়না পেলে অন্য-অন্য আরো রকমারী জিনিসও তৈরি করতো তারা।

ওরা ছিল বড় গরিব। বেশির ভাগ দিনই কাজ জুটতো না ওদের। সদরে হাট বসতো ফি রবিবার।

সেদিন গরুর গাড়ি বা ঠ্যালাগাড়ি করে সেই সব মাটির বাসন-কোসন নিয়ে ওরা সদরের হাটে যেত। আগে বিক্রিবাটা তেমন খারাপ ছিল না। যা বিক্রি হতো সেই পয়সায় ওদের সমস্ত হপ্তাটা হেসে-খেলেই চলে যেত।

কিন্তু তারপর মাথা গুণতিতে ওদের সংখ্যাও যেমন বাড়তে লাগলো, আর বিক্রি-বাটাও তেমনি আগের চেয়ে কমতে লাগলো। তা ছাড়া মাটির বাসনের চাহিদাও আগেকার মতন আর তেমন রইল না। তার জায়গায় বাজারে নতুন-নতুন বাহারি বাসন-কোসন আমদানি হতে লাগলো, পেতল-কাঁসা-তামার বাসন আগেও ছিল, কিন্তু সে-সব জিনিস কুমোরদের ভাতে তেমন হাত দিতে পারেনি।

এবার কিন্তু এলো এ্যালুমিনিয়ামের বাসন। এ ভাঙে না, এ দেখতে চকচকে, এ মাজতেও সহজ। মাটির হাঁড়ির অনেক ঝামেলা। মাজা-ঘষা করা যায় না। নাড়া-চাড়া করলেও ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি।

তাতে শুধু শহর নয়, গ্রাম-গঞ্জও ভেসে গেল। গ্রাম-গঞ্জের লোকেরাও তখন মাটির হাঁড়ির বদলে এ্যালুমিনিয়ামের বাসন কিনতে লাগলো। তাতে

প্রথম দিকে একটু বেশি দাম পড়লো বটে, কিন্তু আখেরে লাভ হতে লাগলো বেশি। বার-বার নতুন হাঁড়ি-মালসা কেনবার ঝক্কি আর রইল না।

আর তারপর এল ষ্টীলের বাসন। যার নাম স্টেন্‌লেস ষ্টীল। সে-সব আবার ছেঁড়া কাপড়ের বদলে কারা বাড়িতে এসে বিক্রি করে যেতে লাগলো।

তখন কান্নার রোল পড়ে গেল কুমোর পাড়ার মানুষদের সমাজে।

জগাই দাস বুড়ো মানুষ। তার সঙ্গেই একদিন দেখা। আমাকে দেখে বুড়ো মানুষটা কেঁদে ফেললে। বললে—আপনারা তো আমাদের পাড়ায় আর যান না, ছোটবাবু—

বললাম—আর যাওয়ার দরকার হয় না জগাই—

—কেন, আপনারাও কি তা'হলে ওই ইস্টীলের বাসন-কোসন কিনছেন বুঝি?

বলতেই হলো—হ্যাঁ ··

জগাই দাস বললে—তাহ'লে আমরা কোথায় যাবো ছোটবাবু? আমরা কি না খেতে পেয়ে মারা যাবো, বলতে চান?

এ-কথার আর কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না-

জগাই দাসের দুঃখ আমি বুঝতে পারলাম। যুগের তালে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে যে সবাইকেই একদিন তাদের মত তলিয়ে যেতে হবে, সে কথা তাকে বলে তার দুঃখ আর বাড়াতে চাইলাম না।

তারপর দেখতে-দেখতে কুমোর পাড়ার সব লোক দারিদ্র্যের কোপে পড়ে অনাহারে বা শাক-পাতা খেয়ে কোনও রকমে দিন কাটাতে লাগলো।

এই রকমই চলছিল মাসের পর'মাস। বছরের পর বছর।

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো। হঠাৎ একদিন একটা খবর কানে এল। পোড়া-মার মন্দিরের মূর্তি নাকি কথা বলছে। ওখানকার মন্দিরে এতদিন কার মূর্তি ছিল কেউ জানতো না, হয়ত কোনও দেবীর মূর্তি ছিল। কিন্তু কোন্ দেবীর মূর্তি? সে-মূর্তি লক্ষ্মীর না সরস্বতীর, নাকি মা-মনসার, না শেতলা দেবীর, তা নিয়েও কোনও দিন কেউ মাথা ঘামাতো না।

বহুকাল আগে যখন এই ময়নাডাঙায় মুখুজ্যেবাবুদের কোনও পূর্ব-পুরুষ এই গ্রামের সমস্ত অঞ্চলটার প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন, তখন তিনিই ওই মন্দিরটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ভেতরে ওই বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই।

তারপরে তাঁর জমিদারি একদিন চলে গিয়েছিল। তখনকার সরকার-ও মন্দিরটার কোনও সংস্কার সাধন করেনি। মুখুজ্যে-বংশধররাও সে-মন্দিরটার আর কোনও সংস্কার করবার দরকার মনে করেনি। তারপরে এল দেশ-বিভাগের পালা। দেশ বিভাগের পরে ও-রাস্তা দিয়ে মানুষের যাওয়া-আসাও

কমে গিয়েছিল। আর তার ফলে মুখুজ্যে-বাড়ির অবস্থাও খারাপ হয়ে এসেছিল। ওদিকে শুধু ছিল কুমোর পাড়ার মানুষ-জন। মাটির হাঁড়ি-কুড়ি কেনবার দরকার যতদিন ছিল, ততদিন এ গ্রামের আশেপাশের অঞ্চলের লোক ওদিকে যেত, আর ওদিকের কুমোর পাড়ার অধিবাসীরাও হাটে আসতো তাদের জিনিস পত্র বেচতে। কিন্তু আস্তে-আস্তে সে দরকারও ফুরিয়ে আসতে ওদিকের জায়গাগুলো ক্রমেই বন জঙ্গলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই ও মন্দিরটার নাম হয়ে গিয়েছিল 'পোড়া-মা'র মন্দির'।

এই নামকরণেরও একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা এই যে কী ভাবে একদিন হঠাৎ আগুন লেগে ও পাড়ার অনেকগুলো বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে ওই মন্দিরটাও সে-আগুনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। আর তার ফলেই ওই অদ্ভুত নাম—পোড়া-মা'র মন্দির। আর মজা এই যে তার পরেও কারও আর মন্দিরটার সংস্কার করবার কথা মাথায় আসেনি।

মন্দিরটা যেমন অনাদরে অযত্নে পড়ে ছিল, তেমনি পড়েই রইল বহু বছর ধরে। তারপর এই কাণ্ড। এই পোড়া-মা'র কথা বলা। সবাই এসে জানিয়ে গেল—শুনেছেন কাণ্ড? মশাই, পোড়া মন্দিরের মা কথা বলছেন—

বললাম—সে কী?

—হ্যাঁ, একেবারে মানুষের মত কথা বলছেন!

আমি যেমন গুজবটা শুনলুম, তেমনি আরো অনেকেই শুনলো। শুনে আমার মত সবাই-ই অবাক হয়ে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কে শুনেছে? কে শুনেছে?

যারা-যারা শুনেছে, তারা সবাই বলে গেল যে তারা শুনেছে।

জিজ্ঞেস করলে—পোড়া-মা কী বললে?

—পোড়া-মা বললে—ওরে আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে। তোরা আমাকে কিছু খেতে দিস নে কেন?

—তারপর? তারপর?

তারপর কুমোর পাড়ার তারাপদ বললে—আমরা পোড়া-মা'কে জিজ্ঞেস করলুম, মা, তুমি কী খাবে? মা আমাদের বললে, তোরা আমাকে ভালোবেসে যা দিবি, তাই-ই আমি খাবো।

—তারপর? তারপর?

তারাপদ বললে—তারপর আমরা এক থালা ভাত-তরকারি দিলুম, মা তাই-ই খেয়ে নিলে—

সবাই জিজ্ঞেস করলে—পোড়া-মা কী করে খেলে? নিজের হাত দিয়ে?

তারাপদ বললে—কী করে আবার খাবে ? খাবারটা পোড়া-মা'র মন্দিরে গিয়ে রেখে দিয়ে এলুম। তারপর মন্দিরের দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে চলে এলুম। তারপর সন্ধ্যেবেলা দরজার তালা খুলে আবার ভেতরে ঢুকে দেখি থালা খালি। পোড়া-মা সব ভাত-তরকারি খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে—সত্যিই অবাক কাণ্ড !

কথাটা প্রথম প্রথম ময়নাডাঙা গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আস্তে-আস্তে খবরটা সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়লো। শুধু জেলা থেকেই নয়, সমস্ত দেশ থেকেই তীর্থযাত্রীর মত লোক আসতে লাগলো পোড়া-মা'র মন্দিরে পুজো দিতে। কেউ দিলে খাবার, কেউ দিলে টাকা-পয়সা, কেউ দিলে শাড়ি। আবার কেউ বা দিলে সোনার নথ।

ভিড়ে ভিড় হয়ে যেতে লাগলো কুমোর পাড়াটা। পাঁচ ক্রোশ দূরে রেলের ইষ্টিশান। কলকাতা থেকেও বহুলোক দলে-দলে সেই ইস্টিশানে নেমে গরুর গাড়িতে বা বাসে আসতে লাগলো ওই কুমোর পাড়ায়। তারা মন্দিরে পুজো দিতে লাগলো। সমস্ত দিন থাকতে লাগলো ওই পাড়ায়। তাদের থাকা-খাওয়ার জন্যে কুমোর পাড়ার লোকেরা সেখানে শুধু চালাঘর বানিয়েই দিলো না, তাদের অন্য-অন্য সুবিধের জন্যে যা-যা থাকা দরকার, তারও ব্যবস্থা করে দিলে তারা।

শেষ পর্যন্ত তাতেও কুলোল না। তখন সেখানে কুমোর পাড়ার বেকার ছেলেরা হোটেল খুলে ফেললো। স্নান করবার জন্যে নতুন টিউবওয়েল বসিয়ে দিলে। তাতে কিছু টাকা-পয়সা খরচা হলেও লাভ হতে লাগলো ডবলের বেশী। সে-পাড়ার ছেলে-মেয়েদের গায়ে তখন জামা-কাপড় উঠলো। সেখানকার লোকদের চালাঘর ভেঙে তার জায়গায় বাড়ির মাথায় টিনের চাল উঠলো। তখন আর ঝড়-জল এলে ভয়ের কিছু নেই। আগুন লেগে বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ারও ভয় নেই।

আসলে কুমোর পাড়া আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ময়নাডাঙার আর্থিক অবস্থাও ভালো হতে লাগলো। গ্রামের লোক-জন খেয়ে পরে বাঁচলো। এতদিনে সমস্ত দুরবস্থা একটু-একটু করে দূর হতে লাগলো।

আর শুধু কি তাই ? কত লোক এসে আবার ওই কুমোর পাড়ায় জমি কিনে বসবাস করা আরম্ভ করে দিলে। সমস্ত অঞ্চলটা মানুষের ভিড়ে, আবার গম-গম করে উঠলো। এক-কথায় সমস্ত অঞ্চলটার লক্ষ্মীশ্রী যেন আবার বহুদিন পরে ফিরে এল।

সেই কুমোর পাড়াতেই আবার দোকান-পসার গজিয়ে উঠলো। তীর্থযাত্রী-দের সুখ-সুবিধের জন্যে সব রকমের বন্দোবস্ত মজুত হলো সেখানে। ভাত-

ডাল-মাছ-তরকারির হোটেল হলো, জলখাবারের জন্যে চা-তেলেভাজা-মুড়ি-জিলিপির দোকান হলো। স্নান করবার জন্যে পুরোন পানা-পড়া পুকুরটা আবার ঝালিয়ে নিয়ে ইট-সিমেন্টের ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়া হলো।

ছুটি-ছাটাতে দিন কয়েক অবসর কাটানোর পক্ষেও জায়গাটা একটা আদর্শ-স্থল হয়ে উঠলো।

এই সমস্ত খবর রটবার সঙ্গে-সঙ্গে দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতা শহর থেকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা পর্যন্ত ময়নাডাঙায় এসে হাজির হলো। তারা পোড়া-মা'র মন্দিরের ছবি তুললে ক্লিক্‌-ক্লিক্‌ করে। পোড়া-মা'র মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের ইন্টারভিউও নিলে। তারা মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পোড়া-মা'র সামনে পুজোও দিলে। পুজোর প্রসাদও খেলে।

মোট কথা সামান্য একটা গ্রাম ময়নাডাঙার ততোধিক সামান্যতর কুমোর পাড়াটা একদিন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলো। দেশের সব মানুষের মুখরোচক আলোচনারও বিষয়-বস্তু হয়ে উঠলো।

লোকের মুখে শুধু পোড়া মা'র পুজোর নৈবেদ্য খাওয়ার অলৌকিক কাহিনীই যে রটতে লাগলো তাই-ই নয়, পোড়া মা'র দৈবশক্তির কথাও মুখে মুখে প্রচার হয়ে সকলের কানে মধুবর্ষণ করতে লাগলো।

কারো ছেলে হয় না, পোড়া মা'র চরণামৃত খেয়ে তারও সন্তান হলো। কারো স্বামী নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে বহু বছর নিরুদ্দেশ ছিল, পোড়া মা'র পুজোর ভস্ম দিয়ে কপালে ফোঁটা লাগাবার পর থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই স্বামী আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এল। এ-রকম অনেক ঘটনা আছে।

একজন বেকার ছেলের কিছুতেই চাকরি হচ্ছিল না। কত সুপারিশ যোগাড় করেছে, কত বড়-বড় লোকের পা জড়িয়ে ধরেছে, কতবার কত জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়েছে, তাতেও তার চাকরি হয়নি। শেষকালে পোড়া মা'কে পুজো দিয়ে তার একটা সরকারী চাকরি হলো।

একজন মেয়ের কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিল না। গায়ের রং কালো। সেটাই তার বিয়ের ব্যাপারে বাধা হচ্ছিল। এদিকে তার বয়স দিন-দিন বেড়ে চলেছে। শেষকালে তার বয়সের গাছ-পাথরও আর রইল্‌ না। তখন মেয়ের বাবা পোড়া-মা'কে একদিন পুজো দিলে। আর সেই পুজো দেওয়ার পরই হঠাৎ এক সুপুরুষ বড়লোক পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

এই সব ঘটনা আর রটনা যখন ঘটছে আর রটছে, তখনও আমি এ-সব ব্যাপারের ওপর কোনও গুরুত্ব দিইনি। কোনও আমলই দিইনি এ-সব গুজবকে। যুক্তিবাদী মন এ-সব গুজব ও কাহিনীকে বিশ্বাসের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে দিতে বরাবর অস্বীকার করেছিল।

বোম্বাই থেকে মামার চিঠি আসার পর আমার বিশ্বাসের দেওয়ালে একটা সামান্য ফাটল ধরলো। মামা লিখলে—আমি শীগগিরই তোমাদের ময়না-ডাঙায় যাচ্ছি—নিজের চোখ দিয়ে দেখলে তবে সব বিশ্বাস করবো—

সেদিন হঠাৎ জগাই দাসের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল।

দেখে আর চেনাই যায় না তাকে। আমি জগাই দাসকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আগে তার চেহারা ছিল হিলহিলে, এখন অনেক মোটা হয়েছে। দুর্দিন কেটে গিয়ে এখন বোধহয় সুদিন এসেছে জগাই দাসের। দেখলাম জগাই দাসের গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জির বদলে টেরিলিনের জামা উঠেছে।

আমিই তাকে ডেকে কথা বললাম। কোথায় যাচ্ছো, জগাই?

আগে হলে জগাই দাস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতো। আমাকে 'ছোটবাবু' বলে সম্বোধন করে খুব বিনয় সরকারে নিজের দুঃখ-কষ্টের ফিরিস্তি শোনাতো। মাটির হাঁড়ি-কলসী, মালসা বিক্রির বদলে এ্যালুমিনিয়াম আর স্টেন্‌লেস স্টীলের চাহিদা আর বিক্রির আধিক্য দেখে হা-হুতাশও করতো। এইটেই ছিল জগাই দাসের চরিত্রের চিরাচরিত অভ্যেস।

কিন্তু এবার তা নয়, এবার যেন এ একেবারে অন্য জগাই দাস।

আমি শুনেছিলাম যে কুমোর পাড়ার পোড়া মা'র মন্দিরের যে সেবায়েত কমিটি হয়েছে, জগাই দাস হয়েছে তার প্রেসিডেন্ট। সেবায়েত-কমিটি হওয়ার পর থেকেই কমিটির যারা মেম্বার ছিল, তাদের সকলেরই অবস্থা মোটামুটি ভালো হয়েছিল। কিন্তু জগাই দাস সাধারণ মেম্বার নয়, কমিটির একেবারে খোদ প্রেসিডেন্ট। তার অবস্থা তো সকলের চেয়ে ভালো হবেই।

জগাই দাস আমার কথায় থমকে দাঁড়ালো।

বললে—খুব মুশকিলে পড়েছি ছোটবাবু—

—কী মুশকিল?

—দেখুন, সামনেই বর্ষাকাল আসছে, তার আগেই তো মন্দিরটার একটু মেরামত করানো দরকার। এই রকম হাজার-হাজার মানুষ যদি সেই সময়ে এখানে আসে তো তাদের থাকা-শোয়ারও একটা বন্দোবস্ত থাকা চাই। নইলে মন্দির-কমিটিরই তো নিন্দে হবে—বলুন, ঠিক কি না?

বললাম—তা তো বটেই—

জগাই দাস বলে চললো—তাই দশ টন সিমেন্টের পারমিটের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু এখনও তার কোনও উত্তরই কেষ্টনগর থেকে এল না। তাই একটু তেল দিতে যাচ্ছি তাদের—

আমি অবাক হয়ে গেলাম জগাই দাসের কথা শুনে।

বললাম—তেল ? তেল দিতে যাচ্ছো, কেন বলবে বলছো ?

জগাই দাস বললে—সাধে কি আর তেল দেবার কথা বলেছি ছোটবাবু ? নইলে বোর্ডের অফিসে হাঁটাহাঁটি করে আমার হাঁটুতে এত ব্যথা হবে কেন ?

—আগেও তো একবার কয়েক টন সিমেন্টের জন্যে দরখাস্ত করে তিন টন আদায় করেছিলে—আবার তাহ'লে দশ টন সিমেন্ট চাইছো কেন ?

জগাই দাস বললে—আগে যে তিন টন সিমেন্ট চেয়েছিলাম, তাতে তো শুধু মন্দিরের চৌহদ্দির পাঁচিলটা আর নাট-মণ্ডপটা ঢালাই করা হয়েছিল। তাতে কোনও রকমে কাজ চালানো গোছের হয়েছিল। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা যারা মন্দিরে পুজো দিতে আসবে, তারা থাকবে কোথায় বলুন তো ?

এ-কথার' আমি কী উত্তর দেব ? আমি তো জানতাম সেই তিন টন সিমেন্ট দিয়ে পোড়া-মা'র মন্দির মেরামত তো হয়ইনি, মন্দিরের নাট-মণ্ডপটাও হয়নি। হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে জগাই দাসের ভাঙা টিনের চালাঘরের জায়গায় একটা একতলা পাকা বাড়ি আর মন্দির-কমিটির সব সেবায়েতদেরও এক-একটা করে পাকা বাড়ি। এবার এই দশ টন সিমেন্ট দিয়ে হয়ত সেই একতলা বাড়িগুলোই আবার দোতলা হবে।

জগাই দাসের তখন তাড়া ছিল, তাই আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের মাটির হাঁড়ি-কলসী-মালসার কারবার কেমন চলছে এখন ?

জগাই দাস যেতে যেতেও একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—সে কারবার এখন আমাদের লাটে উঠেছে। ও-সব জিনিসের তো আর খদ্দেরও নেই—

—তাহ'লে তোমাদের চলছে কীসে ?

জগাই দাস বললে—মাথার ওপর ভগবান আছেন, তাঁর ওপরেই আমাদের ভরসা, তিনিই আমাদের দেখছেন—

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—আর, তা ছাড়া, আমাদের কুমোর পাড়ার লোকদের হাতে এখন ও-সব করবার সময়ই বা কোথায় ? এখন তো সবাই ওখানে নানা রকমের দোকান দিয়েছে—

—কীসের দোকান ?

—কেউ খুলেছে ভাতের হোটেল, কেউ খুলেছে মিষ্টির দোকান, কেউ চা-পান-সিগ্রেটের দোকান, আবার কেউ-কেউ পুজোর ফুল-বেলপাতা বিক্রি করে। আবার কেউ বা মনোহারির দোকান দিয়েছে। সে-সব দোকানে কাঁচের চুড়ি পুঁতির হার শাঁখা, সিঁদুর—

বলে আর দাঁড়ালো না জগাই দাস।

অনেক দিন ধরে পোড়া মা'র অভিনব মাহাত্ম্যের কথা শুনে-শুনে

আমারও একদিন খুব কৌতূহল হলো। ভাবলাম, দেখেই আসি না গিয়ে ব্যাপার কী ? আর আমাদের ময়নাডাঙা থেকে জায়গাটা তো বেশি দূর নয়। দেখেই আসি না সেখানে এত লোকের আমদানি হয় কী জন্যে ? দূর-দূর দেশের লোক কীসের আকর্ষণে পোড়া-মা'র মন্দিরে পুজো দিতে আসে। তাতে কি সত্যিই কেউ পুণ্য অর্জন করে, না কেবল হুজুগ ?

তাই একদিন গেলাম সেই কুমোর পাড়ায়।

গিয়ে সব দেখে শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সেই কুমোর পাড়ার এ কী উন্নতি হয়েছে। সেই চালা ঘরগুলো কোথায় গেল ? সেখানে অনেক একতলা পাকা বাড়ি উঠেছে। রাস্তায় লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে। কত রকমের দোকান, তাতে কত রকমের জিনিস সেখানে বিক্রি হচ্ছে।

আর তার সঙ্গে কত বাইরের লোক তীর্থযাত্রী হিসেবে মন্দিরে এসে পোড়া-মা'র পুজো দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে এসেছে কত ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা। একটা ছোট বাড়িও গজিয়ে উঠেছে ধর্মশালা হিসেবে। যারা একদিনের বেশি এখানে থাকতে চায়, তাদের জন্যেও অন্য রকমের ব্যবস্থা রয়েছে। মোট কথা, সব মিলিয়ে সে এক এলাহি ব্যাপার।

আর মন্দির ? সেই পোড়া-মা'র মন্দির ?

সেই মন্দিরটা কিন্তু সেই আগেকার মতই রয়েছে। তার পুরানো আভিজাত্য নিয়ে সে তখনও তেমনি অটল-অচল হয়ে বিরাজ করছে। যে-মন্দিরের মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে কুমোর পাড়ার এত নাম ডাক এত শ্রীবৃদ্ধি, তার শোভা কিন্তু এতটুকু বাড়েনি।

কিংবা এও হতে পারে যে মন্দিরের প্রাচীনত্ব নষ্ট করতে চায়নি তার সেবায়েতরা। কিন্তু তাহ'লে ওই টন-টন সিমেন্ট কীসের পেছনে খরচ হলো ? মন্দির সংস্কারের নাম করে যে-সিমেন্ট সরকার দিলে, তা কি জগাই দাসের আর অন্য সেবায়েতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ বাড়াবার জন্যে ?

কে জানে এর পেছনে কী রহস্য আছে।

তবে তা ছাড়া, আমার কথা কে শুনবে ? আমি তো ওদের দলের কেউই নই। যারা সব কিছু পেয়েছে তাদের সংখ্যা যখন বেশি, তখন আমার কথা গ্রাহ্য হবেই বা কেন ?

সংখ্যা দিয়ে যে-দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সে-দেশের কপালে অনেক বিড়ম্বনা আছে। এই সত্যটা আমি ইতিহাসের পাতায় অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করেছি।

আমি বরাবরই সংখ্যালঘুর দলে। তাই আমার কথা কেউ কোনওদিন শোনেনি। তাই আমি কথা বলা ছেড়ে কলম ধরেছি। যারা জীবনে কখনও

আমার কথা শোনেনি, তারা এখন আমার লেখা পড়ছে। তারাই এখন আমার খাওয়া-থাকা, ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছে।

মামাবাবু এককালে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ বিভাগে বড় অফিসারের পদে চাকরি করেছে। তারপর সে পদ থেকে অবসর নিয়ে বোম্বাইতে আমার মামাতো দাদার কাছে জীবন কাটাচ্ছে।

সেই মামা খবরের কাগজে এই আমাদের ময়নাডাঙার কুমোর পাড়ার পোড়া-মা'র মাহাত্ম্যের কথা পড়ে আমাকে চিঠি লিখেছিল। তারপর সরাসরি আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলো।

এসেই আমাকে সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

মামা জিজ্ঞেস করলে—তোদের পোড়া-মা সব খায় ?

বললাম—হ্যাঁ, যে যা খেতে দেয়, পোড়া-মা সব খেয়ে নেয়—

মামা জিজ্ঞেস করলে—কত দিন থেকে এটা চলছে ?

বললাম—যেদিন থেকে কুমোরদের তৈরী মাটির হাঁড়ি-কলসী-মালসার বাজার বন্ধ হয়ে গেল, সেইদিন থেকেই পোড়া-মা'র মাহাত্ম্য শুরু হলো। সে আজ প্রায় দশ বছর আগে থেকে। তখন থেকেই পোড়া-মা'র কাছে তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়তে লাগলো, আর কুমোর পাড়ার লোকেদের অবস্থা আবার ফিরে গেল—

আবার মামা জিজ্ঞেস করলে—পোড়া-মা কী-কী জিনিস খায় ?

আমি বললাম—মাছ-মাংস-ডিম ছাড়া পোড়া-মা সবই খায়। রান্না করা ভাত-তরকারি থেকে আরম্ভ করে মুড়কী-মুড়ি-বাতাসা-ফল-মূল-পেঁড়া-সন্দেশ-রসগোল্লা সব কিছুই পোড়া-মা খায়। তার আগে পোড়া-মা'র মন্দিরে ভক্তরা পুজো দেয়, মোটা প্রণামী দেয়।

তারপর নৈবেদ্যটা পোড়া-মা'র সামনে রেখে দিয়ে চলে আসতে হয়। বাইরে এসে দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে বাইরের কোনও লোক ভেতরে ঢুকতে না পারে—

—তারপর ?

—তারপর তিন ঘণ্টা বাদে তখন মন্দিরের দরজা খোলা হয়, তখন দেখতে পাওয়া যায় পোড়া-মা সব নৈবেদ্য নিঃশেষ করে ফেলেছে—

মামা জিজ্ঞেস করলে—তা গড়ে রোজ কত লোক এই রকম পুজো দেয়

বললাম—তা প্রায় দু' থেকে তিনশো তীর্থযাত্রী হবে রোজ—

—এই এত লোকের সব খাবার পোড়া-মা খেয়ে ফেলে ? অবাক কাণ্ড।

বললাম—অবাক কাণ্ড বলেই তো দিন-দিন তীর্থযাত্রী এত বাড়ছে। গোড়ার দিকে মাত্র দশ-বারো জন আসতো, ক্রমে-ক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে-

বেড়ে এখন দু'শো-তিন'শোতে দাঁড়িয়েছে। আর এক বছর পরে এটা বেড়ে হয়ত হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে।

আর মজার কথা হচ্ছে এই, এই পোড়া-মা'র উদয় হওয়ার পর থেকে কুমোররা মাটির হাঁড়ি-কলসী-মালসার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ও-সব জিনিস ওরা আর তৈরি করে না। পোড়া মা-ই ওদের খাওয়া-পরা-থাকার পাকা বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। পোড়া-মা-ই এখন ওদের লালন-পালন করছে। ওদের সব সেবায়েতদের প্রত্যেকের এক-একটা পাকা সিমেন্টের বাড়ি হয়েছে—

মামা চুপ করে আমার কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে শুনলো। তারপর বললে—ঠিক আছে, আমিও ওই পোড়া-মা'র মন্দিরে পুজো দেব—

আমি অবাক হয়ে গেলাম মামার কথা শুনে। বললাম—তুমি আবার পুজো দেবে কেন ? তোমার আবার কীসের কামনা ?

মামা বললে—আমি একদিন পুলিশের চাকরিতে বড় ডিটেক্‌টিভ ছিলুম, তাই আমার এই পোড়া-মা'কে দেখতে ইচ্ছে করছে। জানতে ইচ্ছে করছে এর পেছনে কী রহস্য আছে। আজ পর্যন্ত সব রহস্যের জাল তো আমি ভেদ করেছি, একটা রহস্যও ভেদ করতে আমার বাকি থাকেনি। এবার দেখি এই পোড়া-মা'র পেছনে কী রহস্য আছে—

সেইদিনই গেলাম মামাকে নিয়ে পোড়া-মা'র মন্দিরে। তখন মন্দিরে খুব কাঁসর-ঘন্টা বাজছে। ধূপ-ধুনোর গন্ধে বাতাস ভুর-ভুর করছে। আর হাজার-হাজার মানুষের মন্দিরের সামনে হাতজোড় করে ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আর মামা দূর থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখলুম। তখনও পুজো হচ্ছে। আমাদের দিকে কারোর নজর দেবার সময় নেই তখন। জগাই দাসকেও কোথাও দেখতে পেলুম না।

মামা মন্দিরটাকে পরিক্রমা করতে লাগলো। বাইরের দিকে সমস্ত জায়গাটা ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে। কিন্তু মূল মন্দিরটাকে সেই পুরনো ধাঁচেই রাখা হয়েছে। মন্দিরের পেছন দিকেও গেল মামা। পেছনের দিকে গাছ-গাছালিগুলোও পরিষ্কার করা হয়নি। জঙ্গল-জঙ্গল ভাবটা তখনও অটুট রয়েছে।

মামা ভালো করে দেখলে সেই পেছন দিকটা। তারপর বললে—চল্, এবার বাড়ি যাই—কালকে আমিও এখানে এসে পুজো দেব—

বলে সেদিনের মত আমরা চলে এলুম।

আর তার পরদিনই মামা ছ'ক্রোশ দূরের রেল বাজার থেকে পঞ্চা

টাকার ফল-মিষ্টি কিনে আনলে। তারপর পুজো দেওয়ার যেমন নিয়ম, তেমনি করে আমরা কুমোর পাড়ায় গেলাম। উপোস করে থাকার নিয়ম, তাই কিছু খেলাম না আমরা। স্নান করে নতুন ধুতি-জামা পরে সেই পঞ্চাশ টাকার মিষ্টি নিয়ে গিয়ে পৌঁছুলাম পোড়া-মা'র মন্দিরে।

সেখানে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেখি জগাই দাস খালি গায়ে সকলের নৈবেদ্য হাতে তুলে নিচ্ছে। আমাদের পুজোও হাত পেতে নিলে জগাই দাস। সঙ্গে মামা পঞ্চাশটা টাকা দিলে প্রণামী বাবদ।

তখন জগাই দাস এত ব্যস্ত যে আমাদের চিনতেই পারলে না। আর তার পরে সকলের পুজো দেওয়া হয়ে গেলেই যথা সময়ে পোড়া-মা'র মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দরজায় তালা-চাবি পড়ে গেল।

এবার তিন ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। এইটেই নিয়ম।

সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো। তিন ঘন্টা পরে যখন দরজার তালা-চাবি খোলা হবে, তখন সব তীর্থযাত্রীরা ভেতরে ঢুকে দেখবে যে পোড়া-মা সব নৈবেদ্য খেয়ে শেষ করে ফেলেছে কিনা।

আর তিন ঘন্টা পরে ঠিক তাই-ই হলো। দরজা খোলবার পর সবাই-ই হুড়মুড় করে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখলে অত লোকের পুজোর নৈবেদ্য পোড়া-মা খেয়ে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে। শুধু নৈবেদ্যের কলাপাতা-গুলো খালি পড়ে রয়েছে।

সেই দৃশ্য দেখে যত তীর্থযাত্রী ছিল সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো—জয় পোড়া-মা'র জয়! জয় পোড়া-মা'র জয়!!! মা, আমাদের দেখো, মা, আমাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি দিও মা, আমাদের রক্ষা করো মা···

তার পরদিনই এক ভীষণ কাণ্ড ঘটলো কুমোর পাড়ায়। ঘরে-ঘরে কান্নার রোল উঠলো সেখানে।

আমি খবরটা শুনে দৌড়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে যা শুনলুম, তাতে আমার বিস্ময়ের শেষ রইল না। এমন তো আগে কখনও হয়নি। এমন ঘটনা তো কেউ আগে কখনও ঘটতেও শোনেনি।

যাকে সামনে পেলাম তাকেই জিজ্ঞেস করলুম—কী হয়েছে ভাই, এখানে? তোমাদের এত কান্নাকাটি হচ্ছে কেন?

তখন তাদের জবাব দেওয়ার মত মনের অবস্থাই নয়। দেখলুম সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেছে। তারাই বললে—আগের দিন সন্ধ্যে থেকেই নাকি

কুমোর পাড়ার প্রায় শ'খানেক লোক ভেদ-বমি করতে শুরু করেছিল। কেন ভেদ-বমি করতে শুরু করেছিল, তার কারণ কেউই বলতে পারলে না। সরকারী ডাক্তারখানার লোক এসে নাকি অ্যামবুলেন্স করে প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোককে খেপে-খেপে সদরের হাসপাতালে নিয়ে গেছে চিকিৎসার জন্যে। ডাক্তাররা নাকি পরীক্ষা করে বলেছে সকলের পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেন, এমন হলো কেন? কেউ কি কিছু খারাপ জিনিস খেয়েছিল?

সবাই বললে—না, কেউ তো কিছু খায়নি। আমাদের এখানকার লোক তো পেটভরে খেতেই পায় না। আর মাটির হাঁড়ি-কলসী-মালসা বেচে তো আজকাল পয়সাই হয় না, তা খাবে কী? যা রোজ খায়, তাই খেয়েছিল।

আমি জগাই দাসের খবর জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের পাড়ার মোড়ল সেই জগাই দাস কোথায়?

লোকটার মুখ চোখ এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলো। বললে—তিনিই তো পোড়া-মা'র হেড্ পুজারী, তিনি কাল হাসপাতালে যাবার পথেই মারা গেছেন।

—কেন, তিনি কী খেয়েছিলেন?

লোকটা বললে—তিনি তো হেড্-পুজারী, তিনি বলতে গেলে কিছুই খাননি। খাওয়ার দিকে তাঁর অত লোভ-টোভ কোনও কালেই ছিল না। তিনি সমস্ত দিন পোড়া-মা'র সেবা করেই দিন কাটাতেন—

লোকটা একটু থেমে আবার বললে—আর তাঁর বউ আর মেয়ের অবস্থা আরো খারাপ। তারাও নাকি মরো-মরো—আজকে মন্দিরের দরজাই খোলা হবে না—

বাড়িতে এসে মামাকে সব ঘটনাগুলো বললাম।

বললাম—আজকে আর মন্দিরের দরজাই খোলা হবে না। আজকে যারা অনেক দূর-দূর থেকে এসেছে তারা সবাই আবার পোড়া-মা'কে দর্শন না করেই যে-যার বাড়ি ফিরে গেল—

মামা বললে—শুধু আজই নয়। তুই দেখবি এর পর থেকে আর কোনও দিনই ও-মন্দিরের দরজা খোলা হবে না। একটা মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে বেশিদিন কাউকে বোকা বানানো যায় না। বুজরুকি একদিন-না-একদিন ধরা পড়বেই—

—বুজরুকি?

মামা বললে—বুজরুকি নয় তো কী? আমি আমার চাকরির জীবনে এমনি কত বুজরুকি বন্ধ করেছি—

—কী করে বন্ধ করেছে ?

মামা বললেঁ—এই যেমন করে এই তোদের কুমোর পাড়ার পোড়া-মা'র বুজরুকিটা বন্ধ করলুম।

—কী করে বন্ধ করলে ?

মামা বললে—তুই পরশু দেখিসনি ? পোড়া-মা'র মন্দিরের পেছনে কী রকম গাছ-গাছালির জঙ্গল ছিল ? আমি দেখতে পেলাম পেছন দিয়ে মন্দিরের ভেতরে আসবার-যাবার একটা রাস্তা রয়েছে। বুঝতে পারলুম ওইখান দিয়েই পোড়া মা'র নৈবেদ্যগুলো সব পাচার হয়। তাই তো ফল মিষ্টিগুলো কুমোর পাড়ার দোকান থেকে না কিনে ছ'ক্রোশ দূরের রেল-বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম। খুব দামী-দামী খাবার সব। আমি সেই মিষ্টির মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম মামার কথা শুনে। বললাম—তুমি খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলে ? তোমার জন্যে এতগুলো লোক বেঘোরে মারা গেল ?

মামা বললে—মাত্র কয়েকটা লোকই তো মারা গেল। কিন্তু তার জন্যে এই ধাপ্পাবাজিতে তেমনি কত হাজার-হাজার লোক যে আবার বেঁচেও গেল। বেশি লোকের ভালোর জন্যে অল্প লোকের ক্ষতি করলে তাতে কোনও পাপ হয় না। আমরা পুলিশের চাকরিতে এই শিক্ষাই পেয়েছি। পুলিশের চাকরিতে আমি এই রকম অনেক বুজরুকি বন্ধ করেছি—

———

অনেক দিন আগে ১৯৪০ সালের ১০ ই মে তারিখের কথা। জার্মানির সঙ্গে হল্যাণ্ডের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। গরিব দেশ হল্যাণ্ড। জার্মানির মত শক্তিশালী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত ঢাল-তলোয়ার কোনও কিছুই সম্পদ নেই হল্যাণ্ডের হাতে। তবু তো যুদ্ধে হারলে চলবে না। আর যদি যুদ্ধে হল্যাণ্ডের পরাজয় হয় তো তখন কোথায় থাকবে তাদের স্বদেশ-প্রেম, কোথায় থাকবে তাদের মাতৃভূমি। আর মাতৃভূমির অপমান তো সমস্ত দেশবাসীর অপ[illegible]

দেখতে-দেখতে ওই ছোট্ট দেশময় যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। তারা আগে কখনও কল্পনাও করেনি যে জার্মানির মত অত বড় পরাক্রমশালী এক দেশ তাদের ওপর একদিন আক্রমণ করে বসবে।

মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু তার লোভ নয়, তার বিলাসিতা নয়, তার পাপ নয়, তার বেহিসেবিতা নয়। না, এসব কিছুই তার শত্রু নয়। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু একমাত্র মানুষই। জার্মানি নিজেই নিজের যত শত্রুতা করেছে, অত শত্রুতা রাশিয়া, আমেরিকা বা গ্রেট-বৃটেনও কখনও তা করেনি।

রাতারাতি হল্যাণ্ডের মিলিটারী অফিসাররা মিটিং ডাকলেন।

একজন জেনারেল সেই সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জার্মানির সঙ্গে আমাদের কীসের তুলনা? তার সঙ্গে আমরা কীসের জোরে লড়াই করবো?

সেই সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন জেনারেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমাদের উচিত জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করা, তা না করলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

সেই সভায় আরো অনেক লোক উপস্থিত ছিল। মাথার ওপর উদ্যত খড়্গ। যে কোনও সময়ে হল্যাণ্ড জার্মানির হাতের মুঠোয় চলে যেতে পারে। বাজে কথা বলে নষ্ট করবার মত সময়ও তখন হাতে নেই। সীমান্তের অধিবাসীরা

তখন যে-যেদিকে পারছে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। দেশের সমস্ত মানুষ ভয়গ্রস্ত। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা তছনছ হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

হঠাৎ একজনের বজ্রগম্ভীর গলার শব্দ শোনা গেল—থামুন—

মনে হ'ল ঘরের মধ্যেই যেন বাজ পড়লো। যেদিক থেকে শব্দটা এল সেদিকে সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখলে। হল্যাণ্ডের খোদ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ তখন তাঁর আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। বললেন—আপনারা দেশের জন্যে জীবন দিতে পারবেন? জীবন?

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কথাগুলো ঘরের প্রত্যেকটি কোণে-কোণে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। আপনারা বলুন, আপনারা নিজেদের প্রাণ বলি দিতে পারবেন? আর তা যদি না দিতে পারেন তো আমি এখনি আপনাদের সকলকে ডিসগার্জ করে দেব। আমি আপনাদের জায়গায় এমন নতুন-নতুন সব অফিসারদের চাকরি দেব, যারা দেশের জন্যে জীবন দিতে পেছপাও হবে না। জীবন দিতে যদি কেউ রাজি থাকেন তো বলুন। আমি একটা মাত্র জবাব চাই। বলুন 'হ্যাঁ কি 'না'—

কম্যাণ্ডার ইন-চীফের হুকুম অগ্রাহ্য করবে এত সাহস কার আছে! সবাই এক সুরে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ'—

—জীবন দিতে তৈরি আপনারা?

—হ্যাঁ, আমরা জীবন দিতে তৈরি।

সঙ্গে-সঙ্গে মিটিং শেষ হয়ে গেল। মানুষের ইতিহাসে সেদিন সে এক চরম ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা। পৃথিবীময় রণভেরী বেজে উঠলো। মানুষকে তার লোভ ত্যাগ করতে হবে, বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে, পাপ ত্যাগ করতে হবে আর সঙ্গে-সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে তার জীবন।

আর সেই দিন হল্যাণ্ডের মানুষদেরও জীবন-ত্যাগ করবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

এরই মধ্যে হঠাৎ আর একটা অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হলো। ভয়াবহ আর এক নতুন বিপদ। একদিন হঠাৎ সারা হল্যাণ্ড ডুবে গেল এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে। সারা হল্যাণ্ডে আলো নেই, পাখা নেই, জল নেই। কল-কারখানায় সব মেসিন অচল। মনে হ'ল সকলের সব কাজকর্ম যেন অচল হয়ে যাবে। কে এই সর্বনাশ করলে? কোনও স্যাবোটেজ নয় তো? অর্থাৎ কোনও দেশ-দ্রোহিতা!

সেদিন হল্যাণ্ডের মহারানীর রাজত্বে চারদিকে সাজ-সাজ রব উঠলো। অপরাধীকে খুঁজে বার করবার জন্যে লোক হন্যে হয়ে উঠলো। এ বিপর্যয়ের

কারণ কী ? এর মূলে কে ? তাকে গ্রেফতার করে জেলে পোরো, তারপর তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও।

দুর্ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই চলতে লাগলো অনুসন্ধান। এই বিপর্যয়ের মূল সন্ধানে মহারানীর পুলিস, মিলিটারি, ডিটেকটিভ, চারদিকে আঁতি-পাতি করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। হুকুম হলো—যেমন করে হোক বিশ্বাসঘাতককে গ্রেফতার করতেই হবে। আর যদি অপরাধীকে ধরা সম্ভব না হয়, অন্তত পাওয়ার-হাউসের মেশিন মেরামত করে কাজ চালু করে দাও। আমাদের আলো চাই, জল চাই, হাওয়া চাই, আমরা বাঁচতে চাই। জার্মানির হিটলারের সঙ্গে আমরা আপ্রাণ লড়াই করতে চাই। আমরা জানতে চাই আমরা যখন বাইরের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইছি, তখন আমাদের ভেতরের কোন্ শত্রু আমাদের দেশের এই দুর্দিনে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো !

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ? সুকুমারবাবুর সামনে বসে তাঁর কথা শুনছিলাম এতক্ষণ ধরে। সুকুমার রঞ্জন সরকার। তিনি এককালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। লক্ষ-লক্ষ ছাত্র তাঁর হাতে মানুষ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমি নিজেও তাঁর একজন অন্যতম ছাত্র। এবার হঠাৎ কলকাতা এসে যখন খবর পেলাম যে তিনি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতলে পড়ে আছেন, তখন সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে তাঁকে দেখতে গেলাম। দুর্ঘটনার যে-বিবরণ শুনলাম তা বড় মর্মন্তিক।

বৃদ্ধ বয়েসের জন্যে ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তিনি সকালে আর সন্ধ্যেয় ভ্রমণে বেরোতেন। ভোরবেলায় চলে যেতেন লেকে। আর সন্ধ্যেবেলা বেড়াতেন পাড়ার রাস্তায়। ফুটপাতের ওপর।

সেদিন সন্ধ্যেয় সেই বেড়াতে যাওয়ার ফলেই এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। বাড়ি থেকে তিনি যখন বেড়াতে বেরোন তখন কোনও বিপদের সঙ্কেতই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বিনা নোটিশে লোডশেডিং হয়ে গেল। সুতরাং সেই অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়ে আবার বাড়ির দিকে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন। কিন্তু কে জানতো সেই রাস্তার ওপরেই অমন অদৃশ্য মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে ?

সামনেই ছিল একটা ম্যানহোল। ম্যানহোলের ওপরের ঢাকনাটা কে বুঝি কখন লোডশেডিং-এর অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, তা কারোর জানা ছিল না। সুকুমারবাবু একেবারে সেই ম্যানহোলের দশ ফুট

গর্তের মধ্যেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তখন যে তিনি চিৎকার করে কাউকে ডাকবেন তারও উপায় নেই। সমস্ত রাত তিনি সেই গর্তের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

পুলিশ পরদিন সকাল বেলা স্থকুমারবাবুকে ওই অবস্থায় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলে।

আমি যখন সব শুনে হাসপাতালে স্থকুমারবাবুকে দেখতে গেলাম, তখন একমাসের ওপর তিনি ওই রকম হাত-পা-মুখ-মাথা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি আনন্দ পেলেন। খুশী হলেন।

তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কলকাতার লোকদের উচিৎ মামলা করা—

স্থকুমারবাবু হাসলেন। তবে ঠিক হাসলেন না কাঁদলেন তা বোঝা গেল না। তারপর বললেন—মামলা ? কার বিরুদ্ধে মামলা করবো ?

বললাম—কেন, গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে—

স্থকুমারবাবু আমার কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বুঝলাম কথা বলতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবু বললেন—একটা গল্প শুনবে ?

বললাম—কিসের গল্প ?

স্থকুমারবাবু বললেন—ইতিহাসের গল্প—

বলে তিনি সেই ওপরে বলা ১৯৪০ সালের মে তারিখের হল্যাণ্ডের গল্পটা বলতে লাগলেন। বললেন—সেই হল্যাণ্ডের ওপর জার্মানির সৈন্যদের বোমা-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা। তারপর বললেন সারা দেশে আলো নিভে যাওয়ার কথা, হাওয়া বন্ধ হওয়ার কথা, জল বন্ধ হওয়ার কথা।

বলতে-বলতে স্থকুমারবাবু কথা বলা থামিয়ে একটু দম নিলেন।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ? তারপর কী হলো স্যার ?

স্থকুমারবাবু বলতে লাগলেন—তারপর হঠাৎ ধরা পড়লো হল্যাণ্ডের সেই আলো-বাতাস জল বন্ধ হওয়ার আসল কারণটা। দেখা গেল হল্যাণ্ডের শত্রু লক্ষটা নয়, হাজারটা নয়, এমনকি দু'শো একশো কি দশটা পাঁচটাও নয়, শত্রু কেবল দেশের একটাই। হল্যাণ্ডের পাওয়ার হাউসের ছোট্ট একটা মেসিন কী করে বুঝি বিগড়ে গিয়েছিল। আর বিগড়ে যাওয়ার কারণ সেই ছোট্ট মেসিনের ছোট্ট একটা 'স্ক্রু'। সেটা কি-রকম করে যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল—

তারপর আবার দম নিলেন স্থকুমারবাবু। বললেন—তুমি আমাকে মামলা করতে বলছো। কিন্তু মামলা করতে গেলে তো সকলেরই বিরুদ্ধে সকলকে মামলা করতে হয়। কারণ এ আমার, এ তোমার, এ যে আমাদের সকলের

পাপ। কার পাপে আমরা কাকে অপরাধী করবো? আমাদের শত্রু আমেরিকাও নয়, রাশিয়াও নয়, মুসলমানও নয়, এমন কি শিখ, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, মারাঠী কেউই আমাদের শত্রু নয়। শত্রু আমাদের একটাই—

—কে সেই শত্রু?

—আমাদের দেশের পাওয়ার হাউসেরও একটা 'স্ক্রু' কী রকম করে যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছে, আমরা সেটা টের পাচ্ছি না, আমরা সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের দেশের মানুষেরও সেই 'স্ক্রু'টা এঁটে দিলে আবার আমরা হাওয়া পাবো, আবার আমরা জল পাবো, আবার আমরা আলো পাবো—

—কী সেই জিনিসটা?

সুকুমারবাবু বললেন—সেটা হ'ল 'চরিত্র'। 'চরিত্র'টা খুবই ছোট একটা জিনিস। ছোট একটা জিনিস বটে, কিন্তু সেই 'চরিত্রে'র মত বড় জিনিসও বোধহয় আর কিছুই নেই। সেই 'চরিত্র'টাই আমরা খুইয়ে বসেছি।

বলতে-বলতে তিনি থেমে গেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল। সে কান্না যন্ত্রণার, না ক্ষোভের, না আত্মঅনুশোচনার, না রাগের, তা বুঝতে পারা গেল না। ডাক্তারের নির্দেশে তখন আমরা সেখানে যারা ছিলাম, তারা সবাই-ই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমাদের সকলের চোখই তখন সজল হয়ে এসেছিল।

আর তার পরদিনই সুকুমারবাবু মারা গেলেন। দেশের কথা নিয়ে ভাববার, দেশের মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করবার শেষ মানুষটাকে আমি চিরকালের মত হারালাম।

দেশে তখনও একটা চরিত্রবান লোক বেঁচে ছিল, তাকেও আমরা ফুটপাতের ম্যানহোলের গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে খুন করলাম।

———

# ঘাট বাবু

কোনওদিন যা কল্পনা করতে পারিনি, শেষকালে কিনা তাই-ই হলো।

ছোটবেলায় স্কুলের মাস্টার মশাই একদিন আমাদের পড়াতে-পড়াতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা বড় হয়ে কে কী হতে চাও?

প্রশ্নটা শুনে আমরা ক্লাশের সব ছেলেরা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ভবিষ্যতে কে কী হতে চাই তা তো কখনও ভাবিনি। আমরা ভাবতুম সে-সব চিন্তা আমাদের নয়, সে চিন্তা করবেন আমাদের বাবা-মায়েরা। সেইটেই ছিল আমাদের সেই যুগের নিয়ম। আমরা স্কুলে গিয়ে লেখা-পড়া করবো, তারপর একদিন স্কুলের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবো। আর তারপর কেউ করবো চাকরি আর কেউ বা করবো ব্যবসা-বাণিজ্য। আর কেউ বা পৈত্রিক সম্পত্তি বসে-বসে ভোগ করবো।

আমাদের ক্লাশের সব চেয়ে নিরীহ ছেলে ছিল অনাদি। নিরীহ হলেও তারা ছিল বিরাট বড়লোক। তাদের বাড়িটার চেহারা দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। কলকাতা শহরের মধ্যে অত বড় বাগানওয়ালা বাড়ি বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। বাড়িটা ছিল এক বিঘে জমির ওপর। বাড়িটা তেতলা। সব মিলিয়ে বাড়ির ভেতরে বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশটা ঘর ছিল। আর মানুষ বলতে ছিল মাত্র তিনজন। অনাদি, তার বাবা আর তার মা। অনাদির বাবা কালীশ মুখার্জি মশাই ছিলেন সেকালের জমিদার বংশের একমাত্র সন্তান। পূর্ববঙ্গে কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল তাদের। কিন্তু কালীশবাবু মাঝ বয়সেই চলে আসেন কলকাতায়। এবং তখন থেকেই কলকাতায় লোহার ব্যবসা শুরু করেন। আর সেই ব্যবসা থেকেই পরে তিনি আরো অনেক টাকা উপার্জন করেন। তাঁর যে ব্যাঙ্কে কত টাকা খাটতো,

তা বোধহয় তিনি নিজেও জানতেন না। যদি কেউ তা জানতো তো তাঁর উকিল এাটর্নি আর ব্যারিস্টার। তাঁরা কালীশবাবুকে যেমন ভাবে টাকা খাটাতে বলতেন, যেমন ভাবে টাকা খরচ করতে বলতেন, কালীশবাবুও তেমনি করেই টাকা খাটাতেন আর খরচ করতেন।

কিন্তু অত টাকা থাকা সত্ত্বেও কালীশবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত শিক্ষিত আর অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। লোকের বিপদে-আপদে তাঁর কাছে সাহায্যে চাইতে গিয়ে কেউই কখনও খালি হাতে ফিরে আসেনি। কালীশবাবুর বাড়িতে ছিল আমাদের ফুটবল খেলার মাঠ। মস্ত বড় মাঠ পড়ে ছিল বাড়ির পেছনে। আর ছিল সুইমিং-পুল। বাইরে থেকে দেখে মনে হতো সেটা যেন একটা ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখা যেত অন্যরকম। ভেতরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখা যেত চারদিক রেলিং ঘেরা বারান্দা। মধ্যেখানে বাড়ি ভর্তি তর্-তর্ করছে জল। ইচ্ছে হলে সেই জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। তেল, সাবান, গামছা, তোয়ালে সব কিছু সাজানো আছে। কালীশবাবু রোজ বুড়ো বয়েস পর্যন্ত সেখানে স্নান করতেন, সাঁতার কাটতেন। তাতে শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল। আর ছিল তাঁর একটা বিরাট গাড়ী। সে-যুগের নিয়ম অনুযায়ী বিরাট আকারের একটা বিলিতি গাড়ি।

আমরা, যারা অনাদির সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তুম, তারা ওই সুইমিং-পুলএ গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করেছি, সাঁতার কেটেছি। আর শুধু তাই নয়, তাদের গাড়িতেও চড়েছি। সে-জন্যে কালীশবাবু কখনও রাগ করেননি বা বকেননি আমাদের। শুধু একটা কথাই বার-বার আমাদের বলতেন—খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে বাবারা। লেখা-পড়া না করলে মানুষ হতে পারবে না তোমরা, বুঝলে?

আমরাও কালীশবাবুর কথা মন দিয়ে শুনতাম। অনাদিও বাবার কথা মন দিয়ে শুনতো। অনাদির জন্যে কয়েকজন মাস্টারমশাই ছিলেন। তাঁরা এক-একজন এক-একটা বিষয় পড়াতেন। অনাদি যে লেখা-পড়ায় খুব ভালো ফল করতো, তা নয়। মোটামুটি কোনও রকমে পাশ করতো ফি বছর।

সেদিন মাস্টারমশাই-এর প্রশ্নের জবাবে এক-একজন এক-একরকমের কথা বললে।

আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবো স্যার—
ভাস্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো স্যার—
কার্তিক বললে—আমি ব্যারিস্টার হবো স্যার—
সবাই কে কী হবে তা উঠে দাঁড়িয়ে এক-এক করে বলে গেল।

শেষকালে আমার পালা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আমি লেখক হবো স্যার—

শুনে সবাই একটু আশ্চর্য হলেও মুখে কেউ কিছু বললে না।

একেবারে সকলের শেষে অনাদির পালা এল।

অন্য সকলের মত মাস্টারমশাই তাকেও জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বড় হয়ে কী হবে অনাদি ?

অনাদি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমিও লেখক হবো স্যার—

আজ এতকাল পরে ভাবি—হায়রে মানুষের সাধ, আর হায়রে মানুষের বিধাতাপুরুষের বিধান। সাধ আর সাধ্যের সঙ্গে কি কখনও সামঞ্জস্য থাকে ? তাই তো গোড়াতেই বলেছি—যা কোনওদিন কল্পনা করতে পারিনি, শেষকালে কিনা তাই-ই হলো। কিন্তু তা বলে এ কী-রকমের পরিণতি !

অনাদিদের বাড়িতে তার বাবার অনেক বই ছিল। কালীশবাবুর বাতিক ছিল বই পড়ার। অনাদি তার স্কুলের বই যত না পড়তো, তার চেয়ে বেশি পড়তো তার বাবার সেই বইগুলো। সেই বই পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমা করে বেড়াতো। কোথায় ফরাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস, কোথায় আমেরিকার একশো বছরের স্বাধীনতার যুদ্ধের কাহিনী, কোথায় নেপোলিয়ন বোনাপার্টের রাশিয়া আক্রমণ, কোথায় এড্ওয়ার্ড গিবসের লেখা 'ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল্ অব্ রোম্যান এম্পায়ার', আর কোথায় টমাস এ্যাডিশনের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের সব কাহিনী।

আমিও অনাদিদের বাড়িতে গিয়ে ওই সব পড়তাম।

অনাদি বলতো—জানিস, পৃথিবীর সব লেখকদের বই না পড়লে লেখক হওয়া যাবে না। ভালো লেখক হতে গেলে আগে ভালো পাঠক হতে হবে।

আমিও কথাটা বিশ্বাস করতাম। জিজ্ঞেস করতাম—এ-কথা তোকে কে বলেছে ?

অনাদি বলতো—এ-কথা বই পড়েই আমি শিখেছি—

অনাদির কোনও দিনই কোনও অহঙ্কার ছিল না। সে যে অত বড়লোকের ছেলে তা যেন তার জানা ছিল না। এইটুকু শুধু তার জানা ছিল যে তাদের কখনও টাকার অভাব হবে না। সুতরাং তাকে কখনও কোনও চাকরি করে টাকা উপায়ও করতে হবে না।

আর তার বাবার ব্যবসা ?

কালীশবাবুর অবর্তমানে সেই ব্যবসা কে চালাবে ?

আমি জিজ্ঞেস করতাম—তুই যদি লেখক হোস, তাহলে তোর বাবার

লোহার ব্যবসা কে চালাবে ? তোর তো আর ভাই-বোন কেউ নেই ! একলা তোকেই তো সব দেখতে হবে !

অনাদি বলতো—তা'হলে তুই কী করে লেখক হবি ?

আমি বলতুম—আমি দিনের বেলা একটা চাকরি করবো, আর বাকি সময়টায় লিখবো—

অনাদি বলতো—চাকরি করতে-করতে লিখলে কি আর ভালো লেখা হবে ? তা'হলে যেমন অন্য সবাই চাকরি করতে-করতে লেখে, সেই রকম লেখাই হবে। তাতে হয়ত দু'দিনের জন্যে একটু নাম-টাম হলো। তারপরে আবার একদিন সবাই তোর নাম ভুলে যাবে। এ-রকম তো আগেও হাজার হাজার লোক লিখেছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায় ?

কথাটা আমার শুনতে ভালো লাগেনি।

অনাদি বলতো—ও-রকম লেখার চাইতে না- লেখাই ভালো।

অনাদির কথাগুলো যেতো ওষুধের মতন গিলে ফেলতাম। কোনও মন্তব্য করতাম না। অনাদি বলতো—লেখাটা তো ব্যবসা নয়, লেখার জন্যে নিজের সব কিছু দিতে হবে। পারলে নিজেকেও দিতে হবে। নিজেকেও উৎসর্গ করতে হবে মা-সরস্বতীর কাছে।

আমি বলতাম—সকলের বাবা তো তোর বাবার মত বড়লোক নয়। তোর পক্ষে যা সম্ভব, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়—আমরা গরীব লোক, লেখার জন্যে আমরা জীবন দিতেও পারবো না, লেখার জন্যে আমরা মা-সরস্বতীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবো না—

অনাদি বলতো—তা'হলে আর-লেখক হয়ে লাভ কী ? শুধু কাগজে নাম ছাপানো আর কয়েকটা বই ছাপালেই তো কেউ লেখক হয়ে যায় না। সে-রকম লিখে মানুষের কী উপকার করা যাবে ?

তা এই-ই ছিল আমাদের অনাদি। অনাদি মুখার্জি। আস্তে-আস্তে আমরা সবাই স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকলুম। কলেজ পেরিয়ে একদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলুম। সেই ইউনির্ভাসিটিও একদিন ছাড়তে হলো আমাদের। আমাদের সহপাঠীরা কে কোথায় ছিটকে গেল, তার খবর রাখবার অবসর হলো না আমাদের। সেই আনন্দ শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলো কি না, সেই ভাস্কর শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হতে পারলো কি না, সেই কার্তিক শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার হতে পারলো কি না, তার সন্ধান রাখবার প্রয়োজনই হলো না আমার। কারণ আমি নিজেই তখন ঝড়ের আগে শুকনো পাতার মত কোথায় যে ছিটকে চলে গেলাম, তার খেয়াল করবার মত সময়ও আমার রইল না।

হয়ত সকলের জীবনেই এই রকম হয়। হয়ত এই রকম হওয়াটাই নিয়ম।

চাকরি-সূত্রে আমি তখন সমস্ত ইণ্ডিয়াটাই চষে বেড়াচ্ছি। কোথায় রাজস্থান, কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় মহারাষ্ট্র, কোথায় মধ্যপ্রদেশ, কোথায় বিহার, সব দেশই আমার স্বদেশ হয়ে গেল, সব মানুষই আমার আপন-জন হয়ে গেল। মাঝখানে তারই মধ্যে অনাদির সন্ধান নিতে গিয়ে শুনি সে ইণ্ডিয়ায় নেই। সে নাকি ভারতবর্ষের বাইরে কোথায় ভ্রমণ করতে গেছে।

আর তাদের বাড়িটা ?

তার বাবা-মা কেউই নেই। সেই তাদের বাড়িটা কোথাকার কোন এক অবাঙালী ব্যবসায়ী কিনে নিয়ে বড়-বড় আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট-বাড়ি বানিয়ে দিয়ে অত বিঘে জমি অতখানি বাগান সব ইট্-পাথর-সিমেন্ট-কংক্রীটে ভরাট করে ফেলেছে। আগেকার কালীশবাবুর বাড়িটা যে কোথায় ছিল, তার চিহ্নটি পর্যন্ত আর নেই।

এর পর ভাবলাম যে আর যাযাবর-বৃত্তি নয়, এবার একটা জায়গায় স্থিতু হয়ে বসবো। এবার আর বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী হবো। আর তাই করতে গিয়ে কোথা দিয়ে দিন-মাস-বছর কেটে গেল, রাত আর দিন একাকার হয়ে গেল, বয়েস গড়িয়ে-গড়িয়ে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে দিলে, কিছুই খেয়াল ছিল না। কত হাজার পাতা লিখলুম, কত হাজার পাতা ছিঁড়লুম, কত বই ছাপা হলো, কত বই কত ভাষায় অনুবাদ হলো, তার হিসেব রাখার সময়ও পেলাম না। কোন্ প্রকাশক টাকা দিলে না, কোন্ প্রকাশক বেশি টাকা দিয়ে ফেললে, তার হিসেবই কি রাখতে পেরেছি ? আর শুধু তাই-ই নয়, আমার নাম জাল করে কত নকল বই আমার নাম দিয়ে বেরোল, কত লোক আমাকে গালাগালি দিলে, কত লোক আমাকে প্রশংসা করলে, আশীর্বাদ করলে, তার হিসেব রাখাও আমার পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

ঠিক এই সময়ে একটা কাণ্ড ঘটলো আমার জীবনে। হঠাৎ এক সিনেমা-কোম্পানির খপ্পরে পড়ে গেলাম। বোম্বাই-এর হিন্দী সিনেমা-কোম্পানি আমার গল্প নিয়ে ছবি করবে, কিন্তু আমার সহযোগিতা চাই চিত্রনাট্যের ব্যাপারে।

শুধু চিত্রনাট্য রচনাই নয়। তাদের সঙ্গে লোকেশানেও যেতে হলো মধ্যপ্রদেশের এক গ্রামে। সেখানে মকরসংক্রান্তির দিন বিরাট এক মেলা হয় ছত্রিশগড়ীদের। বড় সৎ আর সরল মানুষ এই ছত্রিশগড়ের লোকেরা।

কাণ্ডটা সেখানেই ঘটলো।

টিল্‌ডা স্টেশনে নেমে কদমকুঁয়া গ্রামে যেতে হয়। সেখানেই এক নদী আছে। নদীর নাম আড়পা। প্রতিদিন কত অসংখ্য লোক যে সেই নদীর

ওপর দিয়ে এপার-ওপার করে তার ঠিক নেই। আমাদেরও খেয়া নৌকোয় এপার থেকে ওপারে যেতে হলো। আমাদের দলে কম লোক ছিল না। নদীটা চওড়া, তাতে জলও খুব কম নয়। ওপারে গিয়ে সিনেমা কোম্পানির তাঁবু পড়লো। কিছু লোক তার ভেতরে রইলো। আর আমরা ক'জন শুধু রইলাম একটা স্কুল-বাড়িতে।

একেবারে খাঁটি গ্রাম্য স্কুল। সেখানকার গ্রামপঞ্চায়েতই এই স্কুলটা করে দিয়েছে। কদমকুঁয়ার ছত্রিশগড়ী ছেলে-মেয়েরা এই স্কুলে পড়তে আসে। মকর-সংক্রান্তির মেলা উপলক্ষে স্কুলের তখন ছুটি চলছিল। তাই মাস্টার-মশাই-এর তখন কোনও কাজ নেই। আমার নিজেরও তখন কোন কাজ নেই। তাই মাস্টার রামাবতার শর্মার সঙ্গেই বসে-বসে গল্প করি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—সারাজীবন এই অজ্‌পাঁড়াগায়ে থাকতে আপনার খারাপ লাগে না ?

রামাবতারজী বললেন, খারাপ লাগবে কেন ? অন্ততঃ কিছু লোক তো আমার কাছে মানুষ হচ্ছে।

তা বটে। কোথায় সেই বোম্বাই আর কোথায় সেই কলকাতা! তার তুলনায় এই কদমকুঁয়া! ইলেকটিক আলো নেই, তাই রেডিও-টেলিভিশন কিছুই নেই। আর খবরের কাগজের কথা তো না তোলাই ভালো। এই খোলার চালের ঘর, এই মাটির রাস্তা। কিছু দূরেই জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর বাঘ বা বুনো-শুয়োর না থাকাটাই আশ্চর্যের। এখানে লেখা-পড়া জানা এই রামাবতার শর্মা থাকে কী করে ?

রামাবতার শর্মা বললেন—আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি খুব সুখে আছি। অন্তত কিছু লোককে তো আমি মানুষ করে তুলছি—এইটে ভেবেই আমার সুখ।

তারপর বললেন, একটা গল্প শুনবেন মিত্রজী ?

বললাম, বলুন ?

যে গল্পটা শর্মাজী সেদিন বললেন তা বড় অদ্ভুত। সে গল্পটা শুনে সেদিন আমি আমার নিজের সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম।

গল্পটা রাশিয়ার লেখক টলস্টয়ের জীবনের।

রাশিয়ার লেখক কাউন্ট টলস্টয়ের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর কত বই যে বার-বার পড়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর নাম এই কদম্‌-কুঁয়ার ইস্কুল মাস্টার রামাবতার শর্মার মুখে শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই বিশ্ব-বিখ্যাত লেখকের নাম এই ছত্রিশগড়ের অখ্যাত এক গ্রামের মধ্যে বসে শুনতে পাবো, তা আমার তখন কল্পনাতেও আসেনি।

শর্মাজী বললেন—দেখুন মিত্রজী। আমিও ছোটবেলা থেকে আপনার মত একজন লেখক হতেই চেয়েছিলুম। কিন্তু টলস্টয়ের জীবনের একটা ঘটনার কথা শুনে সে আশা ত্যাগ করে আজ এই ছত্রিশগড়ের একটা গ্রামের মাস্টার হয়েছি—

জিজ্ঞেস করলাম—ঘটনাটা কী ?

শর্মাজী গল্পটা বলতে লাগলেন। তিনি তখন নিজের ঘরের ভেতরে বসে নিজের ভাত রান্না করছেন, আর রান্না করতে-করতেই গল্পটা বললেন।

সে বহুদিন আগের কথা। সালটা ১৯০৯। রাশিয়ার একটা ছেলে বাবা-মা'কে লুকিয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে একটা চিঠি লিখতে লাগলো। অনেকগুলো কাগজ নষ্ট করেও চিঠির লেখাটা তার পছন্দ হলো না। এই রকম বার-বার লেখার পর শেষকালে একটা চিঠি কোন রকমে খাড়া করে ফেললে সে। ছেলেটির বয়েস তখন মাত্র আট বছর।

আট বছর বয়েসের একটা ছেলে এমন করে কাউকে চিঠি লিখতে পারে, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বানান ভুলে ভর্তি, বাঁকাচোরা লাইন, চোতা কাগজ। চিঠিখানা সে একদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে পাড়ার ডাকবক্সে ফেলে দিলে।

কিন্তু তারপর ? তারপর সে-চিঠির উত্তর আর তার কাছে এল না। যে-চিঠিটা সে লিখেছিল, তার কথাও সে ভুলে গিয়েছিল। কারণ চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা বরাবর মনে রাখতে হবে। এইটুকু শুধু মনে ছিল যে সে তাতে লিখেছিল—"ডিয়ার কাউন্ট্ টলস্টয়, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। পৃথিবীতে আপনাকেই আমি সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। আমি বড় হয়ে একদিন আপনার মত সাহিত্যিক হতে চাই। তাই আমি আপনার আশীর্বাদ কামনা করি। ইতি—"

ছোট চিঠি। কিন্তু যিনি বহু লোকের শত-শত চিঠি রোজ পান, তিনি কেন সামান্য একটা আট বছর বয়েসের ছেলের বানান-ভুল চিঠির উত্তর দেবেন ? তাঁর অত সময় কোথায় ? তাঁকে তো আরো বড়-বড় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।

কিন্তু না, একদিন সত্যিই উত্তর এল টলস্টয়ের। ছেলেটার বাবা-মা দু'জনেই সেদিন তাদের বাইরের ঘরে বসে আছেন, এমন সময়ে একজন পোস্ট্-ম্যান একটা চিঠি দিয়ে গেল তাঁদের হাতে। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন চিঠিটা বুঝি তাঁদেরই। কিন্তু তা নয়। চিঠির ওপরে তাঁদের আট বছর বয়েসের ছেলের নাম-ঠিকানা লেখা।

আশ্চর্য। আট বছর বয়েসের ছেলেকে কে চিঠি লিখলো।

তাড়াতাড়ি তাঁরা চিঠির মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললেন। পত্রদাতার নাম পড়ে

তাঁরা তো অবাক! চিঠি লিখেছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়। টলস্টয় লিখেছেন ঃ

"Seryojna Yermoluisky.
Senegovaya st. no. 7. Flat no. 1 Villinus.
Yasanaya Polyana March 25.1909.

Your wish to become a writer is a wicked wish, for it means that you want worldly fame for yourself. It is just wicked vanity. One should have only one desire to be kind, not to offend, not to censure and not to hate anyone, but to love everybody.

Lev Tolstoy"

এর ভাবার্থ হলো এই যে—"তোমার লেখক হওয়ার ইচ্ছেটা হচ্ছে বদ্-ইচ্ছে। এর মানে হচ্ছে, তুমি নিজের জন্যে জাগতিক খ্যাতি চাও। এটা একটা বদ্ দাম্ভিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারোর প্রতি নিষ্ঠুর হবো না, কারোর প্রতি দোষারোপ করবো না, কাউকে আঘাত দেব না, সকলকে ভালোবাসবো—এইটেই মানুষের প্রথম আর প্রধান কামনা হওয়া উচিত"।

ইতি—লিও টলস্টয়।

রামাবতার শর্মাজী এবার থামলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

রামাবতার শর্মা বললেন—চিঠিটা পড়ে আট বছর বয়েসী ছেলেটি কিছুই বুঝতে পারলে না। চিঠিটাতে টলস্টয় যা লিখেছিলেন, তার তাৎপর্য বোঝবার মত বয়েস তখন ছেলেটির হয়নি। ছেলেটির মনে শুধু সমস্যা জাগলো একটা। তবে কি লেখক হওয়া খারাপ?

কথাটা বড় জটিল। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে খারাপ নয়, ইঞ্জিনীয়ার ইচ্ছেও খারাপ নয়, উকিল-ব্যারিস্টার-এ্যাকাউনটেন্ট হওয়ার ইচ্ছেও খারাপ নয়। তবে কি শুধু লেখক বা সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছেটাই খারাপ? যশ-প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছেটাও খারাপ?

অথচ সবাই-ই তো অর্থ-যশ-প্রতিষ্ঠা চায়।

কথাটা ভাবিয়ে তুললো সেই আট বছর বয়েসের ছেলেটিকে।

কিন্তু ছেলেটির বাপ-মায়ের মনে খুব আনন্দ। তারা তখন কৃতার্থ হয়ে গেছেন। তাঁদের ছেলেকে টলস্টয় চিঠি লিখেছেন, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?

রাতারাতি ছেলেটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে গ্রামের মধ্যে। সে রাস্তা দিয়ে

গেলে অন্য লোকেরা আঙুল দিয়ে দেখায়। বলে—ওই দ্যাখ্, ওই ছেলেটা।

বাড়িতেও ভিড় জমতে লাগলো শেষকালে। দূর-দূর গ্রাম থেকে লোকজন ছেলেটা আর টলস্টয়ের চিঠিটা দেখতে আসতে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীর লোক যে-মহাপুরুষকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, সেই তিনিই চিঠি দিয়েছেন। তিনি চিঠি লিখেছেন নিজের হাতে। ও এক রকমের বিস্ময়কর ঘটনা।

তারপর আর এক মজার ঘটনা ঘটলো।

সেই গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকেই একখানা করে চিঠি যেতে লাগলো টলস্টয়ের নামে। সবাই টলস্টয়ের হাতের লেখা চিঠি চায়। কেউ চিঠি লেখে উপদেশ চেয়ে, কেউ চিঠি লেখে আশীর্বাদ চেয়ে। কেউ দেখা করতে চায়। কেউ আবার চায় একটা ফটোগ্রাফ-অটোগ্রাফ দেওয়া। সবারই ওই এক কথা। ভালো কাগজে শুদ্ধবানানে লাইন সোজা করে সবাই-ই লিখলে—শ্রদ্ধেয় টলস্টয়, আমি বড় হয়ে একজন লেখক হতে চাই, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

কিন্তু তখন ১৯১০ সাল। সে সব চিঠি টলস্টয়ের কাছে পৌঁছোল কিনা কে জানে। কারণ সেই বছরেই ২০শে অক্টোবর তারিখে তিনি মারা গেলেন। তাই সেই গ্রামের আর কোনও ছেলেই তাদের সে-সব চিঠির কোনও জবাব পেলে না তাঁর কাছ থেকে।

রামাবতার শর্মা থামতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

রামাবতার শর্মা বলতে লাগলেন—তারপর আর কী। ছোটবেলা থেকে আমারও অন্য ছেলেদের মত লেখক বা সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু টলস্টয়ের ওই চিঠির ঘটনা জানার পর থেকেই আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তখন মনে হলো যে আমার লেখক হওয়ার বাসনাটা আসলে আমার অহঙ্কারের বাসনা, আমার আত্মপ্রচারের বাসনা, আমার নীচতার বাসনা। মানুষের জীবনের আসল কামনা হওয়া উচিত পরকে আপন করার সাধনা, দূরকে কাছের করবার সাধনা, সেই উদ্দেশ্যেই আমি আর লেখক হওয়ার চেষ্টাই করিনি। লেখা বন্ধ করে দিয়ে এখন আমি এই অজ পাড়াগাঁয়ে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবার সাধনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

তারপর শর্মাজী একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে সিনেমা-পার্টি বোম্বাই থেকে এখানে শুটিং করবে এর স্টোরি-রাইটার কি আপনি?

বললাম—হ্যাঁ, স্টোরি-ডায়ালগ, দুটোই আমি লিখেছি। কিন্তু ওই যে আপনি টলস্টয়ের চিঠিটার কথা বললেন, ও ঘটনাটা কি কোনও বইতে পড়েছেন? যদি পড়ে থাকেন তো সে বইটার নাম কী, আর কোথায়ই বা তা কিনতে পাওয়া যাবে?

শর্মাজী বললেন—ওটা শুনেছি ঘাটবাবুর কাছে।

বললাম—ঘাটবাবু? ঘাটবাবু কে?

রামাবতার শর্মাজী বললেন—ওই যে যিনি আপনাদের নদী পারাপার করে দিয়েছেন। ওপারে তো আপনারা মকর-সংক্রান্তির মেলার শুটিং করতে গিয়েছিলেন। ওই মেলার জন্যে রোজ হাজার-হাজার লোক এপার-ওপার করছে, ওই ঘাটবাবু নিজে নৌকা বেয়ে সবলকে খেয়া পারাপার করে দেন। তার জন্যে কারো কাছে একটা পয়সাও নেন না। আপনি দেখেছেন তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম—সেই মাথায় পাগড়ি-পরা লোকটা?

—হ্যাঁ, উনিই আমাদের ঘাটবাবু। এই স্কুলটা ওরই টাকায় তৈরি করে দেওয়া। এই স্কুলটাই শুধু নয়, এখানে আদিবাসী ছেলেদের জন্যে একটা লাইব্রেরীও করে দিয়েছে ওই ঘাটবাবু। আগে এখানে আদিবাসীদের জন্যে খৃষ্টান মিশনারিরা হাসপাতাল ডাকতারখানাও করে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে আদিবাসীদের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওষুধ নিতে হতো। হাসপাতালের দারোয়ান-চাপরাশিরা অনেক ঘুষ নিত, কিন্তু ঘাটবাবু যে হাসপাতাল করে দিয়েছে, তাতে ও-সব তকলিফ নেই। ঘাটবাবু শুধু দাওয়াই-এর ব্যবস্থাই করেনি, সঙ্গে-সঙ্গে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। বিনা পয়সায় তারা সাবু-বার্লি পায়। এখানকার ইস্কুল থেকে পড়ে ছেলেরা নাগপুর থেকে ডাক্তারি পাশ করে এখন এখানে এসে এই হাসপাতালে ডাক্তার হয়েছে। এখন আর কোনও আদিবাসীকে খৃষ্টান মিশনারিদের হাসপাতালে ইলাইজের জন্যে যেতে হয় না। মিশনারি সাহেবরাও তাদের হাসপাতাল এখান থেকে পেন্ড্রা রোডে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

রামাবতার শর্মাজীর কাছে এখানকার ঘাটবাবুর কাহিনী শুনতে-শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কদমকুঁয়া তখন নিথর, নিস্পন্দ। আমাদের সিনেমা-পার্টির লোকরা তখন বোধহয় তাদের ট্রানজিসটার খুলে দিয়ে রেডিওর 'বিবিধ-ভারতী'র গান শুনছে। তার সুর মাঝে-মাঝে কানে ভেসে আসছে।

চারদিকের দেওয়ালের গায়ের আলমারিতে অনেক বই থরে-থরে সাজানো রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম—অত বই কার? কে অত বই পড়ে?

শর্মাজী বললেন—ও বই সব ঘাটবাবুর—ওরও লেখক হওয়ার নেশা ছিল। কিন্তু টলস্টয়ের ওই চিঠিটা পড়বার পর থেকেই উনি লেখা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে এই ঘাটবাবু হয়েছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন—ওই যে ঘাটবাবু এসে গেছেন—

আমি দেখলাম সেই ঘাটবাবু ঘরে ঢুকছে। মাথায় পাগড়ি, গায়ে ফতুয়া, খাটো ধুতি আর পায়ে দেহাতি জুতো। মনে পড়লো এই ঘাটবাবুই আমাদের

সিনেমা-পার্টির লোকদের আড়পা নদীর ওপারে খেয়া বেয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে আমি চিনতে পারিনি। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলতেই আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

আমি লাফিয়ে উঠলাম—আরে অনাদি না?

অনাদিও তখন আমার দিকে চেয়ে চিনতে পেরে বললে—আরে, তুই?

আমি তখন অনাদিকে সামনে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললাম, তুই আমাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছিস ভাই—

বলে সঙ্গে-সঙ্গে তার পায়ে হাত দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই সে আমাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলে। বললে—ছি ছি, তুই পায়ে হাত দিচ্ছিস কী বলে? আমরা তো সবাই সমান রে! কেউ বড় নই কেউ ছোট নই, সবাই আমরা সমান·····তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি······

তার কথা শুনতে-শুনতে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না, আমার দু'চোখ বেয়ে তখন শ্রাবণের ধারা নামতে শুরু করেছে······

আমি তখন ভাবছি, কবে আড়াই হাজার বছর আগে কোন্ এক রাজার ছেলে পথে নেমে এসে বুদ্ধদেব হয়ে গিয়েছিল, আর এ-যুগে তেমনি আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। এক কোটিপতির ছেলে অনাদি মুখার্জি কার লেখা একটা বই পড়ে কোন্ এক যাদু-মন্ত্রে হয়ে গেল ঘাটবাবু!

———

দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এমনও হয়! প্রথমে চিনতে পারিনি! এ কার সঙ্গে কথা বলছি!

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—সপ্তাহে একদিন মাংস খেতে হবে!

সামর্থ্য থাক আর না-থাক, প্রোটিন খেতেই হবে। বিংশ শতাব্দীর নতুন হুজুগ প্রোটিন। এতে গরীব-বড়লোকের প্রশ্ন নেই, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিচার নেই। কিছু ওষুধ কোম্পানীর লাভ-লোকসানের খেসারত দিতে হবে আমাদের মত সাধারণ গৃহস্থ লোককে।

তা মাংসের দোকানে গিয়ে প্রথমে চিনতে পারিনি। একজন ভদ্রলোক দোকানের ভেতরে বসে ছিলেন। টেরিলিনের সার্ট-প্যান্ট। গলাই টাই। হাতে রিস্ট্‌ওয়াচ্‌। চুল ব্যাক্‌-ব্রাশ করা।

জিজ্ঞেস করলাম—মাংসওয়ালা কোথায় গেল?

ভদ্রলোক বললেন—আমিই মাংসওয়ালা, কী চাই বলুন? মাংস কিনবেন?

আমি অবাক। বললাম—আপনিই!

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—হ্যাঁ আমিই। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি মাংস বিক্রি করতে পারি? লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পি-এইচ্‌-ডি। মিলটনের ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছিলাম। শেষকালে কোনও চাকরি না পেয়ে এই মাংসের দোকান করেছি। আর আমি তো একলা নয়। ওই যে রাস্তার ও-ফুটে বিঁড়ি বাঁধছে এক ভদ্রলোক—উনি আগে ছিলেন জলপাইগুড়ি ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার, ছেলেরা বোমা মেরে ওর পা খোঁড়া করে দিয়েছিল। শেষকালে কোনও উপায় না পেয়ে ওই বিঁড়ির দোকান করেছেন—

তারপর থেমে বললেন —আপনার কত মাংস চাই ?

বললাম—পাঁচশো গ্রাম—

ভদ্রলোক একটা ভোজালি নিয়ে মাংস কাটতে লাগলেন। হঠাৎ আমার নজরটা পড়লো দেয়ালের দিকে। দেখি একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। ক্যালেণ্ডারের মাথায় সাল ও মাস লেখা। কিন্তু ছাপার ভুল রয়েছে, ১৯৭০-এর জায়গায় ১৯৯০ লেখা রয়েছে। আমি তখন ভুলটা বললাম।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি কোন দেশের লোক ? এটা ১৯৭০ কোথায় ? এটা তো ১৯৯০। ঠিকই তো লেখা আছে—

বলে ভদ্রলোক আমার বোকামী দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর তার সেই হাসির শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমি আমার নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছি। দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ছিল সেইদিকে তাকিয়ে দেখলাম। লেখা আছে ১৯৭০, এপ্রিল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমন দুঃস্বপ্ন কেন দেখতে গেলাম ? ভাবলাম একি আকাঙ্খার প্রতিরূপ, না আমার দূর-দৃষ্টি।

কে জানে।

———

# নাম

এ দেশ বড়ো সাংঘাতিক দেশ। এখানে খ্যাতি বড়ো দুর্লভ। এখানে খ্যাতি সহজে আসে না। এখানে আমীর ওমরাহ থেকে শুরু করে সামান্য রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত টাকার কাঙাল হোক্ আর না হোক্, নামের কাঙাল সবাই। অন্ততঃ রিক্সাওয়ালারও যে আবার খ্যাতির কাঙাল হয়, তার একটা নজির আমি এই গল্পের মধ্যেই দেবো। সখের বাজারের এক রিক্সাওয়ালাই এই গল্পটার জ্বলন্ত প্রমাণ।

রিক্সাওয়াটাকে সবাই দেখেছে। সখের বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্যাসেনজারেরা তাকায়। খালি পা, খালি গা, খালি মাথা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কিন্তু তার নামটা যে কী, তা লোকে কেমন করে জানবে ?

জানা গেল অদ্ভুত উপায়ে। সেটা কী করে জানা গেল, এবার শোনো।

সখের বাজারের মোড়ের মাথায় একটা বিরাট শিরীষ গাছ ছিল, বহুকালের গাছ। ডালপালা বেরিয়ে সমস্ত জায়গাটা ছায়া করে রাখতো। একদিন হঠাৎ ভোরবেলা কে একজন ওপর দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলো—সাপ—!

দু'চারজন যারা ছিল, তারাও দেখলে—একটা ময়াল সাপ শিরীষ গাছটার ডগায় মোটা একটা ডাল জড়িয়ে নিচু দিকে মুখ ক'রে রয়েছে। নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে জিভ্‌টা চুকচুক করে এক-একবার বার করেছে।

দু'জন থেকে চারজন, চারজন থেকে দশজন। এমনিভাবে ভিড় বাড়তে লাগলো। হরিশবাবু অফিসে বেরিয়েছিলেন—তাঁর আর অফিস যাওয়া হলো

না। তিনি সাপ দেখে সেখানেই থমকে দাঁড়ালেন। বাসে ওঠবার জন্যে যাঁরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তারাও এসে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সাপ দেখতে লাগলো। বাসের ড্রাইভার—কন্‌ডাক্টরেরাও এক ফাঁকে সাপটাকে দেখে নিয়ে গেল। মোট কথা, সখের বাজারে সেইদিন সকলের কাজকর্মের দফা-রফা হয়ে গেল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত ভিড়, যাকে কেন্দ্র ক'রে এত জটলা, সেই সাপটা কিন্তু নির্বিকার। তেতলা সমান উঁচু থেকে যেমন নিচের দিকে চেয়ে ছিল, তেমনি চেয়েই আছে। নড়েও না, চড়েও না শুধু চুক্‌চুক্ করে একবার জিভ্ বার করে।

পাড়ার 'বান্ধব সমাজে'র সেক্রেটারি পান্নালাল বাজারে গিয়েছিল। সাপের খবর শুনে বাজারের থলিটা বাড়িতে রেখেই দৌড়ে এসেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো। বললে, আপনারা এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন? এখনও কোনো স্টেপ্ নেননি? আলিপুর চিড়িয়াখানাতে খবর দিয়েছেন।

চিড়িয়াখানা। কথাটা সকলের কানেই গেল।

পান্নালাল বললে—চিড়িয়াখানায় এখুনি খবর দিলেই তারা এসে ধরে নিয়ে যেতো সাপটাকে। তাহ'লে আর কোনো হাঙ্গামা থাকতো না—

পান্নালাল একাই নয়। বান্ধব-সমাজের আরও সব হোমরা-চোমরা পাণ্ডারা এসে পড়েছিল, তারাও সেই একই কথা বললে। এটা তো চিঁড়িয়াখারই ডিউটি। খবর দিলেই লোক চলে আসবে।

তা সেই ব্যবস্থাই বহাল হলো। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন করে সমস্ত ঘটনাটা বলা হলো। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জিপ গাড়িতে এসে হাজির হলো লোক, সঙ্গে চটের থলে, লম্বা একটা দড়ি, আর একটা সরু বাঁশ।

আঁলিপুর চিড়িয়াখানার সতীশবাবু বহুদিনের পুরোনো লোক। এই সাপ ধরাই তার কাজ। বিশ বছর ধরে এই কাজই করে আসছেন তিনি। জিপ থেকে নেমে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভালো করে ঘুরে-ঘুরে সাপটাকে দেখলে সতীশবাবু। তারপর বললে—আপনাদের একটা কাজ করতে হবে স্যার—

পান্নালাল গলা বাড়িয়ে বললে—কী কাজ বলুন?

সতীশবাবু বললে—আপনারা কেউ একজন গাছে উঠে এই বাঁশ দিয়ে সাপটাকে খোঁচা দিয়ে দিন—খোঁচা দিলেই সাপটা মাটিতে পড়ে যাবে। তখন আমি নিচে থেকে সাপটাকে থলিতে পুরে ফেলবো—

পান্নালাল সখের বাজারের 'বান্ধব সমাজ'-এর সেক্রেটারি। কথাটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। কে উঠবে গাছে! কার এত সাহস?

সতীশবাবু বললে—আমি গাছে উঠে খোঁচা দিতে পারি—কিন্তু তাহ'লে আপনাদের নিচের থেকে সাপটাকে ধরতে হবে—

তাতে কেউ রাজি নয়। ভিড়ের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। হরিশবাবু, পরেশ সান্যাল, তারাও শুনলেন! কার এমন বুকের পাটা যে সাপের বুকে খোঁচা দেবে।

হরিশবাবু সাবধান ক'রে দিলেন। বললেন—তোমরা এত কাছে যেও না হে। ছুটে এসে কামড়াতে পারে। সাপ বলে কথা।

পরেশ সান্যাল বললেন-এর তো একটা বিহিত করতে হয় দাদা, পাড়ার মধ্যে সাপ, এ কেমন কথা! কোত্থেকে এলো?

পরেশ সান্যাল বললেন—তোমরা ছোকরা মানুষ, তোমরা কেউ ওঠ না গাছে—

কেউ রাজি নয় গাছে উঠতে। আস্তে-আস্তে ভিড়টা যেন পাতলা হতে শুরু করলো, সবাই এ-ওর মুখের দিকে চায়। সবাই চায় একজন কেউ উঠুক—তারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে! পনেরো মিনিট কেটে গেল, কেউ রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত সতীশবাবু বললেন, আপনারা কেউই যখন রাজি নন—তখন আমি চলে যাই।

হঠাৎ কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠলো—আমি রাজি হুজুর, আমি উঠতে পারি—

সবাই ফিরে চেয়ে, দেখলে সখের বাজারের সেই রিক্সাওয়ালা, খালি পা, খালি গা, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা চেহারা।

—আমি সাপটাকে ধরতে পারি, হুজুর।

সতীশবাবু বললে—পারবি তুই? তাহ'লে ওঠ গাছে, এই বাঁশটা নিয়ে ওঠ—

রিক্সাওয়ালাটা বললে—কিন্তু একটা কথা দিতে হবে হুজুর—

সতীশবাবু বললে—কী কথা?

—আজ্ঞে, চিড়িয়াখানার কাঁচের ঘরে আমার নাম ছেপে দিতে হবে যে আমি সাপটাকে পেড়ে দিয়েছি।

সতীশবাবু বললে—তা দেবো। তুই ওঠ তো গাছে—

পান্নালাল এগিয়ে এলো। বললে—তা কী করে হয়? একটা রিক্সাওয়ালার নাম হয়ে যাবে অমনি-অমনি?

সবাই সেই কথাই বললে। হরিশবাবু পরেশ সান্যাল, আর আর মাতব্বররাও সবাই আপত্তি করলেন। কোথাকার কে তার নেই ঠিক, সরকারী খাতায় তার নাম উঠে যাবে ছাপার অক্ষরে। পাড়ার পাঁচজন

ভদ্রলোক থাকতে শেষে কিনা একটা রিক্সাওয়ালার খ্যাতি হয়ে যাবে চিরকালের মতো ? তাই কখনো হয় ? লোকে বলবে কী ? না-না মশাই, অত বেয়াড়া আবদার ভালো নয়।

রিক্সাওয়লাটা বললে—তাহ'লে আপনারাই সাপ পাড়ুন। আমার নামেরও দরকার নেই—

পান্নালাল বললে—তুমি চটছো কেন হে; আমরা তো অন্যায় কিছু বলিনি। তোমার নাম দিলে লোকে বলবে কী ? শেষে তো পাড়ারই বদনাম! লোকে দেখে বলবে, সখের বাজারে আর লোক ছিল না ?

রিক্সাওয়ালাটা বললে—আমিও তো তাই বলছি বাবু, আপনারাই পাড়ুন, আপনাদেরই নাম হোক—

পরেশ সান্যাল বললেন,—তার চেয়ে এক কাজ কর না বাবা, চার গণ্ডা পয়সা দিচ্ছি, চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে সাপটাকে পেড়ে দে—লক্ষ্মী বাবা আমার, দেখ্‌ছিস বিপদে পড়েছি—

—না হুজুর, পয়সা চাই না, আমার নাম চাই—

পান্নালাল বললে—খুব তো নামী লোক দেখছি রে তুই, তা চার আনা পয়সায় রাজি না হোস্, আরও চার আনা দিচ্ছি, আট আনা মোট; এবার তো রাজী ?

—না হুজুর, আটআনাই দিন আর আট টাকাই দিন, আমি নাম চাই—

সবাই রিক্সাওয়ালার জিদ দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। বেটা নামের কাঙাল, পয়সার চেয়ে নামটাই তোর বড় হলো রে!

সতীশবাবু বললেন, আর দেরি করতে পারি নে স্যার। একটা সাপ ধরতে চোপর দিন লাগাব নাকি ? যা হয় আপনারা একটা ঠিক করুন কিছু, আপনারা যার নাম বলবেন, তার নামই ছাপা হবে।

শেষে পরামর্শ হতে লাগলো মাতব্বরদের মধ্যে, পরামর্শ শেষে পান্নালাল বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, তোর কথাই রইল, তুই ওঠ, তোর নামই ছাপা হবে।

রিক্সাওয়ালা বললে, একটা সাপ কতদিন বাঁচে হুজুর ?

পান্নালাল বললে—পঞ্চাশ, ষাট একশো বছর—

—যতদিন সাপটা বেঁচে থাকবে, ততদিন আমার নামটা থাকবে তো ?

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ—

—তাহ'লে আমার নামটা আগে একটা খাতায় লিখে নিন হুজুর, শেষে গণ্ডগোলের মধ্যে যদি ভুলে যান!

পান্নালাল পকেট থেকে ডায়েরী বই আর কলম বার করে বললে—কী নাম তোর, বল্ ?

—লিখুন হুজুর, শ্রীরুক্মিনী হরণ দাস, গ্রাম বিষ্টুপুর, পোষ্টাফিস কাঁঠিপোতা, জেলা বাঁকুড়া, পিতা···

—থাক-থাক আর পিতার নাম দরকার নেই, তুই উঠে পড় বাবা, এখন বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর আগে······

তখন রিক্সাওয়ালা 'জয় মা কালী' বলে গাছে উঠে পড়লো। উঠতে-উঠতে একেবারে গাছের ডগায় গিয়ে, উঠলো। তারপর বাঁশের আগা দিয়ে একটা খোঁচা দিতেই সাপটা ধপাস্ করে মাটিতে পড়লো, আর নিচে সতীশবাবু তৈরিই ছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে দড়ি দিয়ে সেটাকে বেঁধে একেবারে থলির মধ্যে পুরে ফেলেছেন।

তারপর এতক্ষণ যত ভিড় জমেছিল, সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো গাড়ির কাছে। সতীশবাবু থলিটা গাড়িতে তুলে নিয়ে দড়ি দিয়ে মুখটা বেঁধে ফেলেছেন। তারপর কাজ শেষ করে গাড়ি ছেড়ে দিলে। পাড়াসুদ্ধ সমস্ত লোক হৈ-হৈ ক'রে উঠলো। গাড়িটা ধুলো ধোয়া উড়িয়ে চলে গেল কলকাতার দিকে।

আপনারা এখনো চিড়িয়াখানায় যদি যান, সাপের ঘরে গেলে দেখতে পাবেন ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে সেই ময়াল সাপটা একটা কাঁচের ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। লোকজন সামনে গেলে চোখ পিট-পিট ক'রে শুধু চেয়ে দেখে, আর বাক্সোটার একটা কোণের দিকে লেখা আছে 'Presented by 'Bandhab samaj', sakher Bazar'—'সখের বাজার বান্ধব সমাজ' কর্তৃক প্রদত্ত উপহার।

———

# সেই দিনটি

১৯৩৩ সালের কথা। তারিখ বা দিনটা মনে নেই। কিন্তু মনে আছে সন্ধে তখন সাতটা। সন্ধের পর আমি একটা রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছি। উল্টোদিক দিয়ে আমার এক বন্ধুও তখন বাড়ি ফিরছে। তার নাম দ্বিজেন ব্যানার্জি। সে ফিরছে অফিস থেকে আর আমি কলেজ থেকে। দু'জনেই দু'জনকে দেখে খুশি। অনেকদিন পরে দেখা। তাই সেখানে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা ধরে আমাদের কথা হতে লাগল।

কথায়-কথায় দ্বিজেন জিজ্ঞেস করল—তোমার এখন বয়েস কত হ'ল বিমল ?

বললাম—একুশ।

সে আমার চেয়ে চার বছরের বড়। অর্থাৎ তার বয়েস তখন পঁচিশ।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, বলো তো, মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কী ?

প্রশ্নটা শুনে আমি তো অবাক। আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে কী তা আমি ভেবে উঠতে পারলাম না। আমার পক্ষ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে সে নিজেই উত্তরটা দিলে। বললে—মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে দুঃখ। মনে কোনও দুঃখ না থাকলে কোনও মানুষ কখনও মহান হতে পারে না। সক্রেটিস, যীশুখৃস্ট, বুদ্ধদেব—তাঁরা সবাই যে এখনও প্রাতঃস্মরণীয়

হয়ে আছেন, তার কারণ তাঁরা চরম দুঃখী ছিলেন। দুঃখই তাঁদের মহাপুরুষ করেছে।

তার উত্তর শুনে আমি যেন নতুন এক সত্য আবিষ্কার করলাম।

তারপর সে আবার একটা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা বলো তো বিমল, পৃথিবীতে সবচেয়ে পাওয়ারফুল কে?

প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—তার মানে?

—মানে, কে সবচেয়ে শক্তিমান?

এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব! দেশের প্রেসিডেন্ট বা দেশের প্রাইম মিনিস্টারই তো সবচেয়ে শক্তিমান। তাদের হাতে অ্যাটম বোমা, সৈন্য-সামন্ত, কামান-বন্দুক, সমস্ত কিছু!

দ্বিজেন বললে—না, সবচেয়ে শক্তিমান হচ্ছে 'সময়'।

সময়! কথাটা আমাকে খুব নাড়া দিয়ে দিলে! এতদিন তো আমাকে একথা কেউই বলেনি।

আমার মানসিক অবস্থাটা সে কল্পনা করে নিলে। সে আমার চেয়ে মাত্র চার বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও এত কথা জানতে পারলে কী করে? পরে বুঝেছিলাম তারও দুঃখ ছিল—প্রচণ্ড দুঃখ।

কথা বলতে-বলতে অনেক সময় কেটে যাচ্ছিল। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাচ্ছিল, তা কারুরই খেয়াল ছিল না। অনেকদিন পরে তার সঙ্গে আমার দেখা, সুতরাং আমরা মনের সুখে দু'জনের মনের কথা বলে যাচ্ছিলাম।

এরপর হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসল—তুমি তো আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। তার মানে তোমার বয়েস তাহ'লে এখন একুশ—

বললাম—হ্যাঁ—

দ্বিজেন বললে—দেখ, তোমার জীবনের এই একুশটা বছর তো গোলমালের মধ্যেই কেটে গেল, বলো, সত্যি কিনা?

আমাকে স্বীকার করতেই হলো যে সত্যিই তাই। বারো-তেরো বছর বয়েস থেকেই আমার বাসনা ছিল যে আমি একজন সাহিত্যিক হব। একটা সস্তার মেসে থেকে লিখে মাসে পঁচিশ টাকা উপায় করলেই আমার দিন চলে যাবে। কোনও দিন সংসার করব না, ব্যবসা করব না, চাকরি করব না। খালি এক মনে গল্প-উপন্যাস লিখব। পঁচিশ টাকা তখন অনেক টাকা। সেই পঁচিশ টাকা উপায় করতে পারলেই আমি আমার নিজের খরচা চালিয়ে নিতে পারব, আর কারও দাসত্ব করতে হবে না। এই ছিল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল মাঝারি রকমের, তাই বোধহয় অর্থের ওপর কোনও কালেই আমার তত আকর্ষণ ছিল না।

আর তাছাড়া ছাত্রজীবনে সেই সতেরো বছর বয়েস থেকেই আমি গল্প লিখে মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা উপার্জন করি।

বাবা জিজ্ঞেস করেন—তুমি কলেজের মাইনে তো আমার কাছ থেকে নিচ্ছ না?

আমি জবাব দিই—আমি নিজেই চালিয়ে নিচ্ছি—

শুধু গল্প নয়। গানও লিখি। এক-একটা গান লিখে বারোটা করে টাকা পাই। সেই গান তখন বড়-বড় গায়করা রেকর্ড করে। আর গল্প লিখেও পাই ষোল থেকে আঠারো টাকার মতন।

কিন্তু তবু আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয় না।

তাই দ্বিজেনের কথা সত্যি বলেই মনে হ'ল। ভেবে দেখলুম, সত্যিই আমার জীবনের একুশটা বছর শুধু গোলমালের মধ্যেই কেটে গেছে।

দ্বিজেন বললে—এখন তো তোমার একুশ বছর বয়েস হলো, এর পরে যখন তোমার বয়েস একত্রিশ হবে, তখনও দেখবে জীবনটা এমনি গোলমালের মধ্যেই কেটে গেছে—

দ্বিজেনের কথায় তখন ভয় পেয়ে গিয়েছি।

দ্বিজেন আবার বলতে লাগল—তারপর যখন একদিন তোমার একচল্লিশ বছর বয়েস হবে, তখনও দেখবে গোলমালের মধ্যেই তোমার জীবনটা কেটে গেছে। তারপর একদিন একচল্লিশ থেকে একান্ন বছর বয়েস হবে, তখনও দেখবে শুধু গোলমালের মধ্যেই তোমার জীবনটা কেটে গেছে। তারপর একদিন একান্ন থেকে একষট্টি হবে, একষট্টি থেকে একাত্তর হবে, একাত্তর থেকে একাশি হবে। তখনও যদি বেঁচে থাক তো দেখবে, সমস্ত জীবনটাই তোমার গোলমালের মধ্যে কেটে গেছে। কিন্তু তখন আর শোধরাবার সময় নেই। দেখবে তোমার সমস্ত জীবনটাই পুরোপুরি গোলমালের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে শতকরা একশ জন মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি—

দ্বিজেনের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর ঘুম এল না। তাহ'লে কি সকলেরই এই রকম হয়? সকলের জীবনের ট্র্যাজেডিই কি এই একই? জানাশোনা আশেপাশের সমস্ত লোকেদের জীবন পর্যালোচনা করে দেখলাম কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। পাড়ার যারা বুড়ো-বুড়ো মানুষ তাদের কথাও মনে পড়ল। তাদের সবাই-ই তখন ব্যর্থ জীবনের ভার বয়ে-বয়ে ক্লান্ত অবসন্ন। সবাই যৌবনে ভাল-ভাল ব্যবসা বা চাকরি করেছেন, ভাল মাইনেও পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনের প্রায় সমস্ত কাজের যোগফলই তখন শূন্য। তাঁরা

তখন অবহেলিত, নিঃসঙ্গ, নিঃশেষিত। ভাবলাম এরকম দশা তো একদিন আমারও হবে! তখন? তখন কী করবো?

এর থেকে বাঁচবার কী উপায়?

সেই রাত থেকেই ভাবতে আরম্ভ করলাম। ছটফট করতে লাগলাম। এর কিছু একটা বিহিত করতে হবে, এর কিছু একটা প্রতিকার করতেই হবে।

কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে বাবার দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল। তিনি আর দেরী করলেন না। একদিন সোজা ছেলেকে নিয়ে গিয়ে একটা সরকারী চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। একেবারে ভাল মাইনের পাকা চাকরি। বললেন— চাকরি পাওয়াটাই শক্ত; ছাড়তে একমিনিটও লাগবে না'।

তিনি তো কথাটা বলেই খালাস। কিন্তু মুক্তি পাওয়া কি অত সোজা! চাকরিতে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলের চাকরিতে একের পর এক প্রমোশন হতে লাগল। মাইনে যত বাড়ে, ছেলের মনে তত ভয় হয়। বেশি মাইনে হয়ে গেলে শেষকালে ছেলে চাকরি ছাড়বে কী করে!

শেষকালে একদিন 'দ্বিজেনে'র কথাগুলো মনে পড়ল। তখন ছেলের একচল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে। তাহ'লে বাকি জীবনটাও কি এমনি গোলমালের মধ্যেই কেটে যাবে? আর তারপর সেই দিনই সেই চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। পেনসনটা পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করলাম। না, আর গোলমালের মধ্যে জীবনটা শেষ করতে চাই না। তখন থেকেই শুরু হলো আমার দিন-রাত লেখা। শুধু লেখা আর লেখা। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল লেখা ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না তখন। আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ছিল পড়া।

এখনও সেই দ্বিজেনের কথাগুলো মনে আছে। কিন্তু একষট্টি বছর বয়েসে পূর্ণ হওয়ার পর আর রাত জাগতে পারলাম না। আমার ট্রাজেডি এই যে এখন অন্য সকলের মত আমাকেও রাত্রে ঘুমোতে হয়। তবে ওষুধ খেয়ে।

তাই আজ দূর থেকে দ্বিজেনকে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত আমি যে জীবনটা পুরোপুরি গোলমালের মধ্যে কাটিয়ে দিইনি, এর সমস্ত কৃতিত্বটা তো তারই। সে সেদিন আমাকে অমন করে সাবধান না করে দিলে আজ যে আমার অনুতাপের অন্ত থাকত না, সেই কথা ভেবেই আমি আজ এই বয়েসে তার কাছে কৃতজ্ঞ।

আর দুঃখ? দুঃখটা আমার পরম সম্পদ, সেটাকে আমি খরচ করিনি। সেটা আমি আমার জীবনের ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিটে জমা রেখে দিয়ে তার সুদ থেকে রস আহরণ করে জীবন ধারণ করে চলেছি।

—শেষ—

শ্রীসুধাকর পাণ্ডে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের একজন মেম্বার। অর্থাৎ এক কথায় এম. পি.। তিনি আমার বহুদিনের বন্ধু। বলতে গেলে আমার ছোট ভাই-এর মতন। একবার তাঁর সঙ্গে মহীশুর থেকে বাঙ্গালোর পর্যন্ত একই গাড়িতে এসেছিলাম। সময় রাত্রি। রাত দশটার সময় মহীশুর ছেড়ে বাঙ্গালোরে এসে পৌছেছিলাম রাত বারোটায়।

সুধাকরজী খুব গল্পবাজ, মজ্‌লিসী মানুষ। হাতে পানের ডিবে নিয়ে এক একটা করে পান খাচ্ছিলেন আর গল্প বলছিলেন।

সুধাকরজী বলতে লাগলেন—দাদা, ভোটের সময় কতরকমের যে ঘটনা ঘটে তা যদি লেখেন, তা হলে লোকে জানতে পারবে আমাদের এই দেশটা কী, কী এর বৈশিষ্ট্য, কী এর স্বভাব ?

বলে একটার পর একটা গল্প বলে যেতে লাগলেন। তারই মধ্যে একটা গল্প আমি আজ লিখছি, পরে যদি সময় পাই তো আরো লিখব।

* *

সুধাকরজী সেবার ভোটের প্রচার করতে বেরিয়েছেন। বারাণসীর কাছাকাছি একটা গ্রাম আছে, চান্দৌলি।

সেখান থেকে গেছেন আরো ভেতরের গাঁয়ে। জিপ থেকে নেমে পথে হেঁটে-হেঁটে প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে ভোট চেয়েছেন। সুধাকরজী নিজে একজন ব্রাহ্মণ মানুষ। গলায় তাঁর পৈতে আছে। সবাই তাঁকে দেখে বললে—

হ্যাঁ হুজুর, আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, আপনাকে ভোট দেবো না তো কাকে দেবো ?

সুধাকরজী শুনে খুশি হয়ে তার পাশের বাড়িতে যেতেন। সেখানেও ওই একই রকম আত্মীয়ের মতো অভ্যর্থনা।

এই রকম অভিযান চললো পনেরো দিন ধরে। গ্রামের পর গ্রাম প্রচার করে থেকে এমন কয়েকটা গ্রামে গেলেন। যেখানে হরিজনদের বসবাস। হরিজনরা ভদ্রলোকদের কাছে অস্পৃশ্য। বামুন মানুষ নিজে পায়ে হেঁটে তাদের গাঁয়ে ভোট চাইতে এসেছেন, এরা তারা ধন্য হয়ে গেল।

তারা হাতজোড় করে প্রণাম করে বললে—হুজুর আপনি কেন কষ্ট করে আমাদের বাড়ি এসেছেন, আপনি বেরামুন মানুষ, আপনাকে তো আমরা ভোট দিতুমই—আপনি আমাদের সকলের মা-বাপ, ছেলেদের একটু দেখবেন হুজুর—

গাঁয়ে গিয়ে খুব জল তেষ্টা পেয়ে গেল সুধাকরজীর। তিনি একজনকে বললেন—আমাকে একঘটি জল দিতে পারো ভাই, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।

লোকটা একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, এতগুলো লোককে দেখে উঠে দাঁড়ালো। বললে—আমরা চামার হুজুর, আমরা হরিজন, আমরা কী করে জল খেতে দেবো আপনাকে ?

সুধাকরজী বললেন—তা চামার হও, আর যাই হও। তাতে কিছু যায় আসে না। তোমরাও তো মানুষ। তোমরা নিজেরাও তো জল খাও। সেই জলই আমাকে খেতে দাও, আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে বলেই তোমাদের বলছি।

লোকটা বললে—না হুজুর, আমরা হলাম চামার, আমরা কী আপনাকে জল খেতে দিতে পারি ?

সুধাকরজী বললেন—তা তোমরা চামারই হও আর বামুনই হও, আমি জাত-পাত মানি না, আমি শুধু জানি, তুমিও মানুষ আর আমিও মানুষ, আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো ফারাক নেই, তুমি আমাকে জল দিয়ে বাঁচাও।

এতক্ষণে বোধ হয় লোকটার একটু দয়া হলো। সে একটা লোটা নিয়ে সেটাকে ভালো করে মাজলে, তারপর কুয়ো থেকে পরিষ্কার জল ভর্তি পেতলের লোটাটা সুধাকরজীর হাতে দিলে। সুধাকরজী লোটা নিয়ে জলটা মুখে ঢালতে যাবেন। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

হঠাৎ সেই লোকটার বুড়ো বাপ এসে হাজির, জলভর্তি পেতলের লোটাটা সুধাকরজীর হাতে দেখে ছেলেকে বললে—কী হয়েছেরে, বেটা কেয়া হুয়া ?

ছেলে বুঝিয়ে সব বললে।

বাপ শুনে আরো রেগে গেল। আর দেরী করলে না। টপ্ করে সুধাকরজীর হাত থেকে জলভর্তি লোটাটা কেড়ে নিয়ে জলটা মাটিতে ফেলে দিলে। সুধাকরজী অবাক। এমন কী অপরাধ করেছে সে, যে লোকটা তার লোটা কেড়ে নিলে। লোকটা তখন তার ছেলেকে বকছে—তুই বাবুজীকে লোটা করে জল খেতে দিয়েছিস?

ছেলে বললে—আমি তো বললাম, আমরা চামার, আমরা বামুনকে জল দেবো না। তা বাবুজী যে বললে বাবুজী জাত মানে না। তাই লোটাতে জলভর্তি করে খেতে দিয়েছিলুম। বাবুর যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, দেখলুম।

বাপ বললে—বাবুজী বামুন, এটা তুই গলায় পৈতে দেখে বুঝতে পারিস নি?

—হ্যাঁ পৈতে দেখেছিলুম!

—হ্যাঁ, তাহ'লে তুই জেনে শুনে পাপ করতে যাচ্ছি? জানিস আমাদের ধর্মে কথা আছে, বামুনকে ছুঁতে নেই?, বামুনকে জল দিতে নেই, আর তুই কিনা সেই পাপই করছিলি? আমি যদি এখন না এসে পড়তুম, তাহ'লে তো তুই নরকে যেতিস্।

বলে সুধাকরজীর দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল—বাবুজী, রাগ করবেন না, আমার ছেলে একটা বেকুব, তাই আপনাকে জল দিয়েছিল। ও জানে না যে আমাদের চামারদের একটা ধর্ম আছে, আপনাকে জল খেতে দিয়ে যে পাপ করেছে, আপনি তার কসুর পাপ করুন হুজুর! মেহেরবানি আপনি বামুন পাড়ায় গিয়ে জল খেয়ে নেবেন। আমাদের কসুর মাপ করবেন, আমরা আমাদের জাত খোয়াতে পারব না আপনাকে জল দিয়ে—তবে আপনাকে আমরা ভোট দেবো ঠিক—

সুধাকরজী আর কী করবেন। আর কিছু না বলে দলবল নিয়ে, পাশের গাঁয়ে চলে গেলেনে।

গল্প শেষ করে সুধাকরজী বললেন—এই হচ্ছে বিমলদা আমাদের আজকের ভারতবর্ষ। আমার মতো গ্রামে-গ্রামে না ঘুরলে আসল ভারতবর্ষ জানতে পারা যাবে না। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লীতে বসে ভারতবর্ষ চিনেছি যে বলবে, সে মস্ত ভুল করবে।

———

# নানা রঙের দিন

আমার জীবনের পথ-পরিক্রমায় কখনও কি রঙিন দিনের স্পর্শ পেয়েছি? এই প্রশ্ন আমাকে আর কখনও কেউ জিজ্ঞেস করেনি। আজ হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'কাদম্বিনী'-র সম্পাদক এই প্রশ্ন করে আমাকে বিবশ করে দিয়েছেন।

এই প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো, তা বুঝতে পারছি না। ইতিহাসের বইতে পড়েছি, বাদশা ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ সালে যখন দক্ষিণ ভারতে মারা যান, তার আগে নিজের ছেলেকে একটা চিঠি লেখেন। ওই পত্রে উনি যা লিখেছিলেন, তা এই রকম—

'আজ আমি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আমি ভেবে দেখছি যে আমার সমস্ত জীবন শুধু অশান্তির মধ্যেই কেটেছে। জীবনে আমি কখনও এতটুকু শান্তি পাইনি। শুধু সামান্য যে-সময়টুকুতে নমাজের সময় আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি, সেইটুকু সময়েই শুধু একটু শান্তি পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি না আমার মৃত্যুর পর যখন খোদার কাছে যাবো, তখন কী জবাব দেবো?'

আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে যে আমিও যখন পরলোকে গিয়ে ঈশ্বরের সামনে পৌঁছোবো, তখন কী জবাব দেবো ?

ছোটবেলার কথা মনে পড়লেই আমার আতঙ্ক হয়। গুরুজনদের কাছ থেকে কি কখনও আমি সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি ? বাবা চাইতেন যে আমি চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হই। কারণ সবাই জানতো যে ওই পেশায় অনেক টাকা উপায় হয়। কিন্তু বাবার কথা না শুনে আমি বাংলা ভাষায় এম. এ. পাশ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চাকরি পাওয়া বড় কঠিন ছিল। একদিন বাবা আমাকে জবরদস্তি করে ট্যাকসিতে তুলে একটা সরকারী অফিসে নিয়ে গেলেনে। আমাকে দরখাস্ত পর্যন্ত করতে হলো না, যা কিছু করলেন, সব বাবাই নিজে করলেন। আমাকে একটা চেয়ার দেওয়া হলো বসবার জন্যে। আর ওইদিন থেকেই আমি চাকর হয়ে গেলাম। চাকর হলে মানসিক যন্ত্রণা যে কত মর্মান্তিক হয়, আমি সেইদিন থেকেই তা মর্মে-মর্মে বুঝলাম। জন্মের শুরু থেকেই যে-যন্ত্রণার আগুনে জ্বলে এসেছি, তখন তা একশোগুণ বেড়ে গেল।

বাবা বললেন 'চাকরি পাওয়াই শক্ত, ছাড়তে এক মিনিটও সময় লাগে না। আমি তোমাকে এই চাকরিটা পাইয়ে দিলাম, তোমার ইচ্ছে হয় তুমি চাকরি করে যাবে, আর ইচ্ছে না হয় তো চাকরি ছেড়ে দিও'।

একদিকে চাকরি করার মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর অন্যদিকে মনিবের হুকুম তামিল করার ব্যাথা আমাকে পাগল করে তুললো। আমি ভাবলুম যে যদি আমি লেখক না হতে পারি, তো তাহ'লে কি সারাজীবন চাকরই থেকে যাবো ?

আমি কি সারাজীবনটা চাকর হয়েই কাটিয়ে দেবো ?

এই পরিস্থিতিতে যখন 'সাহেব-বিবি-গোলাম' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরুবার পর বই হয়ে প্রকাশিত হলো, তখন বাংলা সাহিত্যের সমস্ত পত্র-পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলো। একটি পত্রিকা লিখলো যে আমি 'চোর'। এই উপন্যাস আমি অন্য লেখকের বই থেকে চুরি করে লিখেছি। আর একটি পত্রিকা লিখলে যে একজন গরীব লেখক তার পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়তে দিয়েছিল, আর আমি সেই লেখা নিজের নাম দিয়ে ছাপিয়েছি। আরও লিখলো, সেই গরীব লেখক আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে। 'সাহেব-বিবি-গোলাম' তখন যত উপন্যাস বাজারে বেরুতো তার চেয়ে আকারে একটু বড় ছিল। তাই কেউ-কেউ এর সঙ্গে থান ইঁটের

তুলনা করলে। আর একজন সাহিত্যিক বললেন, এটা উপন্যাসনয়—পাশবালিস। মহিলারা দুপুর বেলায় আরাম করার জন্যে এই বইটা পাশ-বালিস হিসেবে ব্যবহার করে।

এই সব ঘটনায় আমার বড় রাগ হলো। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। তারপর একের পর এক আমি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ আকারের উপন্যাস লিখতে লাগলাম। ওই সময় আমার বয়েস ছিল চল্লিশ বছর। আমি পেনসনের সুযোগ পর্যন্ত গ্রহণ করলাম না। তার কারণ এই যে, পেনসন নিলেও তো সারাজীবনই চাকর হয়ে থাকতে হবে।

গত ১৯৭৫ সালে নাগপুরে 'বিশ্ব হিন্দী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ওই উপলক্ষে আমিও আমন্ত্রিত হয়ে নাগপুরে গিয়েছিলাম। ওখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। একটি লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। যখন বক্তৃতা শেষ হলো তখন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন—আমি ডাক্তার ব্যানার্জী। আমি নাগপুরেই প্র্যাকটিস করি। একটা কথা বলবার জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

আমি বললাম—বলুন, কী কথা?

ডাক্তার ব্যানার্জী বললেন—এখানে নাগপুরে আমার এক অবাঙালী রোগী থাকেন। তাঁর অনিদ্রার রোগ ছিল। আমার কাজ ছিল, রোজ রাত দশটার সময় গিয়ে তাঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো। একদিন আমি ঠিক রাত দশটায় তাঁর বাড়িতে গেছি। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—ডাক্তার সাব্, আর আমাকে ঘুমের ওষুধ দিতে হবে না।

আমি বললাম—কেন?

আমার রোগী ভদ্রলোক বললেন—আমি একটা মোটা উপন্যাস পড়েছি, সেই উপন্যাসটা পড়ার পরই আমার অনিদ্রা রোগ দূর হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী উপন্যাস?

আমার রোগী ভদ্রলোক একটা মোটা উপন্যাস আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি দেখলুম ওটা আপনার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর হিন্দী অনুবাদ 'খরীদী, কৌড়িয়োকে মোল'।

ডাক্তার ব্যানার্জীর কথা শুনে আমার চোখ কান্নায় ছল্-ছল্ করে উঠল—আনন্দের অশ্রু। বললাম—ডাক্তারবাবু, আমার বই পড়ে আপনার রোগীর ঘুম এলো, কিন্তু আমার ঘুম চিরকালের জন্যে চলে গেছে। এখন

আমাকে রোজ শোবার আগে ঘুমের বড়ি খেতে হয়। সাহিত্যের জন্যে আমার ঘুমকে ও চিরকালের জন্যে আমাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে।

কথাটা ঠিকই। কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। আর সব কিছু দিলে সব কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু আমি কি সব কিছু দিতে পেরেছি ?

আমি জানি না ডাক্তার ব্যানার্জী এখনও নাগপুরে আছেন কিনা। কিন্তু আজ এই বয়েসে যদি আবার দেখা হতো তো তাঁকে কার্লমার্কসের একটা কথা বলতাম।

কার্লমার্কসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—Wha tis happiness ? অর্থাৎ 'সুখ কী' ?

কার্ল মার্কস উত্তর দিয়েছিলেন—'Strugle' অর্থাৎ 'সংঘর্ষ।'

সত্যিই সংঘর্ষই তো সুখ।

আমি সারাজীবন এই সুখেরই সান্নিধ্য পেয়েছি। এক-কথায় বলা যায় আমার সারা জীবনই রঙিন দিন। কিন্তু যে-দিন আমার কলম থেমে যাবে, সেইদিনই বুঝে নেবো যে আমার রঙিন দিন শেষ হয়ে গেল।

॥ শেষ ॥